তপস্বী ভারত

স্বামী তত্ত্বানন্দ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৩

প্রচ্ছদপট :

মুদ্রণ : কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশি[illegible]
[illegible] প্রেস. ২০ বি [illegible] সরকার লেন, কলিকাতা ৭ হইতে শিশির কুমার সরকার কর্তৃক।

সূচী

মুখবন্ধ

মানবজীবনের একটা ইতিহাস আছে। জীবন মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জন্মগ্রহণ করার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন সময়েই ইহা অপ্রিয় হয় না। যাহা প্রিয় তাহার মূল্য আছে, বয়োবৃদ্ধি জ্ঞানবৃদ্ধি, এবং হৃদয়াবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূল্যবোধ বাড়ে। জীবন বলিতে দৈহিক জীবন নয় আরও কিছু যাহা দৈহিক জীবন অপেক্ষা অধিকতর সত্য এবং মূল্যবান। শিল্প, সাহিত্য, নীতি, দর্শনের মধ্য দিয়া মানুষের সৃজনপ্রতিভা বিকাশ পায় কিন্তু তাহার জ্ঞানস্পৃহা এত গভীর, বিপুল প্রকৃতিকে জানিবার আগ্রহ এত অধিক যে সে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত নয়, সে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সকলকে ধ্রুব সত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে চায় এবং ঐরূপ উপলব্ধিকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের সীমারূপে সিদ্ধান্ত করে। এই অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার জন্য সম্যক্ চেষ্টাই মানুষের আদর্শ; একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় এই আদর্শই জীবনের আশ্রয়, পরিমাপক। আদর্শের সাধনাই জীবনের চিহ্ন, সার্থকতা। আদর্শহীন জীবন মূল্যহীন, আদর্শের আবিষ্কার, গ্রহণ, পরিপূর্তির চেষ্টা, হৃদয়ের প্রসার, বহির্জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি, অন্তর্জগতের রত্ন-আহরণ এবং জনহিতে রত থাকাই জীবনের ব্রত। যাহা বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎকে বিধৃত করিয়া আছে তাহাকে অনুভব করাই মানুষের লক্ষ্য, তাহার আবিষ্কারই সত্যের আবিষ্কার এবং আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্তি, তাহার অনুশীলনে শান্তি, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি। মহাপুরুষদের জীবনের মধ্য দিয়া উক্ত আদর্শের আলোচনাই এই পুস্তকের বিষয়। তাঁহাদের জীবনকথা আখ্যায়িকা মাত্র নয় বরং জীবনবেদ স্বরূপ, অতিজীবনের আভাস।

নদীর মোহনায় স্তরে স্তরে পলি পড়িয়া বদ্বীপের আকার ধারণ করে। ঐ জমি অত্যন্ত উর্বর হয়। তাহাতে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। যত অধিক পলি পড়ে তত উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অধিক ফসল পাওয়া যায়। অনেক মনীষীর ধারণা ভারতভূমি নদীর মোহনায় বদ্বীপের মত উর্বর। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অগণিত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পলিতে উর্বর হইয়া ইহা পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, সন্ন্যাসী রূপ ফসল উৎপাদন করিয়া ভারত সর্বসাধারণের প্রাণের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইয়াছে। মনীষীদের এই ধারণা যে মিথ্যা নয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা এই পুণ্যভূমিতে মিলিত হইয়া বহু ধর্মের উদ্ভব ঘটাইয়াছে, চির-আচরিত আদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছে, সভ্যতা, সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে, বহু দার্শনিক মতবাদের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞানে প্রেরণা যোগাইয়াছে। আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তির ধারণা সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। বৃহত্তম সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মহাপুরুষদের সাধনার মূলকথা বিশ্বাত্মবোধ, ধর্ম বিশ্বমানবধর্ম, বাণী বিশ্বমৈত্রী, তত্ত্ব একত্ব, উদ্দেশ্য জ্ঞানের দ্বারা এই সত্যের আবিষ্কার, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা এবং বৈচিত্র্যের স্থাপন। কবি গাহিয়াছেন 'আপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' তবে এই ভাবধারা সকল স্থানে সমভাবে প্রবাহিত

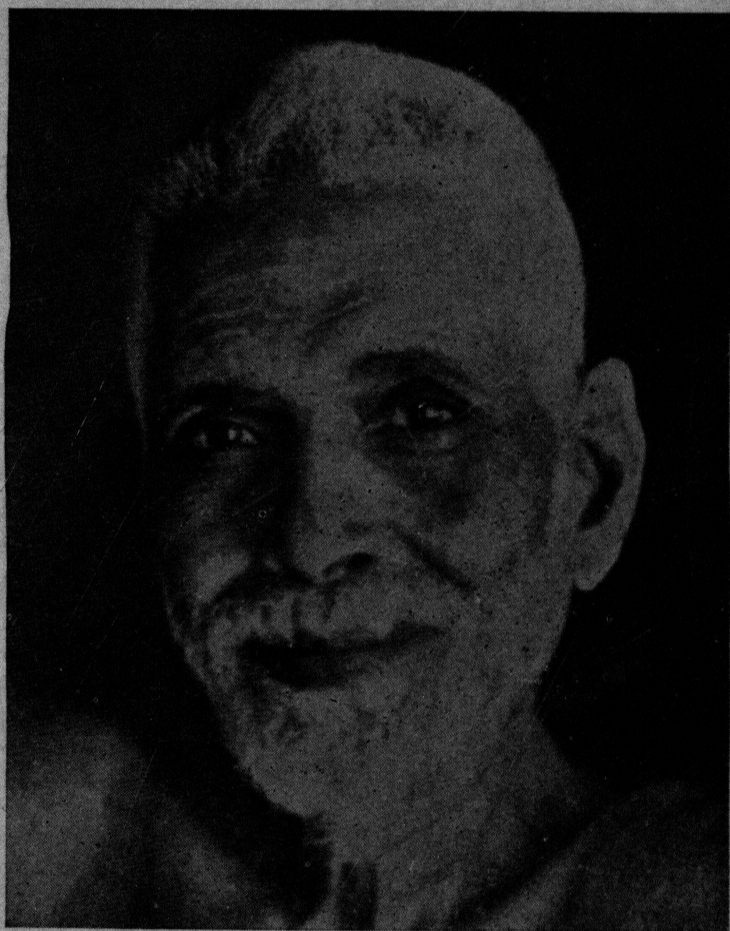
হয় নাই। অনেক স্থানে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যখনই উহা ব্যাহত হইয়াছে তখন নূতন চ্যালেঞ্জ আসিয়াছে। এই চ্যালেঞ্জ সমাজে, ধর্মে, নীতিতে, রাষ্ট্রে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। পরপীড়ন, অত্যাচার, লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, খণ্ড বা ব্যাপক যুদ্ধ, পরধর্মে হস্তক্ষেপ, মূর্তিভঙ্গ, অজস্র রক্তপাত দ্বারা সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় আনিয়াছে। স্বাধীন চিন্তাশীল, যোগী, ভক্ত, প্রেমিক, জ্ঞানীরা উক্ত চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বস্ব পণ করিয়া ধর্মের ব্যাহত জীবনধারা নূতন খাতে প্রবাহিত করাইয়াছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রেমের সেতু নির্মাণ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ সুগম করিয়াছেন। বিশ্বমানব হিতে সর্বত্র তাঁহাদের তপস্যালব্ধ জ্ঞানের কিরণ ছড়াইবার দায়িত্ব প্রেমিক যোগীদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা সে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করিয়াছেন।

অন্তরের অজ্ঞেয় শূন্যতা প্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। তাহা মানুষকে সংগ্রামভীরু, অলস, যুক্তিহীন ও কর্মবিমুখ করে, শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করে, প্রাণধর্মের গতি রোধ করে। এইজন্য জীবন বিষাদময় হয়। কিন্তু এই অবস্থায় মানুষ থাকিতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়। সসীমের গণ্ডী ছাড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অসীমের আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির থাকিতে পারে না। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া পরিপূর্ণ সত্যকে জানিবার চেষ্টা করে। যতদিন পর্যন্ত না ঐ সত্য জানিতে সমর্থ হয় ততদিন পর্যন্ত তাহার সংগ্রামের বিরাম নাই।

সমাজের অধিকাংশ লোক জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে সচেতন নয়, আবার যাহারা সচেতন তাহাদের মধ্যেও ইহার তীব্রতা নাই। তাহারা সত্যের রূপ জানিতে পারে না। অতিজীবনের সন্ধান জানে না, অন্তর্নিহিত দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে না। জীবনের খেই হারাইয়া গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন চালাইয়া দেয়। ধর্মই যে ব্যক্তিকল্যাণ এবং বিশ্বকল্যাণ সাধনার প্রকৃত শক্তি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির জনক, ইহা তাহাদের ধারণায় আসে না। ফলে জীবনের মাধুর্য তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু সব লোক সমান নয়। সংখ্যায় অল্প হইলেও এমন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা জীবনের মূল সমস্যা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। জীবনরহস্য বুঝিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেন। ভগবৎকৃপায় সংগ্রামে জয়ী হইলে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ফুটিয়া উঠে। তখন তাঁহাদের তীক্ষ্ণ মেধা, বলিষ্ঠ চিন্তা, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভা মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়। তাঁহারা প্রকৃত ভগবৎ রাজ্যের অধিবাসী। সংখ্যায় অল্প হইলেও পৃথিবীর বহু দেশে, বহু জাতির মধ্যে তাঁহারা যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তাঁহারা বিশ্বমনাঃ, শ্রেয়োবোধের দিকে মনকে আকর্ষণ করা তাঁহাদের প্রতিভার ধর্ম। ত্যাগ তাঁহাদের আদর্শ। দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ হন না। সকলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহারা বিশিষ্ট নায়ক, জাগরণের পুরোহিত লোকোত্তর পুরুষ। তাঁহাদের শিক্ষায় থাকে প্রগাঢ় জীবনবোধ, অকপট আদর্শানুরাগ, স্বচ্ছ সরলতা, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা এবং গভীর সত্যপ্রীতি। তাঁহাদের বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে, উচ্চ আদর্শ সত্যের দিকে মনকে ধাবিত করে, মানুষের প্রাণে নিত্য প্রেরণা যোগায়। তাঁহাদের ধর্ম স্বার্থবিসর্জনের প্ররোচনা দেয়, মানুষকে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ করে, আত্মাকে জাগায়, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া ব্যবধান সরাইয়া দেয়। তাঁহারা মানুষের পশুত্বকে দেবত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারায় পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তাহাকে উন্নত খাতে বহাইতে চেষ্টা করেন। বিপথগামী মানুষকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া তাহার অজ্ঞান দূর করেন এবং তাহাকে পর্যন্ত

লাভে সাহায্য করেন। দিব্য ভাবে ভাবিত এই মহাপুরুষগণ প্রকৃতির এলাকা ছাড়াইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহারা ঘৃণা, লজ্জা, ভয় হইতে মুক্ত। কোন বস্তুই তাঁহাদের বন্ধনে ফেলিতে পারে না। তাঁহাদের কোন অভাব নাই, তাঁহারা সদা আনন্দময় পুরুষ, তাঁহাদের জীবনই প্রচার। উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন, ধার্মিক, পাপী সকলের জন্য তাঁহাদের হৃদয় উন্মুক্ত। তাঁহাদের তপস্যাময় জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া লোক ধন্য হয়। তাঁহাদের পবিত্র সঙ্গ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য যুক্তি, ভাবপ্রবণতা নয়, ভাষা সাবলীল, অলঙ্কারপূর্ণ, তাঁহাদের যুক্তি অকাট্য। বিরুদ্ধবাদীও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, যুক্তি, সততা, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের নিকট মাথা নীচু করে। তাঁহারা প্রতিপক্ষকে কখনও আঘাত করেন না। ভালবাসা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় জয় করেন। তাঁহাদের গৌরবময় জীবন প্রেম, প্রীতি ও সুন্দরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাঁহাদের পবিত্র জীবন শান্তির দ্যোতক। অভয় মন্ত্রের সাধকদের এই ভাবধারায় বিভ্রান্ত মন আদর্শ খুঁজিয়া পায়। শিক্ষার সন্দেহ নিরসন হয়, দেবত্ব বিকাশের সহায় হয়, ভগবৎ পথে চলিবার পথ সুগম হয়। তাঁহাদের নাম অগণিত স্বাধীনতাকামী মুক্তিপ্রিয় মানুষের কাছে গভীর প্রত্যয়দ্যোতক, নির্ভীক আশ্বাসের প্রতীক। তাঁহাদের মহত্ত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বিখ্যাত লেখক ইসাবুড বলিয়াছেন যে তাঁহারা তড়িৎ শক্তি প্রদানকারী নিশ্চল ইলেকট্রিক রিসিভারের মত শান্ত ত্যাগী, স্বার্থগন্ধহীন, অহমিকামুক্ত। এই মহাপুরুষদের জীবন অসাধারণ। তাঁহাদের ব্যক্তিত্বে দৈন্যতা নাই, আছে মহত্ত্ব, উদারতা। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা জনকল্যাণ সাধন করাই তাঁহাদের ব্রত। তাঁহাদের জীবনবেদ হইতে একটা বিষয় পরিষ্কাররূপে জানা যায়। তাহা এই—অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে যে সকল মহাপ্রাণ দেহমন দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন, মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, মানুষের মুক্ত আত্মার দৃপ্ত অভিমানকে স্বাধীনভাবে চলিবার পথে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা কোন একটি বিশেষ যুগ বা সময় ও দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ বিহার সর্বকালে, সর্বসময়ে, সর্বযুগের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহারা দেশের, সমাজের, ধর্মের গৌরব। তাঁহাদের প্রভাব এড়ানো যায় না, তাঁহারা নমস্য।

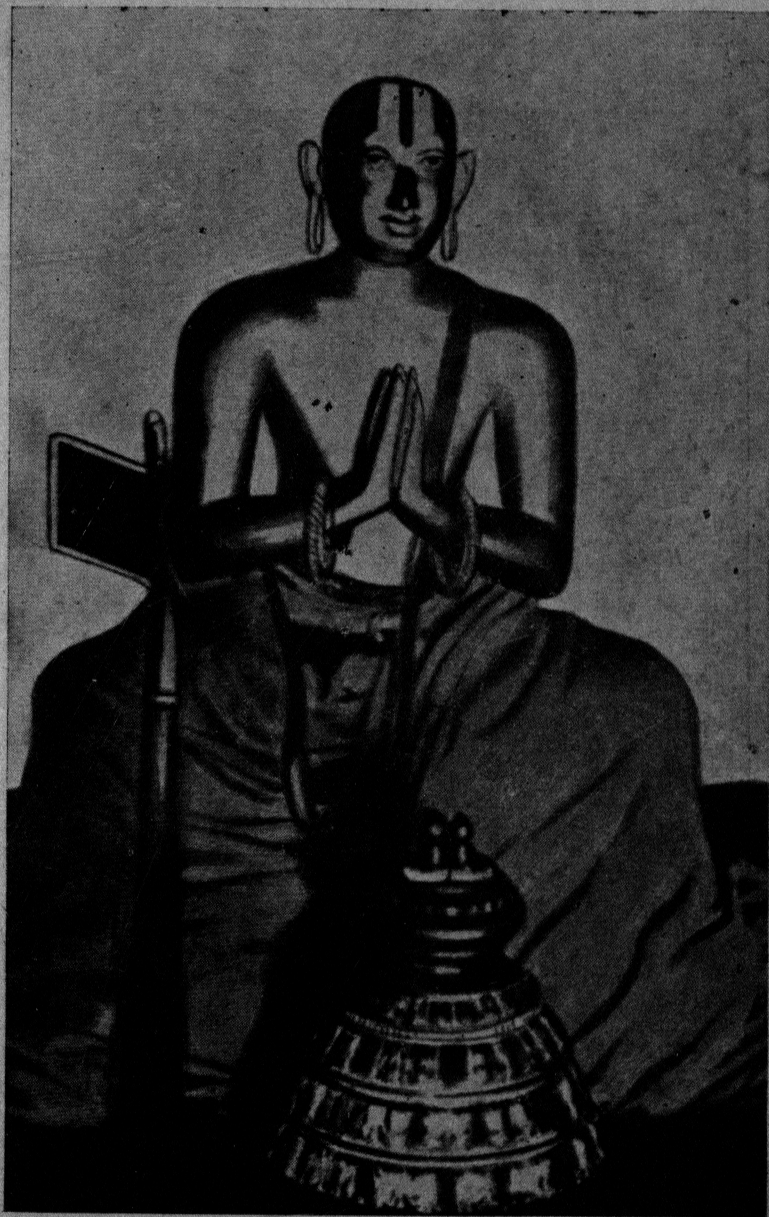
মৎলিখিত ইংরেজী বই 'সেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া'র অনুকরণে এই পুস্তকে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু সম্প্রদায়ের চল্লিশ জন মহাপুরুষের জীবন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য তাঁহাদের জীবন সময়ের ক্রম অনুযায়ী আলোচনা না করিয়া ভৌগোলিক বিভাগ অনুযায়ী আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই নূতন নূতন ধর্মের প্রবর্তক, ধারক, বাহক এবং প্রচারক। মহাবীর তীর্থঙ্কর জৈন সম্প্রদায়ের, নানক শিখ সম্প্রদায়ের, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, রামানন্দ রামানন্দী সম্প্রদায়ের, কবীর কবীরপন্থীর, দাদু দাদুপন্থীর, নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের চিন্তাধারা প্রবর্তকের দেহাবসানের পরেও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বাহিরেও অব্যাহত রহিয়াছে। এই মহাপুরুষের জীবনবেদ ব্যক্তিগত এবং জাতিগত জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।



রমণ মহর্ষি



গম্ভীরনাথ



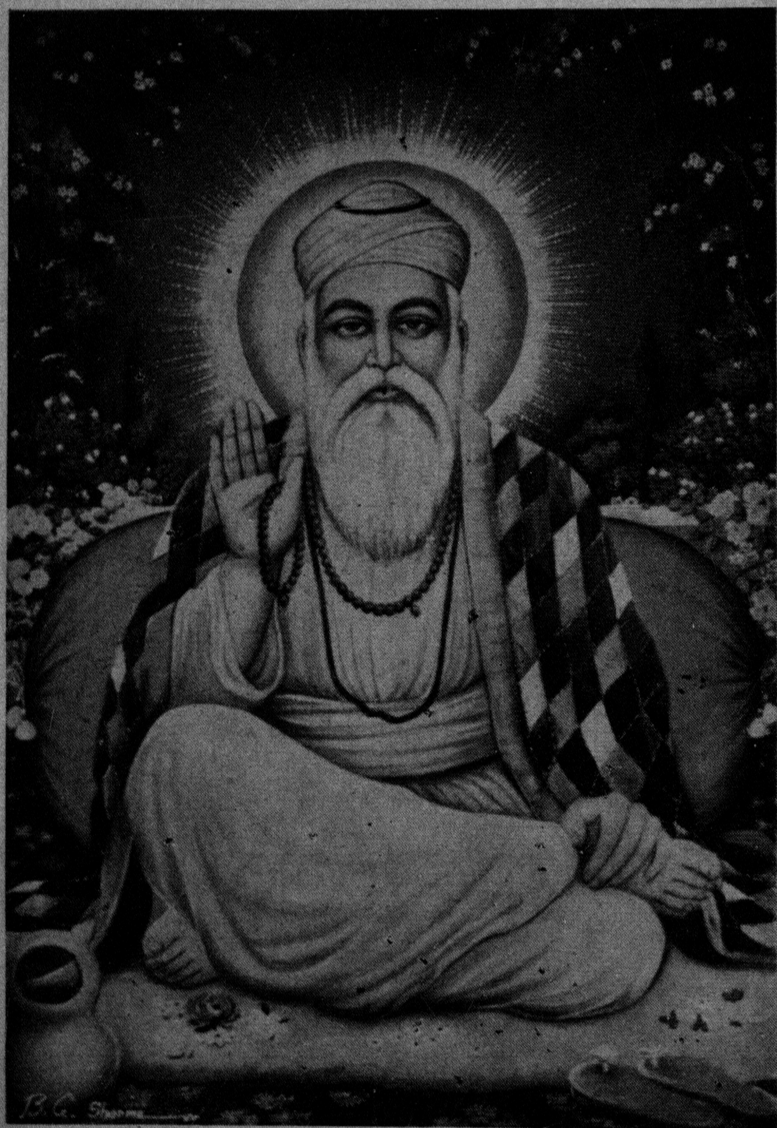
রামানুজ



লোকনাথ ব্রহ্মচারী



তীর্থঙ্কর মহাবীর



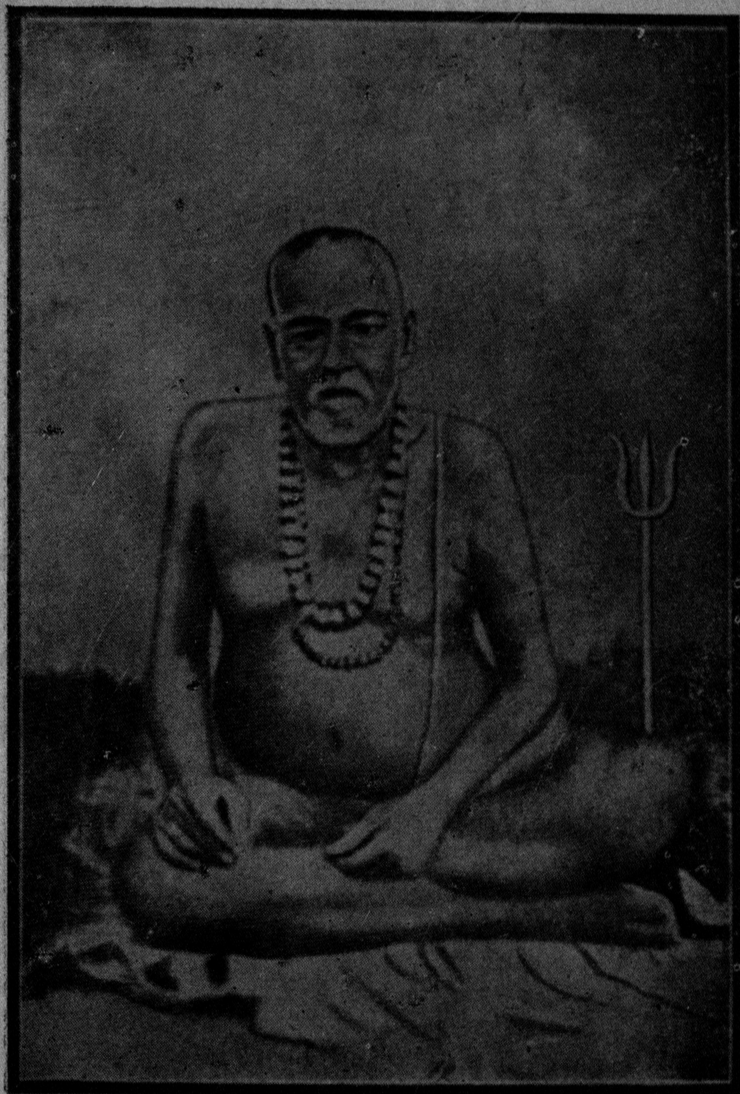
গুরু নানক



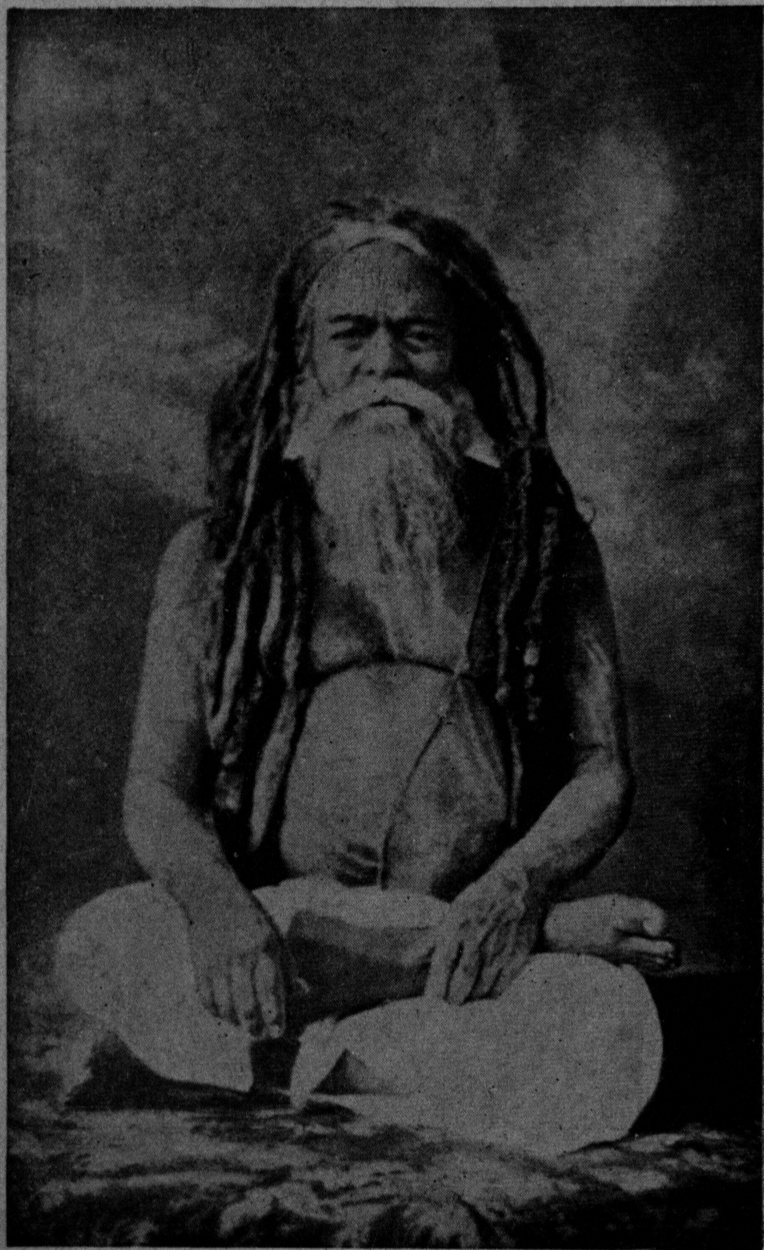
তুলসীদাস



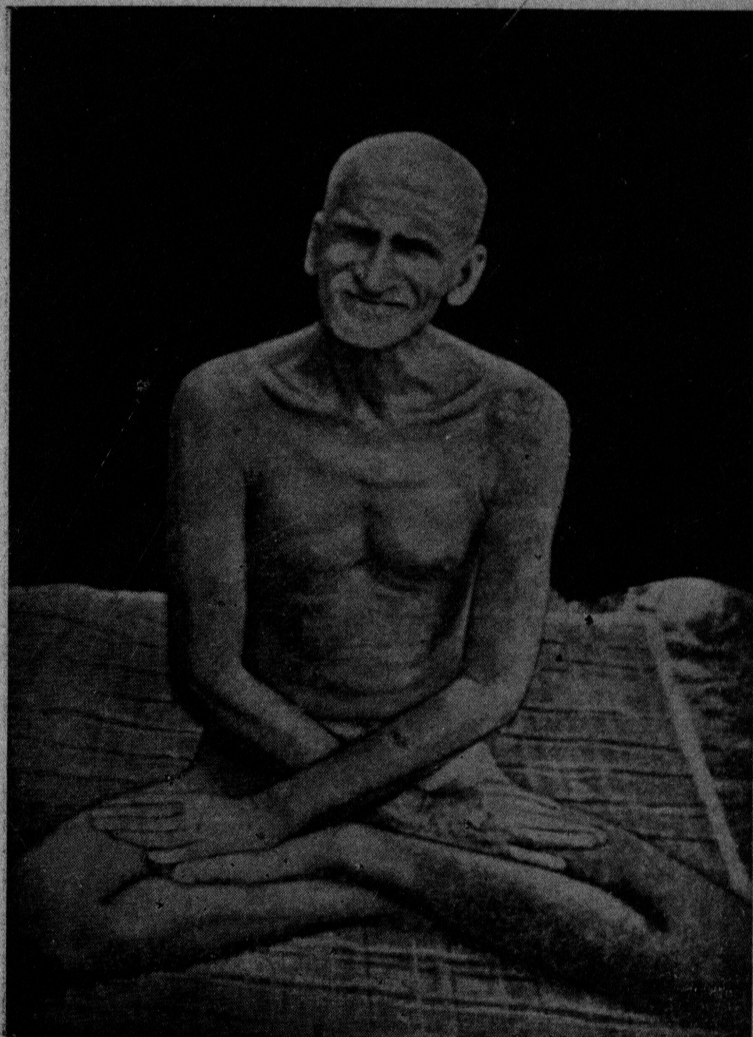
রামপ্রসাদ



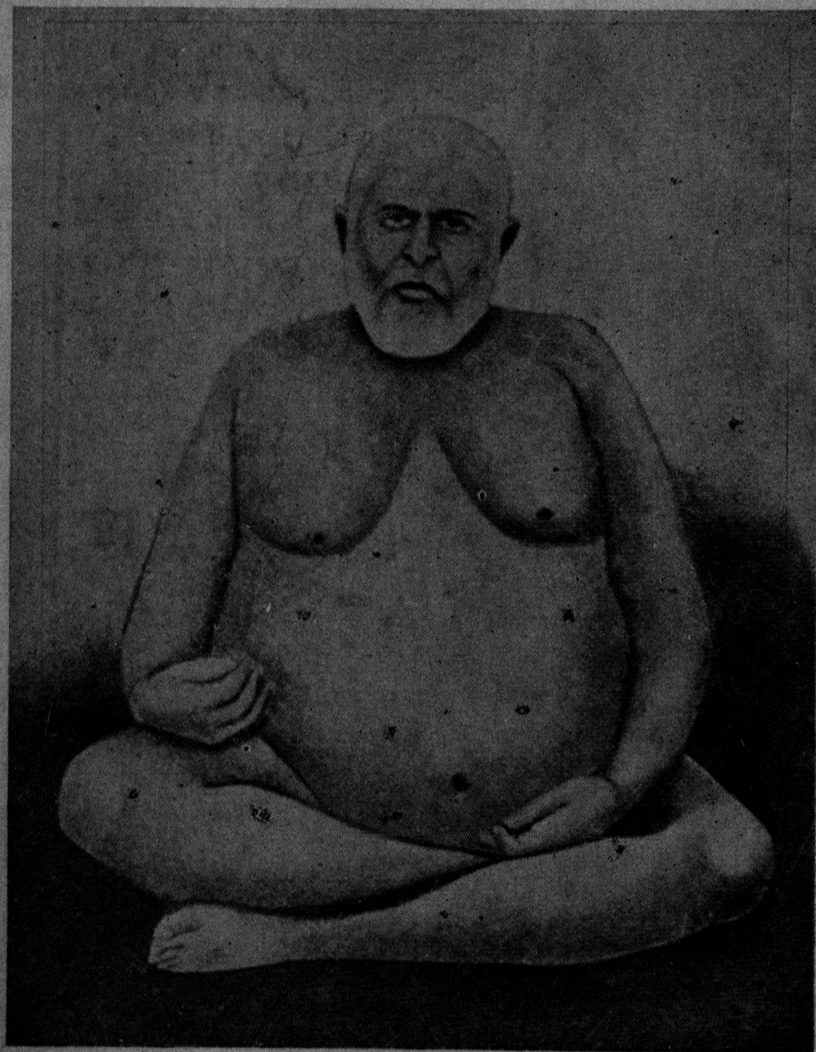
বামা ক্ষেপা



সন্তদাস বাবজী



ভাস্করানন্দ সরস্বতী



ত্রৈলঙ্গ স্বামী

॥ এক ॥

রমণ মহর্ষি

রমণ মহর্ষির নাম শুনেন নাই এমন লোক আজকাল কমই আছে। তাঁহার পূর্ব নাম ভেঙ্কটরমণ আয়ার। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ১৮৭৯ সালে ৩০শে ডিসেম্বর আদ্রা উৎসবের দিনে তাঁহার জন্ম। এই তিথি দক্ষিণ দেশে বিশেষতঃ পুণ্য তীর্থ বিখ্যাত নটরাজক্ষেত্র চিদম্বরমে স্মরণীয় দিন। ভেঙ্কটরমণ মাদুরার ত্রিশ মাইল দূরে তিরুচীগ্রামস্থ ধনী ব্রাহ্মণ সুন্দরম্ আয়ারের দ্বিতীয় পুত্র। পিতা আইন ব্যবসা করেন। ঐ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। মাতা আলগাম্মল ধর্মপরায়ণ এবং বুদ্ধিমতী। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ভেঙ্কটরমণ ডিণ্ডিগাল স্কুলে ভর্তি হন। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে কাকা সুব্বায়ার তাঁহাকে মাদুরায় নিজের কাছে নিয়া আসেন এবং স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন। ভেঙ্কটরমণ কয়েক বৎসর স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী হইলেও কার্যক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

কয়েক পুরুষ ধরিয়া তাঁহাদের পরিবারের একটা বিশেষ ধারা চলিয়া আসিতেছিল। পরিবারস্থ কোন না কোন সন্তান বিশ কিংবা তিরিশে পা দিলে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত। ভেঙ্কটরমণও বংশের ধারা অবলম্বন করে এই ভয়ে মাতা আলগাম্মল সদাসর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। সংসার ত্যাগ করিয়া কোন ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া যায় ইহা কোন মাতা সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং মাতা আলগাম্মলের পক্ষে সদা শঙ্কিত থাকা স্বাভাবিক। শঙ্কার আরও কারণ ছিল। তাঁহার খুড়া শ্বশুর (সুন্দরম্ আয়ারের কাকা) কিছুদিন পূর্বে মাত্র সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ছেলে ঠাকুরদাদার পথ অনুসরণ করিবে এই আশঙ্কা অমূলক নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভেঙ্কটরমণ কোন আত্মীয়ের নিকট তিরুভান্নামালাইয়ের বিখ্যাত অরুণাচলমের কথা শুনিতে পাইলেন। শিব ঐ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ঐ শব্দ কানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার মনে একটা অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল শব্দটির মধ্যে একটা অব্যক্ত মাধুর্য আছে। স্থির করিলেন উহার তাৎপর্য জানিতে হইবে। সুযোগও

আসিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি বিখ্যাত পেরিয়াপুরাণম্ ধর্মগ্রন্থখানি পড়িতেছিলেন। গ্রন্থখানি তামিল সাহিত্যের খনি। ভক্তি ও জ্ঞানের উৎস। যাঁহারা ত্যাগ তপস্যা ও ভগবৎকৃপায় নায়নার আখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং শত শত বৎসর ধরিয়া শিবমন্দিরে মূল দেবতার পাশে পূজা পাইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের জীবনী বিশেষভাবে ঐ পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা তেষট্টিজন। তাঁহাদের ত্যাগ তপস্যা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ভেঙ্কটরমণের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। ফলে তাঁহার জন্মান্তরের শুভ সংস্কারগুলি বিকাশ পাইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল দেবত্বই মানুষের প্রকৃত সত্তা। ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য, ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং প্রেমের পথ অবলম্বন করিলে ঐ পথের পরিচয় মিলে।

ছাত্র অবস্থায় একদিন ভেঙ্কটরমণ নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার শরীর ও মনের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল মৃত্যু করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাঁহার অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্নায়ুগুলী শিথিল হইয়া আসিতেছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার কারণ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। সব শেষ হইয়াছে, দেহ শ্মশানে নিয়া আগুনে দেওয়া হইয়াছে এবং পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। মৃত্যুর এত বিভীষিকা দেখা সত্ত্বেও মন একটা বিষয়ে সজাগ ছিল। দ্রষ্টা হিসাবে তিনি শরীর মন সকলের পরিবর্তন দেখিতেছেন, জন্ম মৃত্যু সব ঘটিতেছে। দ্রষ্টার এই রকমই অনুভব হয়। কিছুই অগোচর থাকে না। বিভীষিকা তাঁহার সামনে একটা নূতন জিনিস তুলিয়া ধরিল। মন ক্রমশঃ ভগবৎ ধ্যানে ডুবিয়া গেল। তিনি অমরত্বের আভাস পাইলেন। এই ঘটনার পর ভেঙ্কটরমণ শরীরের প্রতি উদাসীন হইলেন। পড়াশুনায় মন বসে না। খাওয়া-দাওয়াতেও মন নাই। নিকটস্থ মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর মন্দিরে গিয়া দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। চোখ দিয়া অবিরল ধারা গড়াইতে লাগিল। পড়াশুনায় অবহেলা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে ভীষণ তিরস্কার করিলেন। ফলে সংসারের প্রতি মন আরও উদাসীন হইল। মনের অশান্তি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অথচ মনের শান্তি না থাকিলে জীবন বাঁচে না। শান্তিলাভের আশায় ১৮৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট ভেঙ্কটরমণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিরুভান্নামালাইয়ে অরুণাচলমের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। গৃহ ত্যাগ করিবার সময় তিনি এক পত্র লিখিয়া যান যে তিনি স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাঁহার

খোঁজ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইজন্য অর্থ ব্যয় অপব্যয় মাত্র। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন এবং লক্ষ্যে পৌছিবার সংকল্প নিয়াই তিনি অরুণাচলমে যাইতেছেন। গৃহত্যাগের দিন বড় ভাইয়ের কলেজের বেতন দিবেন বলিয়া কিছু টাকা নিয়াছিলেন কিন্তু বেতন না দিয়া ঐ টাকায় কিছু দূর পর্যন্ত রেলের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিলেন। তারপর পদব্রজে চলিলেন। মামবলপুতুর গ্রামে যখন পৌছিলেন তখন শেষ সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। তিনি বিরাটেশ্বর মন্দিরে পৌছিয়া প্রার্থনা এবং ধ্যানে কাটাইলেন। সেই সময় মন্দিরের পুরোহিত পূজা শেষ করিয়া মন্দির বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পক্ষে আর অপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ভেঙ্কটরমণকে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত ছিলেন। পা আর চলে না। কাহারও নিক .রে
কিছু খাবার কিংবা পিপাসা নিবারণের জন্য জল চাহিবেন সে ক্ষমতা নাই। তঁ স্বামীর
চেতনা লুপ্ত হইল। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন যে সম্মু
খাবার পড়িয়া আছে। বোধ হয় মন্দিরের পুরোহিতই তা .য়ারের বাগানে
করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি ঐ খাবার খাইয়া এবং রাত্রে বিশ্ স্ত্রণ্যস্বামী এখানে
সুস্থ বোধ করিলেন। পরের দিন সম্বলহীন হইয়া আবার অরুণা। হুকাল তাঁহার
রওনা হইলেন। তখন সূর্য উঠিয়াছে মাত্র, পাহাড়ের উপর উহার ধ্য তাঁহার
চিক্ করিতেছে। উপনয়নের সময় আত্মীয়ের নিকট যে সোনার কর্ণভূষণ ৬ ত
পাইয়াছিলেন গৃহত্যাগ করিবার সময় তাহা ফেলিয়া আসিবেন সেই খেয়াল ছিল না। এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া উহা বন্ধক দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। বন্ধকের কাগজখানি ভবিষ্যতের বন্ধনের কারণ হইবে ভাবিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নিশ্চিন্তে পথ চলিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভেঙ্কটরমণের পক্ষে একটা স্মরণীয় দিন। ঐ দিন তিনি তাঁহার স্বপ্নের স্বর্গ তিরুভান্নামালাইয়ে পৌছিলেন। উহা শিবের স্থান। জ্যোতির্লিঙ্গ হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই শিবক্ষেত্রে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিবার পর ভেঙ্কটরমণ রমণ মহর্ষিরূপে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত সহস্র ভক্তদের কৃপা করিয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করিয়াছেন। নিকটস্থ সুব্রহ্মণ্যম্ (কার্তিকের) মন্দিরে দিনের পর দিন শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ভগবৎ ধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অন্নজল মিলিল ত ভাল, না মিলিলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। মন্দিরের দেবতাকে অভিষেক করা পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, জল, কলা,

চিনি মিশ্রিত) দ্বারা জীবন ধারণ করেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় অনেকের শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ব্রহ্মণ্যস্বামী নামে পরিচিত হইলেন। দেব দর্শন ও প্রণাম করিয়া ভক্তেরা যেমন মন্দির প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকেও সেইরূপ প্রণামাদি করিয়া প্রদক্ষিণ করেন এবং দেবতার ন্যায় সম্মান দেখান।

তিনি সময়ের মূল্য জানেন। তপস্যা নিয়াই সময় কাটান। কাহারও সহিত বৃথা তর্ক করিয়া কিংবা আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করেন না। অযথা উপদেশ দিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখান না। এই সময়ে উদণ্ড নায়নার নামক কোন সাধু নিকটস্থ এক কুটিয়ায় থাকিয়া তপস্যাদি করেন। গুরুতুল্য ব্রহ্মণ্যস্বামীর প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা যে নিজেকে তাঁহার প্রথম শিষ্য বলিয়া দাবি করেন। ইহার কিছুকাল পর আন্নামালাই তাম্বিরণ নামক জনৈক পরিব্রাজক ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া জুটিলেন। তিনি সমন্ধ মিল তেভারমের ভক্তিমূলক গান গাহিয়া ভিক্ষা করেন এবং মৌনী ব্রহ্মণ্যস্বামীকে তাঁহার লব্ধ অন্নের অংশ দেন এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া শান্তি লাভ করেন। আসিতেছে। র তপস্যার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে লোকের ভিড় হইতে থাকে। ভিড় শিথিল হইয়া তিনি গুরুমূর্তির মন্দিরে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু নূতন স্থানেও রক্ষা কিছুই ঠিক নূতন উপসর্গ জুটিল। পিঁপড়া এবং পোকার উপদ্রব। এত অসুবিধা দেওয়া ...ন নির্বিকার। তাঁহাকে কিছু আরাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভক্তগণ কাঠের মন... তৈয়ার করিয়া দিলেন। দীর্ঘকাল শরীরের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় তাঁহার শরীর জীর্ণ হইল। চুল লম্বা হইয়া জট পাকিতে লাগিল। শরীরের প্রতি উদাসীন হওয়া কিংবা মৌনী হইয়া থাকা তাঁহার তপস্যার অঙ্গ নয়। তাঁহার ধারণা শরীরের প্রয়োজন সামান্যই এবং বলিবারও বিশেষ কিছু নাই। মৌনী হইয়া থাকিলে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার এড়ান চলে। একদিন এক নির্জন বাগানে বসিয়া ধ্যানে নিযুক্ত আছেন এমন সময় তেঁতুল চুরির উদ্দেশ্যে কয়েকজন চোর উহার ভিতরে ঢুকিল। তাঁহাকে দেখিয়া একজন বলিল, 'লোকটি চুরির বিষয় বাগানের মালিককে বলিয়া দিলে আমাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার চেয়ে যদি কোন বিষাক্ত দ্রব্য তাহার চোখে ঢালিয়া দেওয়া যায় তবে সে দেখিতে পাইবে না এবং আমরা নিরাপদে থাকিব।' ব্রহ্মণ্যস্বামী তাহাদের আলোচনা শুনিয়া কোন প্রকার প্রতিবাদ করিলেন না। অবশ্য ভগবৎ কৃপায় চোর তাঁহার কোন অনিষ্ট করে নাই।

ইহার পর পালানি স্বামী নামক জনৈক মালাবারের ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তিনি গণেশের উপাসক। সাধু সেবা সাধনার অঙ্গ মনে করিয়া তিনি ভাল ভাল মুখরোচক খাবার সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মণ্যস্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু

ব্রহ্মণ্যস্বামী সরল জীবন যাপনের এবং সাধারণ খাদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করা লোককে জুলুম করার সামিল। স্মতরাং এক খণ্ড কয়লা নিয়া তিনি নিজ মাতৃভাষায় লিখিয়া দিলেন, 'জীবন ধারণের পক্ষে সাধারণ খাবারই যথেষ্ট'। আন্নামালাই পূর্বে ব্রহ্মণ্যস্বামীর ভাষা জানিতেন না, এখন বুঝিতে পারিলেন তিনি তামিলভাষী। ভেঙ্কটরাম নামে অন্য একজন ভক্ত বহুদিন যাবৎ তাঁহার বংশ কুল শীল ভাষা এবং জাতি জানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। লেখা দেখিয়া তিনি জিদ্ ধরিলেন ঐ সমস্ত না জানা পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন না। তাঁহার তীব্র আগ্রহ দেখিয়া ব্রহ্মণ্যস্বামী শুধু বলিলেন, 'ভেঙ্কটরমণ, তিরুচী'। এই ভাবে হঠাৎ তাঁহার নাম ধাম ঠিকানা প্রকাশ হইয়া পড়ে। পূর্বে বলা হইয়াছে পালানি স্বামী মালাবারবাসী হইয়াও অনেক তামিল ধর্মপুস্তক যোগাড় করিয়া ব্রহ্মণ্যস্বামীর নিকট ধীরে ধীরে পড়িতেন। তিনি সেইগুলি এমন আকার ইঙ্গিতে বুঝাইতেন যে পালানি স্বামীর বুঝিতে কোন প্রকার অস্থবিধা হইত না।

ভিড় এড়াইবার জন্য পালানি স্বামী তাঁহাকে ভেঙ্কটরাম আয়ারের বাগানে রাখিয়া দেন এবং নিজে দূর হইতে তাঁহার সেবা করেন। ব্রহ্মণ্যস্বামী এখানে ছয়মাস কাল বাস করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার খবর দেশে পৌছিল। বহুকাল তাঁহার কোন খবর না পাইয়া আত্মীয়গণ উদ্বিগ্নে দিন কাটাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কাকা স্থব্বায়ার মারা গিয়াছেন। নেল্লিয়াপ্পা নামক অন্য এক উকিল আত্মীয় দেখিতে আসিয়া তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন—কৌপিন মাত্র সম্বল, মাথায় জটা, চেনা মুশকিল। বাড়ী ফিরাইয়া নেওয়ার সব চেষ্টা বৃথা গেল। নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার পর নিরন্তর ধ্যানে নিযুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মণ্যস্বামী পাহাড়ে একটা গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং মাধুকরী দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার সময় গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেন না। রাস্তার দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন খাইতেন এবং অবিলম্বে গুহায় ফিরিয়া আবার ধ্যানে বসিতেন।

বহু বৎসর পর প্রিয় সন্তানকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন মাতা আলগাম্মল পুত্রের কাছে আসিলেন, বাড়ী ফিরাইয়া নিবার বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু মায়ের চোখের জল বৃথাই গেল। পুত্রের মন গলিল না। তিনি বাড়ী ফিরিতে রাজী হইলেন না। মাতার কাতরতায় জনৈক ভক্তের অনুরোধে তিনি একটা কাগজে সান্ত্বনা-বাক্যে জানাইলেন, 'ভগবান প্রত্যেকের জন্মার্জিত কর্মানুযায়ী তাহার পথ নির্দেশ

করেন। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। কখনও অন্যথা হইবে না, যাহা ঘটিবার নয় তাহা কখনও ঘটিবে না। নিয়তির লিখন খণ্ডাইবার সাধ্য কাহারও নাই, উহা নিয়া মাথা ঘামাইবারও প্রয়োজন নাই। চুপ করিয়া থাকাই ভাল।' মা সব সময় ছেলেকে আপন ভাবেই পাইতে চান কিন্তু পান না। ছেলের দৃঢ়তা দেখিয়া হতাশ হইলেন। ইহার পর ব্রহ্মণ্যস্বামী বিরূপাক্ষ পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। উহা ধীরে ধীরে আশ্রমে পরিণত হইল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনধারারও আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটিল, তিনি আহারাদি বিষয়ে স্বাভাবিক লোকের মত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বের চেয়ে কঠোরতার মাত্রা শিথিল হইল। দর্শনার্থীর ভিড় এড়াইয়া চলেন না। পূর্বে কার্তিক মাসেই আকাশে প্রকাণ্ড প্রদীপ দেওয়ার উৎসব উপলক্ষে লোকের ভিড় হইত, এখন নিত্যই লোকের ভিড়। মনে হয় বার মাসই উৎসব লাগিয়া আছে। সুবিধা বুঝিয়া বিরূপাক্ষ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিকট তীর্থকর আদায় করিতে লাগিলেন। এরূপ অন্যায় কর সংগ্রহের কথা ব্রহ্মণ্যস্বামীর কানে উঠিতেই তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তবে তাঁহার প্রতিবাদের ধারা নীরব। পূর্ব হইতে চিঠি লিখিয়া কিংবা কাগজে ছাপাইয়া উপবাস করা নয়। তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। অবিলম্বে ইহার ফল ফলিল। যাত্রীর সংখ্যা একেবারে কমিয়া গেল। মন্দিরের আয়ের অঙ্কও শূন্যের দিকে চলিল। তখন বাধ্য হইয়াই মন্দির কর্তৃপক্ষ কর সংগ্রহ বন্ধ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের লাভই হইল। ব্রহ্মণ্যস্বামীর সঙ্গে আরও কয়েক জন অনুগামী ভক্ত থাকিতেন। যাত্রীরা দুধ, ফল এবং অন্যান্য খাদ্য যাহা লইয়া আসিতেন তাহাতেই তাঁহার এবং সঙ্গীদের চলিয়া যাইত। যখন যাহা মিলিত সকলেই তাহা ভাগ করিয়া খাইতেন।

এই সময়ে তাঁহার কবিত্বশক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কি করিয়া অরুণাচল শিবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হয় সেই সম্বন্ধে তিনি কবিতা লিখিলেন। তাঁহার রচিত 'আত্মনিবেদন বিধি' সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। একদিন দেখিলেন এক বৃদ্ধ খোঁড়া সুপুরুষ শিবভক্ত লাঠিতে ভর করিয়া অরুণাচলম্ পাহাড় অতিকষ্টে পরিক্রমা করিতেছেন। এমন সময়, এক সৌম্য ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'লাঠির প্রয়োজন নাই'। ভক্তটি তখন লাঠিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন কিন্তু শিবের কৃপাতে অনায়াসে চলিতে পারেন দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

ব্রহ্মণ্যস্বামীর সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়াছে। উপদেশ লাভের আশায় বহু ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। শেবায়ার নামক জনৈক ভক্তকে উপদেশ দিবার

উদ্দেশ্যে তিনি শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থখানি তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। আত্মীয় বিয়োগজনিত কাতর ভক্ত শিবপ্রকাশ পিল্লাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া দুঃখ ভুলিয়া যান এবং শান্তি লাভ করেন। সাক্ষী আম্মল নামক জনৈক স্ত্রীভক্ত স্বামী পুত্র কন্যা হারাইয়া পাগলের মত হন—তাঁহার উপদেশ মত জীবন যাপন করিয়া দুঃখ সহিবার মত শক্তি অর্জন করেন এবং শান্তি লাভ করেন। অন্য এক দিন জনৈক ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া ভুলে অন্য পথে চলিয়া যান। এমন সময় ব্রহ্মণ্যস্বামী তাঁহাকে সঠিক রাস্তা দেখাইয়া আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেন। উক্ত ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক আপন অভিজ্ঞতার কথা যাঁহাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন তাঁহারা শুনিয়া অবাক হইলেন কারণ ব্রহ্মণ্যস্বামী ততক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন।

ব্রহ্মণ্যস্বামীকে অনেক অপ্রিয় ঘটনারও সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বালানন্দ নামে জনৈক সাধু আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। নিজ মতলব হাসিল করিবার জন্য ব্রহ্মণ্যস্বামীর নাম ভাঙাইয়া কিছু উপার্জনের জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। লোকের সামনে চোখ বুজিয়া মস্ত যোগীর ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া সর্বসমক্ষে প্রচার করিতেন যে তিনি ব্রহ্মণ্য-স্বামীর গুরু এবং অভিভাবক। সাধারণ লোক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেক টাকা দিত। এইভাবে বহু টাকা সংগ্রহ করিলেন। ব্রহ্মণ্যস্বামী কোন প্রতিবাদ করিতেন না বলিয়া তাঁহার খুব সুবিধা হইল। এরূপ অসহ্য ভণ্ডামিতে ভক্ত পালানি স্বামীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, একটা অছিলায় বালানন্দের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইলেন। তখন সাধুর স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া তিনি ব্রহ্মণ্যস্বামীকে অকথ্য গালাগালি করিলেন এমন কি তাঁহার গায়ে থুথু দিতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করিলেন না। সিদ্ধমহাপুরুষকে অপমানের ফল সঙ্গে সঙ্গে মিলিল। পালানি স্বামী এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীরা মিলিয়া ভণ্ড সাধু বালানন্দকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। আপদ্ বিদায়ের পর আশ্রমে শান্তি আসিল। আর একদিন একজন সাধু আশ্রমে আসিলেন। তিনি উলঙ্গ থাকিতেন, কোন বিশেষ মতলব হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে সদা সর্বদা হাত উঁচু করিয়া থাকিতেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মণ্যস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি অন্ধকার। তাঁহার অভিসন্ধি জানিয়া ব্রহ্মণ্যস্বামী নিঃসংকোচে উত্তর দিলেন যে তাঁহার (প্রশ্নকারীর) অদৃষ্ট বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও অন্ধকার। উজ্জ্বল হইবার কোন আশা নাই। শরীরকে কষ্ট দিয়া কোন লাভ নাই, জীবনের

উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিকতা লাভ। সমস্ত মন শরীরের উপর থাকিলে ভগবানে মন যায় না।

একদিন আশ্রমের জানালার শিক বাঁকাইয়া কয়েকজন চোর ঘরে প্রবেশ করিল। চোরের প্রতি ব্রহ্মণ্যস্বামীর কোন বিদ্বেষ নাই। চোরকে কোন প্রকার বাধা না দেওয়ার জন্য তিনি আশ্রমবাসীদের বলিয়া দিলেন। তাঁহার কথার অর্থ না বুঝিয়া একজন চোর তাঁহার পায়ে ভীষণ আঘাত করিল। প্রচুর রক্তপাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য হারাইলেন না। আশ্রমের কুকুর ছাড়া থাকিলে পাছে চোরদের কামড়ায় আশঙ্কা করিয়া তিনি উহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলিলেন। প্রতিরোধের সাধ্য নাই এবং ভয়ে এরূপ আদেশ দিয়াছেন ভাবিয়া চোরের দুঃসাহস আরও বাড়িয়া গেল। চুরির সুবিধার জন্য আলো চাহিয়া নিয়া নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করিয়া চোর চলিয়া গেল। ব্রহ্মণ্যস্বামী আশ্রমবাসীদের বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। চোরের কাজ চোর করিবে কিন্তু যাহারা সদ্ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদের উচিত নিজ কর্তব্যে অবিচলিত থাকা। সৎ ব্যক্তি চোরের পথ অনুসরণ করিবে না। ধৈর্য ও ক্ষমা তাহাদের পথ। চোর সাধুর আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া সাধু নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে এমন কখনও হইতে পারে না। ধর্মের পথ জটিল। এই পথ অনুসরণ করিতে গিয়া কুটিলতার আশ্রয় নিতে নাই। দাঁত যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে জিভ কামড়াইয়া দেয় তাহা হইলে কি সমস্ত দাঁত উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে? উপায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য ধরিয়া থাকা, তবে শান্তি। ধৈর্যহীন এবং অবিশ্বাসীর শান্তি মিলে না।

ব্রহ্মণ্যস্বামীর পক্ষেই এরূপ ধৈর্য অবলম্বন করা সম্ভব। তিনি ভাল মন্দের অতীত। তিনি ধার্মিক এবং চোর সকলের মধ্যে একই আত্মার প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ সকলই এক বিশ্ব আত্মার বিভিন্ন রূপ মাত্র। সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতে হয়। বিশেষ কাহাকে ভালবাসিয়া এবং অন্যকে ঘৃণা করিলে সর্বভূতে তাঁহার অনুভূতি সম্ভব হয় না।

গণপতি শাস্ত্রী কাব্য, তর্ক এবং বেদান্তে সুপণ্ডিত, সৎ সংস্কার আছে. জপ ধ্যান যথেষ্ট করেন, বহু তীর্থ পর্যটনও করিয়াছেন কিন্তু মনে শান্তি নাই। জীবন কি, উহার উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহার মনে সংশয় আনিলে তিনি ব্রহ্মণ্যস্বামীর নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মণ্যস্বামী শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যদি কোন জিজ্ঞাসু সত্যসত্যই অহমিকা বৃত্তির উৎস অনুসন্ধান করেন এবং যতদিন পর্যন্ত

উহার সন্ধান না পান ততদিন অনুসন্ধান হইতে বিরত না হন তবে তিনি শান্তি পান। এই অনুসন্ধানই তপস্যা'। বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রীর চৈতন্যোদয় হইল। মনের অন্ধকার বিদূরিত হইল। গুরুর ব্যবহার এবং চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন। গুরুর প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। তিনিই ব্রহ্মণ্য-স্বামীকে রমণ মহর্ষিরূপে প্রচার করিলেন। আশ্রমে সকলে তাঁহাকে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করিতেন।

একদিন তিরুভটিওর মন্দিরে ধ্যান করিবার সময় গণপতি শাস্ত্রীর মনে হইল যদি এই সময়ে গুরুকে স্বচক্ষে দেখিতে পান তবে ধন্য হইবেন। ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। অবিলম্বে সম্মুখে গুরুকে দেখিতে পাইয়া শাস্ত্রী বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। অন্য একদিন রঘুবীর আচারিয়ার নামক জনৈক ভক্ত অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রমণ মহর্ষির সম্মুখে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলেন নিকটস্থ দেওয়ালে টাঙান দক্ষিণামূর্তি সহ রমণ মহর্ষি অদৃশ্য হইয়াছেন। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দেওয়ালে টাঙান ছবি সহ মহর্ষিকে পূর্বের মত উপবিষ্ট দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রমণ মহর্ষির অন্য একজন ভক্ত বহু জায়গায় তপস্যা করিয়া অবশেষে নিত্য গুরুর সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ পাইয়া তিরুভান্নামালাইতে ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা তাহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অন্যত্র বাসস্থান উঠাইয়া দিয়া তাঁহার মত আশ্রমে বাস করেন এবং গুরুর সান্নিধ্যে বাস করিয়া ধন্য হন। একদিন তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, 'যিনি রমণ মহর্ষিকে বিশ্বাস করেন না তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন'। কথাটার কদর্থ করিয়া যাহাতে ভক্তেরা বিপথগামী না হন সেইজন্য মহর্ষি বলিলেন, 'ব্রহ্মহত্যা মানে ব্রাহ্মণকে হত্যা করা নয়, মানুষের অন্তরে ব্রহ্ম আছেন তবে সুপ্তভাবে, ব্রহ্ম অনুভব করাই সকলের কর্তব্য, না করা গুরুতর পাপ'। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথায় উপস্থিত সকলে আশ্বস্ত হইলেন। তিরুভান্নামালাই হইতে কয়েক মাইল দূরে ভেলোরে এফ্ এইচ্ হাফিজ নামক বিশেষ সম্মানিত ইয়োরোপীয়ান পুলিস অফিসার নরসিংহায়া নামক রমণ মহর্ষির জনৈক ভক্তের নিকট তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিতেন। তিনি কখনও তিরুভান্নামালাই আশ্রমে যান নাই। কিন্তু একদিন স্বপ্নে মহর্ষিকে দেখিয়া শিক্ষকের নিকট আশ্রমের সবিশেষ বর্ণনা দিলেন, গ্রুপ ফটোর মধ্যে অবস্থিত মহর্ষিকে চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'মহর্ষির শরীর হইতে যেন একটা জ্যোতি বাহির হয়'। ইহার পর একদিন আশ্রমে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হইলে এফ্ এইচ হাফিজ জিজ্ঞাসা করিলেন,

'মানুষের পক্ষে জগতের সেবা সম্ভব কিনা'। উত্তরে মহর্ষি বলেন, 'জীব যখন পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব অনুভব করে তখন তাহার পক্ষে জগতের সেবা সম্ভব হয়, অন্যথা নয়'।

ইতিমধ্যে মাদুরায় মহর্ষির পূর্বাশ্রমে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোন কারণ-বশতঃ পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মাতা আলগাম্মল অনন্যোপায় হইয়া আশ্রমে আসিয়া পুত্রের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব আশ্রমের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে না ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি মানুষ। হৃদয়ও মানুষের, সুতরাং হৃদয়ের বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাহাদের উদার স্বভাব তাহাদের পক্ষে ত নয়ই। দেখা যায় মহাপুরুষ মাত্রেই নিজ নিজ মাতাকে সব সময়ে সাক্ষাৎ ভগবতী রূপে পূজা ও সম্মান করেন। রমণ মহর্ষির বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তিনি মাতাকে বিশ্বজননীর অংশ রূপে জানিয়া তাহাকে সেবা করিতেন। আশ্রমের পরিবেশে বাস করিয়া মারও হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিল। স্নেহের আধিক্যে কখন কখন ভুল হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মা নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতেন। দিন দিন মার হৃদয় উদার হইল। আশ্রমবাসীদের নিজ সন্তানের মত দেখিতেন। একদিন মাতা আলগাম্মল পুত্রের নিকট বসিয়া আছেন, হঠাৎ মনে হইল তাহার স্নেহের পুত্তলি নাই। কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার স্থানে একটা শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এমন সময় আশঙ্কার কারণ বিদূরিত হইল। পুত্রকে যথাস্থানে দেখিতে পাইয়া পূর্বের ন্যায় আশ্বস্ত হইলেন। আর একদিন দেখিলেন তাঁহার পুত্রের শরীর জ্যোতির্ময় লিঙ্গের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার গলায় দুইটা বিষধর সর্প জড়াইয়া আছে। ঘটনার সমাবেশে ক্রমশঃ মাতার মনে হইল তাহার পুত্র সাধারণ মানুষ নয়। তাহার মধ্যে দেবতার আবেশ হইয়াছে। পুত্রের প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন রমণ মহর্ষি ততদিন তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। শেষ সময়ে বেদপাঠ শ্রবণ করাইয়াছেন। রাম নামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাম নাম শুনিতে শুনিতে মাতা অমর ধামে চলিয়া গেলে তাঁহার দেহের যথাবিধি সৎকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মাতৃবিয়োগে কাতর হইলেন না। তিনি জানিতেন মায়ের আত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই।

রমণ মহর্ষির দৈনন্দিন কার্যধারা হইতে তাহার জীবনের আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা ত্যাগ। তিনি ত্যাগ বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ত্যাগ মানে বাসনা ত্যাগ। ইহকালে, পরকালে যত প্রকার শারীরিক ও মানসিক বাসনা আছে সব ত্যাগ। এই ত্যাগ বলিতে গৃহ ত্যাগ কিংবা বেশ পরিবর্তন নয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ দ্বারা আত্মার অমরত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যেমন যখন যে অভিনয় করিতে হইবে সেই ভাবে সাজগোজ করিয়া অভিনয় করেন এবং অভিনয় শেষ হইলে পূর্বের স্বাভাবিক পোশাক পরেন, নিষ্কাম অভিনেতাও সেইরূপ সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেষের পর মঞ্চ ত্যাগ করিয়া নিজ আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কিছুতেই লিপ্ত হন না।

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই রমণ মহর্ষির সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য ভারতবর্ষ এবং ভারতেতর পাশ্চাত্য দেশ হইতে ক্রমশঃ দর্শনার্থী আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহর্ষির সম্বন্ধে ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি সম্বন্ধে পল ব্র্যান্টনের 'এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া' এবং অসবন লিখিত বই খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মহর্ষির সহিত 'দৈনন্দিন ইনটারভিউ' নামক পুস্তকখানিতে ভক্তদের প্রশ্ন এবং মহর্ষির উত্তর বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। একদিন জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 'সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি নৈতিক সূত্রগুলি পালন করিলে জীবন পূর্ণতা লাভ করে কিনা'। উত্তরে মহর্ষি বলিলেন, 'নৈতিক সূত্র অসংখ্য, যখন অসংখ্য এককে সংখ্যায় দাড়াইবে তখনই জীবন পূর্ণ হইবে। বহুর জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। একের জ্ঞানই জ্ঞান। বহুর জ্ঞান একের জ্ঞানে পরিণত হইলে তবে মুক্তি এবং মুক্তি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। মুক্তিই পূর্ণতা, মুক্তি বিশ্বাত্মবোধ, সমার্থবাচক'। অন্য এক দিন জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 'মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়'? উত্তরে মহর্ষি বলিলেন, 'এ রকম প্রশ্ন অনর্থক। জীবিত অবস্থায় আত্মা কি, উহার স্বরূপ কি তাহা না জানিয়া মৃত্যুর পর আত্মার কি হইবে তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? জীবন থাকিতেই আত্মাকে জানা উচিত। আত্মার জ্ঞান মানে বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। আত্মা, বিশ্ব, ব্রহ্ম একার্থবোধক। আত্মাকে জানিলে অপর সব জানা যায়। আত্মজ্ঞানের প্রধান সোপান বিবেক বৈরাগ্য। বিবেকের উদয়ে অপবিত্র ভাব দূর হয়, জ্ঞানের কপাট খুলিয়া যায়। উহাই ব্রহ্মজ্ঞানের চাবিকাটি'। মহর্ষির রচিত 'আমি কে' ছোট পুস্তিকাতে তাঁহার শিক্ষার মূল কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার উপদেশের মর্ম চল্লিশ শ্লোকী তামিল কবিতায় সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এখন বহু

ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁহার শিক্ষার সার কথা অনেকাংশে মিলিয়া যায়।

কোন আগন্তুক আশ্রমে পদার্পণ করিলে অবিলম্বে আশ্রমের বিশুদ্ধ আবহাওয়া অনুভব করেন। গীতোক্ত সমদর্শনের লক্ষণ তাঁহার জীবনে প্রকট দেখা যায়। পশু পক্ষী জানোয়ার, কোপি, বৃক্ষাদি, সকলের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল, তিনি সকলের সেবা করিয়া আনন্দ পাইতেন।

জীবনের শেষ ভাগে একটা বিষাক্ত বিস্ফোটক হইয়া তিনি বিশেষ কষ্ট পান। পরে উহা দুরন্ত ক্যান্সার রোগে দাঁড়ায়। চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সকল শারীরিক কষ্ট তিনি নীরবে সহ্য করেন। কখন কখন উপহাস করিয়া বলিতেন, 'এ দেহ কলাপাতার ন্যায়। যত ভোজ্য আছে—সব কলাপাতায় সাজাইয়া দেওয়া হয়। ভোজনান্তে পাতার প্রয়োজন ফুরায় এবং উচ্ছিষ্ট দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জীবনের ভোজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহের প্রয়োজন, ভোজ শেষ হইলে উচ্ছিষ্টের ন্যায় উহাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে কোন দুঃখ হয় না, আত্মজ্ঞানে দেহ ধারণের উদ্দেশ্য সফল হয়। জ্ঞানলাভের পর দেহের জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। সকলেই বলে "আমি মরিয়া যাইতেছি" কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় আমি কোথাও যাইতেছি না, কোথায় যাব? যেখানে আছি সেখানেই থাকিব'। এত কষ্টের মধ্যেও তাঁহাকে নির্বিকার দেখিয়া অনেকে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শরীর ত্যাগের দুই দিন পূর্বে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় তিনি ডাক্তারকে বলেন, 'দুই দিনের মধ্যে সব ঠিক হইয়া যাইবে'। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে। সকলেই উদ্বিগ্ন। ভক্তেরা চারিদিকে ঘিরিয়া অরুণাচলম্ শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহর্ষি ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'সন্তোষম্, আপনাদের ধন্যবাদ'। পরে তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইলে তিনি শুধু উচ্চারণ করিলেন, 'ওঁ'। ১৯৫০ সালের ১৪ই এপ্রিল ভক্তদের দুর্দিন। তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। আত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া গেল। জীবন অতিজীবনে পূর্ণতা লাভ করিল। ফটো তোলার দোহাই। ফটো নিতে গিয়া দেখেন উজ্জ্বল তারার মত একটা জ্যোতি ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলাইয়া গেল।

॥ দুই ॥

সুন্দরার

বহু পুরাতন কাল হইতে হিন্দুরা বিধবা বিবাহ বিধিকে খুব পবিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। এই বিধি আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, ইহকালে শেষ হয় না, মৃত্যুর পরে এমন কি জন্মান্তরেও স্বীকৃত। পারিবারিক সংহতি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য গৃহ্যসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র বহু জিনিসের অবতারণা করিয়াছেন। তার মধ্যে দশবিধ সংস্কারাদির অন্যতম বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্বাদি আট প্রকার বিবাহ প্রথার মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্যাদি প্রথায় শাস্ত্রের সম্মতির এবং রাক্ষস পৈশাচাদি প্রথায় নিন্দার কথা আছে। এখনকার মত রেজিস্টার্ড বিবাহ কন্‌ট্রাক্ট প্রথা, কাবিননামা লিখিয়া দিয়া বিবাহ করিবার প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া স্বামী যাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেন তাহার সাংসারিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিকাদি সকল বিষয়ের ভার নিতেন এবং স্ত্রী যাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিতেন আজীবন তাঁহার প্রতি সর্ব বিষয়ে অনুগত থাকিতেন। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা তখন ছিল না বলিলেই চলে। তবে বিবাহ বিভ্রাট যে ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সামাজিক প্রথা অনুযায়ী সুন্দরারের পিতামাতা পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী ঠিক করিয়া তাহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিবাহের সব ঠিক, আত্মীয়-স্বজন সকলে বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত। উৎসবের নানারকম বাজনা বাজিতেছে। ছেলে-মেয়ে, পাড়া-পড়শী আনন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছে। কুটুম্ব ভোজনাদি সব নিয়মিত হইতেছে। কোথাও কোন অব্যবস্থা নাই। সব সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। চারিদিকে আনন্দের হাট-বাজার। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ সকলে শুভলগ্নের অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটিল। লগ্নের পূর্ব মুহূর্তে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে না। মনে হয় নিয়তি অলক্ষ্যে কলকাটি নাড়িয়া হয় কে নয় এবং নয় কে হয় করিতেছেন। নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়। সকলেই নিয়তির বাধ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি যেন

দেখাইতে চান জগৎ তাঁহারই অঙ্গুলি হেলনে চলিতেছে। অনিত্য জগতের পিছনে ছুটিয়া কোন লাভ নাই, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার জন্য তিনি যাহার জন্ম পরিগ্রহ করাইয়াছেন তাহার পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চলে না। শুভলগ্নের পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দাবি করিলেন যে বর তাহার দাস। দাসখতের নিয়ম অনুযায়ী মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাস বিবাহ করিতে পারে না। করিলে তাহাকে সত্য ভঙ্গের অপরাধে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার নিকট দাসখতের দলিল আছে তাহা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত থাকুক। প্রমাণ হইলে বিবাহ চিরতরে বন্ধ থাকিবে, আর যদি প্রমাণ না হয় তবে উভয় পক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ পরে শুভ লগ্নে বিবাহ হইবে। ব্রাহ্মণ দলিল দাখিল করিলেন। বহু নিরীক্ষণের পর ঠিক হইল দলিল সত্য। বিবাহ আর হইল না। কখন দলিল হইয়াছে, কোথায় হইয়াছে, তাহার শর্ত কি সুন্দরবার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবাক হইয়া রহিলেন। যন্ত্রচালিত হইয়া যেন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিলেন। নিকটস্থ শিবের মন্দিরে পৌঁছিয়া সুন্দরবার দেখিলেন বৃদ্ধ যেন শিবের অঙ্গে মিলাইয়া গেলেন। তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। দৃঢ় ধারণা করিলেন ভগবান যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য, ইষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া তাঁহাকে সংসার পাক হইতে উদ্ধার করিলেন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি শিবের হাতের পুতুল, ইষ্ট হইতে তাঁহার পৃথক সত্তা নাই।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁহার নাম সুন্দর মূর্তি। ৬৩ জন নায়নারের (শিবভক্তের) অন্যতম। মাদ্রাজ হইতে দুইশত মাইল দূরে দক্ষিণ আরকট জেলার অন্তঃপাতী তিরুনাভালুর নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ শিবের ভক্ত এবং নিষ্ঠাবান্। পুত্র সুন্দর মূর্তিও বংশের ধারা পাইয়াছেন। অপূর্ব রূপ ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সুন্দরার হয়। ব্রাহ্মণ বংশের ধারা অনুযায়ী তাহাকে বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঘটনা অল্পই জানা যায়। বিবাহ মণ্ডপের ঘটনা তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়াছে। ভগবানের যন্ত্র হিসাবে তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছে, তাঁহার প্রেরণায় চলিতে হইয়াছে। তিনি পায়ে হাঁটিয়া এক শতেরও অধিক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। শিব মন্দির দর্শন করিয়াছেন। যখন যে শিবের মন্দিরে গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া সুর তান লয়ের সহিত আবেগ ভরে গাহিয়াছেন। তীর্থ

পরিক্রমায় বাহির হইয়া পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত গিয়াছেন। সেখানকার রাজা চেরামন পেরুমল তাঁহার ভাব ভক্তি ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হন।

তীর্থ পরিক্রমা করিতে করিতে তিনি তিরু বাটিশি নামক স্থানে উপস্থিত হন। স্থানটি মনোরম এবং সাধন ভজনের অনুকূল দেখিয়া তিনি তথায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। বিবাহ মণ্ডপে তাঁহার ইষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত হইয়া যেমন তাঁহাকে সংসার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া দেন, এখানেও ইষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে দর্শন দিয়া বিমল আনন্দ দান করেন। এখান হইতে তিনি প্রসিদ্ধ তীর্থ চিদাম্বরমে যান। এবং নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা দিয়া শিবের মহিমাসূচক সুন্দর গান রচনা করিয়া আবেগ ভরে গাইতে থাকেন। এইখানে তিনি অন্তরের বাণী শুনিতে পাইয়া তিরুভালুর নামক স্থানে আসিয়া শিবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে আবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। ইহার পর তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার পরিপূর্ণ সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ। এই বোধে প্রথমে জীবন, পরে মৃত্যু তার পরে অমৃত। মানুষ এই অমৃতের অধিকার লাভ করিতে পারে এবং নিজের সত্য পরিচয় পাইতে পারে। কিন্তু এই ধর্মের পথ কঠিন। তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপর দিয়া চলা যেমন কঠিন, ধর্ম পথে চলা ততোধিক কঠিন। যাঁহারা অক্ষত অবস্থায় চলিতে পারেন তাঁহারা ধন্য। যাহারা এরূপ চলিতে গিয়া ক্ষতবিক্ষত হন তাঁহাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে যতটুকু নিষ্কণ্টকভাবে চলিয়াছেন তাহা বৃথা যায় নাই। সুন্দরারের পথ নিষ্কণ্টক হয় নাই। কুগ্রহ পথের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনকে কিছুকালের জন্য বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। বনেমিকণ্টনাথন নামক স্থানে থাকিবার কালে তিনি কোন দেবদাসীর পাণিগ্রহণ করেন। নবপরিণীতা বধূর সহিত তিনি কিছুকাল বাস করেন। বিবাহ করিতে গিয়া বিপর্যয় ঘটাতে যিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি কেন স্বেচ্ছায় বিপদ ডাকিয়া আনিলেন তাহার রহস্য কিছুই বুঝা যায় না। বিবাহের পর কোন নির্দিষ্ট আয়ের সংস্থান না থাকায় তিনি ভীষণ আর্থিক কষ্টে পতিত হইলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সাহায্য আসায় তাঁহার কষ্টের কিছু লাঘব হইল। শিবের কৃপায় তাঁহার আবার মনের গতির পরিবর্তন হইলে তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। পথ চলিতে চলিতে মাদ্রাজের নিকটে তিরুভটাওর নামক স্থানে তিনি আসিয়া পড়েন। এখানে আবার বিপর্যয় ঘটে। মনে হয় গ্রহের অভিশাপ তাঁহার উপর পতিত হইল। ব্রাহ্মণ হইয়াও এখানে এক কৃষক কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ

হন। তাঁহার মত ব্যক্তির কেন এরূপ বিপর্যয় ঘটে ইহার কারণ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয়ত মহামায়া কাহাকেও রেহাই দেন না বলিয়া তাঁহাকেও দেন নাই। এখানে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায়। শারীরিক দৃষ্টিহীনতার চেয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনতা অধিকতর শোচনীয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি লাঠিতে ভর করিয়া চলিতে চলিতে তিরুভালু শিবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অনন্যমনে আবেগভরে শিবের ভজন করিলেন। শিবের কৃপায় অন্ধ চিন্তা দূর হইয়াছে। তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে কাঞ্চিপুরম্ একাম্বর নাথ শিবের শরণাপন্ন হইলেন, এখানে ইষ্টের কৃপায় এক চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। শিবের মহিমা কীর্তন করিতে আবার তিরুভালুরে ফিরিয়া আসিলে শিবের কৃপায় তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। এখানে চেরামন পেরুমলের সঙ্গে দেখা হয়, তখন উভয়ে আবার তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়া নানাস্থানে শিবের মহিমাসূচক ভজনে দিন অতিবাহিত করেন। উভয়ে তিরুভানচিয়াকুলক নামক স্থানে পৌছিলেন। এখানে যেন সুন্দরার পায়ের ডাক শুনিলেন। নির্জনে থাকিয়া সম্পূর্ণ মন দিয়া শিবের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে এক শুভ দিনে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

সুন্দরার প্রায় একশত তেভারম্ রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিভাব, ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলেও তাঁহার রচনা তামিল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বিপর্যয় ঘটিলেও তিনি ইষ্টের কৃপায় আধ্যাত্মিকতার মূল্য বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, ধর্মপথে মাঝে মাঝে বিপর্যয় আসিলেও সব সময়ে সতর্কতা অবলম্বনের দরকার, ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে বিপদ কাটিয়া যায়, ইষ্টের কৃপা, আশীর্বাদ মিলে। জীবন সার্থক হয়। শান্তি আসে।

॥ তিন ॥

আপ্পার

বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যানুযায়ী শ্রম বিভাগের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সংকীর্ণতামুক্ত হইলে সমাজ উন্নতি করিয়া থাকে। এরূপ উন্নত সমাজে উচ্চ নীচ, বড় ছোট, ধনী নির্ধনীর প্রশ্ন আসে না. ধর্ম ও সমাজ সেবায় প্রত্যেকের অবদান থাকে। ক্ষত্রিয় শৌর্যবীর্যের দ্বারা শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করেন বলিয়া অন্যের

চেয়ে অধিক সম্মানের দাবি করিতে পারেন না কিংবা ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পাঠ এবং পূজা ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার যোগ্য একথাও বলা চলে না। আর যিনি ফসল উৎপাদন দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া সমাজ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সেবা করেন চাষী হইলেও তিনি অন্যের চেয়ে কোন অংশে হীন একথা স্বীকার করা চলে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য কাহাকেও উপেক্ষা করা চলে না। দেখা যায় মানুষ বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়া একটা ঐক্য খুঁজে। 'শিবম্' সেই ঐক্য, কিন্তু এই শিবকে জানার মধ্যে মহৎ ভয় বিদ্যমান। তথাপি ইহার মধ্যে আছে ধর্মবোধের জন্ম, প্রকৃত শান্তির পথ, সত্যের সুষমা, জীবন মৃত্যুর মিলন, প্রেমের বিস্তার। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বুঝা যায় প্রত্যেকেই কোন না কোন ক্ষেত্রে উৎপাদক, চাষী। মানব দেহ সব চেয়ে উর্বরা জমি। এই জমির আবাদ করে না এমন কেহ নাই। দেহধারী মাত্রেই এই জমিতে চাষ দেন, ফসল ফলান। তবে বুদ্ধিমান্ এই জমিতে সোনা ফলান, জ্ঞানের লাঙল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করেন, সত্যের বীজ রোপণ করেন, ভক্তির জল সিঞ্চন করেন। মিথ্যারূপ আগাছাগুলি উৎপাটন করেন, সততার ঘেরা দিয়া ফসল রক্ষা করেন। অবশেষে এমন ফসল ফলান যাহার মূল্য নির্ধারণ কখনও সম্ভব হয় না। দেহটাকে ভগবানের মন্দির মনে করেন বলিয়াই এরূপ আবাদ করিয়া থাকেন এবং ফসল যাহা পান তাহা আর কিছু নয়, সাক্ষাৎ ভগবান্; অনন্ত সুখ, মোক্ষ, শান্তি, ইহার ক্ষয় নাই, বিশ্বাস নাই। ইহা শাশ্বত, নিত্য, অবিনাশী এবং আনন্দময়। যে মহাপুরুষের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তিনি এই সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া নিজ দেহকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'হে মস্তক, তুমি শিবের নিকট শির নত কর; হে চক্ষু, তুমি সর্বত্র তাঁহার মহান্ রূপ দর্শন কর; হে কর্ণ, তুমি চারিদিকে তাঁহার মহিমা শ্রবণ কর। তিনিই একমাত্র প্রিয়, আপনার, তাঁহার চেয়ে প্রিয় কেহ নাই। তিনিই শ্রেষ্ঠ তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। মৃত্যু যখন শিয়রে আসিবে তখন একমাত্র তিনিই কৃপাবারি সিঞ্চনে তোমায় রক্ষা করিবেন। তাঁহার কৃপাতেই তুমি মানব দেহরূপ উর্বর জমি লাভ করিয়াছ। এই জমিতে সত্যের চাষ কর। তাহা হইলে আখেরে দুঃখ পাইতে হইবে না।' বাংলার সাধক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, 'মনরে কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জনম রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।'

এই আখ্যায়িকার নায়ক আপ্পার কৃষকের ঘরেই জন্ম নেন। মানব দেহ কর্ষণ করিয়া অমলা ফসল ফলাইয়াছেন। তেবারীজন নায়নারের প্রসিদ্ধ চারজনের

একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। নায়নারগণ ধর্মজগতে অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্মহীন সমাজে নব প্রেরণা আনিয়াছেন, সাহিত্যে নূতব ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছেন, নাস্তিক্য বুদ্ধি দূর করিয়াছেন, আস্তিক্য বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়াছেন। প্রায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ আরকট্ জেলার অন্তর্গত তিরুবামুর গ্রামের বিখ্যাত ভেল্লেটা বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম পুগালানার (অর্থাৎ বিখ্যাত) এবং মাতার নাম মাথিনীয়ার। আপ্পার পিতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমে তাঁহাকে মারুনিকিয়ার (অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশক) নামে ডাকা হইত। পল্লব রাজ্যের সৈন্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী কালীপাগীয়ার-এর সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তিলকবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ভগ্নীর বিবাহের পর পিতা পুগালানার মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মাতা মাথিনীয়ার স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া সতী হন। পারিবারিক বিপর্যয়ে আপ্পার বাল্যকালেই পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। ভগ্নীপতি কালীপাগীয়ারও যুদ্ধে নিহত হন। ভগ্নী তিলকবতী নিজমাতা মাথিনীয়ারের পথ অনুসরণ করিয়া সতী হইবার সংকল্প করেন কিন্তু ছোট ভাই আপ্পারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তখন তিলকবতীই ছোট ভাইয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং স্নেহ সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে পুষ্ট করেন। তিনি পুণ্যবতী রমণী। পবিত্র জীবন যাপন করিয়া নিয়ত ভগবৎ ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন।

ঐ সময়ে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রভাব সর্বসাধারণের মধ্যে খুব বিস্তারলাভ করিয়াছে। রাজ-আনুকূল্যই প্রধান কারণ। ধর্মের গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান সামান্যই ছিল কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জৈনেরা কতকগুলি নূতন উপায় অবলম্বন করেন। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উচাটন বশীকরণাদি তাহাদের অন্যতম। সাধারণ লোক ইহার আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিত। বাল্যাবস্থায় কোন জৈন আপ্পারকে চুরি করিয়া তাহাদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র পাটলীপুত্রে লইয়া যায় এবং জোর করিয়া তাহাকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করে। অবস্থার বিপাকে বাধ্য হইয়াই আপ্পার জৈনদের ধর্মমত শিক্ষা করেন, জৈন ধর্মের সপক্ষে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাদের ধর্ম প্রচার করেন। জৈনরা সুবিধার জন্য তাঁহার পূর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নামে অভিহিত করেন। তিনি জৈনদের নিকট ধর্মসেন নামে পরিচিত। আপ্পারের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া পল্লব বংশের রাজা মহেন্দ্রবর্মা নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহিত জীবনে আপ্পার যোগীই রহিলেন

হইতে পারেন নাই। জৈনদের কূটনীতির বহু পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সেইজন্য তিনি তাহাদের উপর অতিশয় বিরক্ত হন। অনিচ্ছায় তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক কিছুর সীমা আছে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

তিনি কঠিন শূলবেদনায় আক্রান্ত হইলেন। নানা চিকিৎসা, মন্ত্রোচ্চারণ কোনটাতেই বেদনার উপশম হইল না। সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল। অন্তরে ভয় হইল। অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হইল। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল স্বধর্ম পরিত্যাগ করিবার পাপেই ভগবানের কোপে পড়িয়া এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। বাঁচিতে হইলে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের দরকার। এখনও সময় আছে। জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি এখনও স্বধর্মে (হিন্দুধর্মে) ফিরিয়া যান, হয়ত বাঁচিতে পারিবেন। পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। একদিন সুযোগমত জৈনদের অজ্ঞাতে সরিয়া পড়িলেন এবং স্নেহময়ী ভগ্নী তিলকবতীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে ভগ্নী হারানো মানিক ছোট ভাইকে পাইয়া বুকে তুলিয়া নিলেন। আপ্পার স্বধর্ম ত্যাগের অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভাই-ভগ্নী উভয়ে শিবের নিকট কাতর প্রার্থনা করিলেন। বোধ হয় ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনায় শিব তুষ্ট হইলেন। তাঁহার কৃপায় আপ্পার শীঘ্রই রোগমুক্ত হইলেন। আপ্পার স্থির করিলেন বাকী জীবন শিবের ধ্যান ও ভজনে কাটাইয়া দিবেন।

শিকার হস্তচ্যুত হইলে শিকারী দিক্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। খপ্পর হইতে পলাইয়া আসায় জৈনরা অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। আপ্পারকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে আবার ধরিয়া আনিতে নূতন ফন্দী করিলেন। লোক লাগাইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে জৈনদের প্রতি রাজ-আনুকূল্য প্রবল ছিল। রাজা কিংবা উচ্চ রাজকর্মচারীর সহানুভূতি থাকিলে প্রোপাগাণ্ডা মেশিনারী সহজে হাতে আসে। ঐ মেশিনারীর জোরে হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করা যায়। জৈনদের সেই সুবিধা যথেষ্ট ছিল। পল্লবরাজ কাডারের সাহায্যে আপ্পারকে আবার ধরিয়া আনা হইল। অত্যাচার করিবার সুবিধা হইল। প্রতিপক্ষকে কাবু বা বেইজ্জৎ করিবার সুযোগ পাইলে কোন বুদ্ধিমান্ ক্ষমতাপ্রিয় নেতা ছাড়ে না। নিজের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য সত্যকে পিষিয়া মারিতে চায়। বড় আদর্শের নামে বঞ্চনা, প্রতারণা, গোঁড়ামির আশ্রয় নেয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত নেতৃত্বের ধারা মারাত্মক। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে উপায় জৈনরা

অবলম্বন করিয়াছিল তাহা শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। হরিনাম করিবার অপরাধে প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নির্যাতিত হয়। এই নির্যাতন তাহার চেয়ে কোন অংশে কম নহে। আপ্পারকে জলন্ত ইটের ভাটিতে নিক্ষেপ করা হয়, তীব্র বিষ মিশ্রিত পানীয় দেওয়া হয়, মত্ত হস্তীর পদতলে রাখা হয়। অহিংসা যাহাদের ধর্ম তাহাদের এরূপ গর্হিত আচরণ কেন তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝা কঠিন। ধর্মের আবরণে কি যে ভীষণ হিংস্রতা থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না। এইচ্. জি. ওয়েলস্ বলিয়াছেন, ধর্মের নামে পৃথিবীতে যে পরিমাণ মারা-মারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, যুদ্ধ, ধ্বংস হইয়াছে তাহা অন্য কিছুতে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। ক্রুসেড্ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত, এরূপ গোঁড়ামি ধর্মের, সমাজের, সভ্যতার কলঙ্ক। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা আপ্পারের প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এদিকে আপ্পারের দুরবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে, সহানুভূতিতে হৃদয় গলিয়া যায়। একমাত্র শিবের কৃপায় আপ্পার এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারিয়াছেন। সহন-শক্তির দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে সত্য, সরলতা, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, বিশ্বাস ইত্যাদি ধর্মের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বে নিষ্ঠা থাকিলে ভগবৎ কৃপায় মানুষ যে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। যতবার জৈনরা তাঁহাকে নূতন নূতন বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন ততবার তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিমাসূচক নূতন নূতন গান রচনা করিয়া প্রাণের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছেন। শিবের ধ্যানে মন লিপ্ত থাকিত বলিয়া হয়ত তাঁহার শরীরে তেমন কষ্ট হয় নাই কিংবা কষ্ট হইলেও শিবের কৃপায় উহা সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পতাকা যাঁহাকে তিনি দিয়া থাকেন তাঁহাকে তিনি তাহা বহন করিবার ক্ষমতাও দিয়া থাকেন। আপ্পারের বিশেষত্ব ছিল যে তিনি অত্যাচারীর প্রতি কখনও বিরূপ ভাব পোষণ করেন নাই। ইহা যে প্রকৃত ভগবৎ ভক্তির লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। একবার জৈনরা আপ্পারের গলায় একটি ভারী পাথর বাঁধিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু আপ্পার শিবের পঞ্চাক্ষর-যুক্ত মন্ত্র জপিতে লাগিলেন। জলের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তিনি সমুদ্রকূলস্থ করাইয়ার ভিট্রিকুপম্ নামক স্থানে পৌঁছিলেন। শিবের কৃপায় জীবন রক্ষা পাইয়া তিনি ভগ্নী তিলকবতীর বাড়ীতে আসিলেন। আপ্পারকে দ্বিতীয়বার ধরিয়া নেওয়ার পর তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ভাইয়ের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি নিরন্তর শিবের ধ্যানে রত থাকিতেন। পুনরায় ভাইকে পাইয়া বুকে তুলিয়া নিলেন। শিবের মহিমায় হৃদয়

আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অলৌকিকভাবে আপ্পারের জীবন রক্ষা হইয়াছে এ খবর গোপন রহিল না। পল্লবরাজ কাডারের কানে উঠিল। বার বার নিরপরাধ হিন্দু-ভক্তকে অকথ্য অত্যাচার করিবার অপরাধ তাঁহার বিবেককে দংশন করিল। অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া কি করিয়া এই দুষ্কৃতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহার জন্য কাডার অনন্যোপায় হইয়া ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভগবানের হয়ত কৃপা হইল। তাঁহার মনে পরিবর্তন আসিল। তাঁহার ধারণা হইল হিন্দু দেব-দেবী সত্য, তাঁহাদের কৃপা প্রত্যক্ষ, তাঁহাদের মাহাত্ম্য সমধিক। অতঃপর তিনি জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলেন। আপ্পারের প্রেম জয়ী হইল। তাহার পরশ লাগিয়া পল্লবরাজ কাডারের বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হইল। আস্তিক্য বুদ্ধি নাস্তিক্য ভাব দূর করিল।

আপ্পারের ভগবৎ ভক্তির পরীক্ষা অনেক হইয়াছে। তিনি কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদিন যে আপনমনে সুর সাধনা করিয়াছেন, নিরন্তর ভজন, প্রার্থনা এবং ধ্যানে জীবন কাটাইয়াছেন তাহা বৃথা যায় নাই। শিব কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সাধনা সমাপ্ত হইয়াছে। ফলও মিলিয়াছে। তিনি নিঃস্বার্থ প্রেমিক, জনকল্যাণে সাধনলব্ধ ফল অকাতরে দান করিয়াছেন। ভগবৎ মহিমা প্রচার দ্বারা নাস্তিক্য ভাব দূর করিয়াছেন। সুরের সাধনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তীর্থ ভ্রমণ, মন্দিরের দেবদেবী দর্শন, এবং শিবের মহিমাসূচক গান রচনাদি তাঁহার প্রচারের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। তীর্থ-ভ্রমণকালে একদিন সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত নায়নার তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের বয়স অতি অল্প, শরীর অতিশয় কোমল। পায়ে হাঁটিয়া তীর্থদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। পাল্কিতে চড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক যাত্রী ছিল। আপ্পার চুপি চুপি পাল্কি বাহকদের দলে যোগ দিলেন। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর আপ্পারের ভক্তি ও তপস্যার কথা জানিতেন। পথে একস্থানে তিনি পাল্কি বাহকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপ্পার কোথায় থাকেন?' অবিলম্বে আপ্পার উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি'। শব্দটি কানে যাইবামাত্র কোমল শরীরধারী অল্পবয়স্ক শিবভক্ত তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর পাল্কি হইতে নামিয়া 'আপ্পার, হে পিতা', সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আপ্পার নামে পরিচিত হইলেন। পূর্বে মারুনিকার নামে সকলে তাঁহাকে জানিত। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায় দুই মহাপুরুষের মিলন ঘটিল।

তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের ন্যায় আপ্পারেরও বহু অলৌকিক শক্তি ছিল। আপুডি

আডিগাল নামে জনৈক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আপ্পারকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। নিত্যদর্শন এবং নামশ্রবণ মানসে তিনি নিজ পুত্রেরও নাম রাখিলেন 'আপ্পার'। তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া পথে একদিন আপ্পার উক্ত আপুডি আডিগালের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া অতিথি হইলেন। অতিথি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁহার সেবা ভগবৎ সেবার তুল্য। তাঁহার সৎকারের জন্য কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পুত্রকে কলাবাগানে পাঠাইলেন। হঠাৎ সর্পাঘাতে পুত্রটির মৃত্যু ঘটিল। একদিকে অতিথি-সৎকারে বিপত্তি অন্যদিকে প্রিয় পুত্রের মৃত্যু। উভয় সঙ্কট। গৃহস্থের পক্ষে অতিথি সেবা মহৎ ধর্ম, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয় বড়। অতিথি সৎকারে ব্যতিক্রম ঘটিবে ভাবিয়া আপুডি আডিগাল পুত্রের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিলেন। তাঁহার সমধর্মিণীও স্বামীর মত ধর্মপরায়ণা। সকল সময়ে স্বামীর ধর্মকার্যে সাহায্য করেন। এমন প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। বিন্দুমাত্র চোখের জল ফেলিলেন না। অতিথি বিদায় গ্রহণ করিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া চোখের জলে পুত্রের প্রতি কর্তব্য সারিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু অতিথিও যেমন তেমন অতিথি নয়। তিনি ভগবৎ-ভক্ত। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি কলাবাগানে ঢুকিয়া শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া প্রাণের আবেগে গাহিলেন। ভক্তের প্রার্থনা ভগবানের প্রাণে বাজে। তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি ভক্তবৎসল। শিবের কৃপায় বালকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সাপের বিষ চলিয়া গেল। পিতা-মাতার আনন্দ হইল। বালক পিতামাতা এবং মহাপুরুষ আপ্পারকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তিতে পুত্রের পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে বুঝিয়া পিতা-মাতা আপ্পারের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। ভগবৎ জ্ঞানে অতিথি সেবার ফল হাতে হাতে মিলিয়া গেল। ধর্ম সত্য। দেব-দেবী সত্য। তাঁহাদের কৃপা এবং মহাপুরুষের আশীর্বাদে ভবসাগর পার হওয়া যায়।

আপ্পার শিবের ভক্ত। পূর্বে বলা হইয়াছে তীর্থ দর্শন, মন্দিরে দেব দর্শন, ইষ্টের মহিমাসূচক গান রচনা দ্বারা তাঁহার সেবা করা তাঁহার প্রচার-সূচীর অঙ্গ। তাঁহার ইচ্ছা হইল দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের প্রান্ত পর্যন্ত যত দেব-দেবীর মন্দির আছে সব দর্শন করিয়া প্রাণের শখ মিটাইবেন। জীবনের শেষ প্রান্তে শিবের খাস মহল কৈলাস দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিল। এখন বিজ্ঞানের যুগে মোটর, ট্রেন, ইলেকট্রিক ট্রেন, এরোপ্লেন ইত্যাদির আবির্ভাবে যান-বাহনের যেমন সুবিধা হইয়াছে পূর্বে তেমন ছিল না। সুতরাং

পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তখন তীর্থ ছিল, যাত্রা ছিল, যাত্রার কষ্টও ছিল, এখন তীর্থ আছে, যাত্রা নাই, যাত্রার কষ্টও নাই। সহজ হইয়াছে বলিয়া তীর্থের মূল্যও কমিয়াছে। দক্ষিণ ভারত হইতে কৈলাস বহু দূর। পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপ্পার পদব্রজে রওনা হইলেন। পথ চলিতে চলিতে পায়ে ঘা হইল, পা চলে না, কিন্তু তীর্থ দর্শনের জন্য মনের আবেগ বিন্দুমাত্র কমিল না; বরং তীব্র হইল। পায়ে চলা বন্ধ হইলে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন। পায়ের ঘা হাতে দেখা দিল। হামাগুড়ি দিয়াও চলিতে পারেন না। এত কষ্ট সত্ত্বেও কৈলাস দর্শনের আশা ত্যাগ করিলেন না। অবশেষে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। এরূপ কষ্ট দেখিলে পাষাণেরও অন্তর গলে। ভগবানের দয়া হইবে ইহা স্বাভাবিক। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের পায়ে কাঁটা বিঁধিলে তাঁহার বুকে লাগে। আপ্পারের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার ইষ্ট স্থির থাকিতে পারিলেন না। গড়াইয়া চলিতেও যখন অসমর্থ হইলেন তখন আপ্পার সামনে একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করিলে তোমার দুঃখ দূর হইবে। তখন কৈলাসে ইষ্ট দর্শন পাইবে।" আপ্পার তাহাই করিলেন। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। যেস্থানে আপ্পারের ইষ্ট দর্শন এবং কৈলাস দর্শন হয় তাহা তাঞ্জোর হইতে দশ মাইল দূরে। এখন তিরুবামুর নামে প্রসিদ্ধ।

আপ্পার ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তিরুপুগর মন্দিরে দেব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য মন্দিরের চারিদিক পরিষ্কার রাখিতেন। মন্দির-সংলগ্ন জমির ঘাস উঠাইবার সময় কখনো কখনো মূল্যবান্ পাথর পাওয়া যাইত কিন্তু জাগতিক বিষয়ে উদাসীন বলিয়া তিনি ঘাসের সঙ্গে পাথরগুলিও দূরে ফেলিয়া দিতেন।

সাহিত্যে আপ্পারের অবদান অনেক। তিনি ৩১২টি দেবতার মহিমাসূচক গান রচনা করিয়াছেন। ভগবান লাভই জীবনের লক্ষ্য, লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়, প্রতিবন্ধক দূর করিবার উপায়, ভগবৎ মহিমা কীর্তনের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম হয়—ইত্যাদি তাঁহার গানের বিষয়বস্তু ছিল। তিনি শিবের উপাসক। তাঁহার মতে শিবই তত্ত্ব, শিবই পশুপতি, সর্বপ্রাণীর অধীশ্বর, সর্ববস্তুর সারতত্ত্ব। সুরের মাধুর্য, ফলের মিষ্টত্ব, জলের শৈত্য, আগুনের উত্তাপ, সূর্যের জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, ফুলের গন্ধ, ধরিত্রীর সহনশক্তি—সকলের মূলে তিনি। আপ্পার বিশ্বাস করেন এই দেহ ভগবানের মন্দির। ভক্তি, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান তাঁহার পূজার উপাচার, বিবেক জাগ্রত হইলেই ভক্তি জ্ঞান আসে। জ্ঞানের আলোতে

ভক্ত ইষ্ট দর্শন করে। কাম-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভক্তই শিবের কৃপায় মুক্তি-লাভ করে। অহমিকাই অমরত্ব লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। অহমিকায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির জীবনতরী ডুবিয়া যায়। তাঁহার রচিত 'নমঃ শিবায়' পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সাধন দ্বারা ভক্ত সচ্চিদানন্দ লাভ করিতে পারে। তাঁহার রচিত গান দক্ষিণ দেশে এত জনপ্রিয় যে শিবের মন্দিরে নিত্য আরতির সময় গীত হইতে থাকে। অন্তরে ভক্তিভাব জাগাইবার জন্য পিতা-মাতা ছোটবেলা হইতেই তাঁহার গান শিখান। তাঁহার গান তামিল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

॥ চার ॥

তিরুজ্ঞান সম্বন্ধম্

অজাত, মৃত এবং মূর্খ পুত্রের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় যে দুঃখ দেয় তাহা স্বল্পকালস্থায়ী কিন্তু তৃতীয়টি যতকাল বাঁচিয়া থাকে ততকাল দুঃখ দেয়। এইজন্য পিতা-মাতা সব সময়ে সৎ, বিদ্বান্ এবং ভক্তিমান্ পুত্র কামনা করেন। আর সেই পুত্রই ধন্য যিনি বিচারশীল এবং ভক্তিমান্ এবং জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই সচেতন। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার বশে মানুষ ভক্তিমান্ হয়। সৎ পুত্র লাভ করিতে হইলে পিতা-মাতাকে পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়। বীজ অনুযায়ী ফল হয়।

শুভ সংস্কার নিয়াই ছেলেটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ছোটবেলা হইতে মন্দিরের দেব-দেবী দর্শন, তীর্থ ভ্রমণের সাধ। দেখিতে সুন্দর, দেবকুমার বলিয়া ভ্রম হয়। শরীর এত কোমল যে বেশীদূর পায়ে হাঁটিয়া চলিতে পারে না। তাই একদিন পিতার কাঁধে চড়িয়া জন্মভূমির নিকটস্থ তীর্থভ্রমণ ও মন্দিরের দেবদেবী দর্শনে চলিয়াছে। পিতা অতিশয় ভক্তিমান্, উৎসাহী, পুত্রকে এত স্নেহ করেন যে সকল সময় তাহার আবদার রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ছেলেটি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিবেচক, অধিকক্ষণ কাঁধে করিয়া নিতে পিতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া পিতার অনুমতি নিয়া যথাসাধ্য হাঁটিতে লাগিল; কিন্তু গন্তব্যস্থল দূর। পথ চলিতে চলিতে তিরু-মারান পণ্ডীর শিবমন্দিরে পৌছিলে সন্ধ্যা হইল। এখানে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিল যাহার মধ্যে বালকের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

লুক্কায়িত ছিল। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা ভক্তের কষ্টে ব্যথিত হইয়া মন্দিরের প্রধান কর্তৃপক্ষ ও সেবকের নিকট স্বপ্নে আদেশ দিলেন যে মন্দিরের পালঙ্ক এবং ছত্র যেন বালকের তীর্থ পরিক্রমার সময় ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। ঘটনাও তাহাই ঘটিল, বালকের তীর্থ দর্শন সহজ হইল।

যে বালকের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার নাম তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর। তিরু সম্মানসূচক পদবী। শ্রী মানে লক্ষ্মীমন্ত, অর্থাৎ যে বালকের জন্মে ধর্মাদি সর্ব বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে। বালকের জীবন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। সাধারণ জীবনের ব্যতিক্রম। সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। দক্ষিণ দেশে পেরিয়া-পুরাণ খুব প্রসিদ্ধ। উহাতে তেষট্টিজন নায়নার (শিবভক্ত ঋষি) সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিবভক্ত নায়নারদের মধ্যে চারজন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রবন্ধোক্ত তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর এই চারজনের অন্যতম। মাদ্রাজ হইতে দেড় শত মাইল দূরে মায়াভরম্ রেল স্টেশনের নিকট শিয়ালী বা সিরকালী নামক কোন ছোট শহরে বিশিষ্ট এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শিবপাদহৃদয়ার। শিবের পাদপদ্ম সদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিত। তিনি যে শুধু ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন তা নয়, তিনি বিদ্বান্, বেদজ্ঞ শিবভক্ত। অধিকাংশ সময় শিবের পূজা, ধ্যান এবং স্তোত্রাদি পাঠে কাটাইতেন। ভগবতী নাম্নী তাঁহার বিদুষী স্ত্রীও স্বামীর মত ভক্তিপরায়ণা এবং ভগবৎ-বিশ্বাসী ছিলেন।

যে সময়ে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময় ধর্ম ও সমাজের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দেশের লোকেদের মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। রাজ-আনুকূল্যই প্রধান কারণ ছিল। ধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া অল্প লোকই ধর্মান্তর গ্রহণ করিত। দল বৃদ্ধি করিবার কৌশল তাঁহাদের ভালই জানা ছিল। সৎ কিংবা অসৎ যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। সিদ্ধাই, প্রলোভন, এমন কি রাজশক্তির সাহায্যে অত্যাচার দ্বারা বহু হিন্দুকে তাঁহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিতেন। ফলে হিন্দু ধর্মের অবস্থা শোচনীয় হইল, যেন অতি কষ্টে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। ধর্মের দুরবস্থা শিবপাদহৃদয়ারকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি নিয়ত তাঁহার ইষ্ট শিবের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেন যেন ধর্মদ্বেষীদের বিশেষতঃ জৈনদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় এবং হিন্দুর গৌরব বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও প্রার্থনা করিতেন যে শিব যদি দয়া করিয়া এমন এক শক্তিমান্ পুত্রসন্তান দেন যে দেশের এবং ধর্মের

দুরবস্থা দূর করিবে, হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল করিবে এবং ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। মনে হয় ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিল। ইহার অনতিকাল পরে ভগবতী স্বামী শিবপাদহৃদয়ারকে এক সর্বগুণসম্পন্ন পুত্রসন্তান উপহার দিলেন। শিশুর রং গড়ন অতি সুন্দর, দেবশিশু তুল্য। তাহার দেহের লক্ষণ দেখিয়া এবং কোষ্ঠীপত্র গণনা করিয়া জ্যোতিষীরা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে বালক স্বল্পায়ু। গণনায় তাহার আট বৎসর মাত্র আয়ু পাওয়া যায়। যদি এই আট বৎসর সময়ের মধ্যে সে ধর্ম-প্রচারে ব্রতী হয় তবে আরও আট বৎসর বাঁচিবে এবং এই স্বল্প সময়ে সে এমন কৃতিত্ব দেখাইবে যে সকলে অবাক্ হইবে, ধর্মজগতে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিবে যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বালক অসাধারণ স্মৃতি, ধর্মভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কবিত্ব-শক্তি এবং প্রতিভা নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে পিতা, মাতা, দেশ এবং ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। কালেভদ্রে এরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হয়। জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হয় নাই। উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বালক ধর্মজগতে এমন উন্মাদনা আনিয়াছিল যাহা বহুকাল লোকের মনে দাগ রাখিয়াছিল, ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ অল্পই দেখা যায়। ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তির প্রভাবে বালক মাত্র তিন বৎসর বয়সে ভক্তিমূলক গান রচনা করিয়াছিল, তাল মান লয় সহ এমন মিষ্টি গান করিত, যে শুনিত সে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। তাহার গানের বিষয় ছিল ভগবৎ মহিমা ও লীলা-বর্ণন। তাঁহার গানগুলি পরবর্তীকালে দক্ষিণ দেশে তেভারম্ রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কত শতাব্দী পার হইল এখনও লক্ষ লক্ষ লোক ঐ তেভারম্ মন্দিরে পাঠ এবং গান করিয়া ভগবানের আরাধনা করে এবং প্রচুর আনন্দ লাভ করে। তাঁহার গান সর্বত্র আদৃত এবং শাস্ত্রের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

ছোটবেলাতেই যে তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই বুঝা যায়। শৈশব অবস্থা, বয়স ২।৩ বৎসর হইবে, মুখে কথা ফুটিয়াছে, সামান্য দূর চলাফেরা করিতে পারে, একদিন পিতা শিবপাদহৃদয়ার শিবমন্দিরের নিকটস্থ পুকুরে স্নান করিতে চলিলেন। বালকও পিতার কাঁধে করিয়া চলিল, পুত্রের ধর্ম-প্রবণতায় পিতার খুবই আনন্দ। পুত্র যখনই মন্দির দর্শন করিবার জন্য আবদার করিত পিতা কখনও বাধা দিতেন না। বালককে পুকুরের ঘাটে বসাইয়া রাখিয়া পিতা স্নানান্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মন্দিরস্থ শিব-পার্বতীর মূর্তি দেখিয়া বালকের মনে অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল,

মূর্তির মধ্যে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর সত্তা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন 'আপ্পা, আম্মা'। বালকের পবিত্রতা এবং সরলতায় মুগ্ধ হইয়া হর-পার্বতী বালককে দর্শন দিলেন। বালককে ক্ষুধার্থ মনে করিয়া শিব পার্বতীকে মাতৃস্তন্য পান করাইতে বলিলেন। ভোলানাথের আদেশে পার্বতী বালককে কোলে নিয়া স্তন্যপান করাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ বিষয়ের জ্ঞানও দান করিলেন। ইত্যবসরে পিতা স্নানাদি সারিয়া আসিয়া বালকের মুখে সদ্য দুগ্ধের ফেনা দেখিয়া স্তব্ধ হইলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কি হইয়া গেল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইল স্তন্য-দুগ্ধের সঙ্গে কেহ বিষাক্ত কিছু খাওয়াইলে বালকের জীবন-নাশ হইতে পারে। কে কোন্ মতলবে এইভাবে তাঁহার অজ্ঞাতে দুধ পান কিংবা অন্য কিছু ভোজন করাইয়াছে ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। তা ছাড়া তিনি ব্রাহ্মণ। যদি কোন অব্রাহ্মণ অজ্ঞাতে কিছু খাওয়াইয়া থাকে তবে জাতিনাশের ভয় আছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন, অবশেষে বালককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুখে দুধের ফেনা কেন?' সঙ্গে সঙ্গে বালক সম্মুখে মন্দিরস্থ শিব-পার্বতীর মূর্তি দেখাইয়া শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া তাল মান লয় সহ সুমধুর স্বরে গাহিলেন। 'ঐ মন্দিরস্থ যে শিব চুপিচুপি আসিয়া আমার হৃদয়টি চুরি করিয়া নিয়াছেন, যিনি বৃষভবাহন, যিনি বিষধর সর্পের হার গলায় পরেন, যাঁহার শির পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল এবং যিনি শ্মশানের চিতাভস্ম গায়ে মাখেন, সেই শিবের আদেশে বিশ্বজননী ভগবতী নিজের স্তন আমার মুখে দিয়া দুধ পান করাইয়াছেন, সেইজন্য এখনও মুখে দুধের ফেন লাগিয়া আছে।' তখন শিবপাদহৃদয়ায় পুত্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন এবং জাতিনাশ-জনিত ভয় অমূলক বুঝিলেন। গানের ভাব, সুললিত শুদ্ধ ছন্দ, রচনা-নৈপুণ্য, তাল মান লয় সহ সুমধুর গান শুনিয়া এবং বিষয়বস্তু বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন ভগবৎ কৃপা ব্যতীত এরূপ কখনও হইতে পারে না। হয়ত ভগবান তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছেন, বালকের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্মের লুপ্ত গৌরব আবার বৃদ্ধি পাইবে। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইল।

ক্রমশঃ বালকের দেবত্ব ও মহত্ত্ব প্রকটিত হইতে লাগিল। একদিন তিরুক্কোলকর নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে বালক শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া সুমধুর স্বরে প্রাণের আবেগে গাহিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নিকট তাল দেওয়ার কোন যন্ত্র ছিল না। যন্ত্রাভাবে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় দৈব কৃপায় তাহার ব্যবস্থা হইল। উপর হইতে হঠাৎ একজোড়া সোনার করতাল

তাঁহার সম্মুখে পড়িল। প্রত্যক্ষদর্শীর এবং ক্রমে অন্যদেরও বিশ্বাস জন্মিল যে বালক দৈবশক্তি-সম্পন্ন। স্বয়ং শিব তাঁহার ভার নিয়াছেন এবং সব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিছেন। এইভাবে সরল, সুকণ্ঠ এবং দৈবশক্তি-সম্পন্ন বালকের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, বহু ভক্ত জুটিল এবং দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এইভাবে ভগবৎ মহিমা কীর্তন করিতে করিতে তিনি চারবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তামিল দেশের ২৭৫টি শিবমন্দির দর্শন করিয়া শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়াছেন, এই সুমধুর গানগুলিই তামিল সাহিত্যে তেরাভরম্ রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

তিনি তীর্থ ভ্রমণকালে একা যাইতেন না। তাঁহার সঙ্গে বহু শ্রোতা, ভক্ত, গায়ক, বাদক থাকিতেন। তিনি সকলের সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তীর্থ-সংস্কার এবং হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, তিরুনীলকণ্ঠ পেরাপানার নামক অনৈক প্রসিদ্ধ বীণাবাদক ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিতেন। বালকের চালচলন, চরিত্র, ভাব-ভক্তি, সুললিত কণ্ঠ এবং ওস্তাদ বীণাবাদকদের সুনিপুণ হস্তের বীণার ঝঙ্কার সকলের মনে গভীর রেখাপাত করিত, শ্রোতা দর্শককে চমৎকৃত করিত। কিন্তু মলয় হাওয়া সব সময় বহে না, পরিবর্তন হয়। অমৃতের পাশে গরল, আলোর পাশে অন্ধকার, সুখের পাশে দুঃখ, প্রেমের পাশে বিদ্বেষ দেখা যায়। বিদ্বেষের বীজ হাওয়াতেই থাকে। তিরুনীলকণ্ঠের আত্মীয়দের ধারণা হইল তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর যে সর্বসাধারণের নিকট প্রিয় হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা পাইতেছেন তাহার কারণ তাঁহার ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, গান রচনার শক্তি, সুললিত কণ্ঠ এবং চরিত্র মাধুর্য নয়। বীণাবাদকদের নিপুণতা বশতাই বালক গায়কের গান মধুর লাগে। জনসাধারণের নিকট বালককে হেয় করিবার এবং বীণাবাদককে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং সর্বসাধারণের নিকট বীণাবাদকের কৃতিত্বের কথা প্রচার করিলেন। সরল এবং উদার বালক তাহাদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা বিন্দুবিসর্গ জানিত না। কিন্তু বালকের গুণমুগ্ধ বীণাবাদকদের নিকট উহা গোপন রহিল না। উহা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন ভজন সময়ে বীণাবাদক বালককে নূতন সুন্দর গান রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর সঙ্গে সঙ্গে নূতন গান রচনা করিয়া এমন মধুর কণ্ঠে গাহিতে আরম্ভ করিলেন যে সুনিপুণ বীণাবাদকদের পক্ষে সঙ্গৎ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং বীণাযন্ত্রই সর্বসমক্ষে হেয় হইবার কারণ মনে করিয়া উহা

আছড়াইয়া ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় বালক যন্ত্রটি বাদকের হাত হইতে নিয়া সুর তাল লয় সহ বাজাইতে বাজাইতে এমন তন্ময়ভাব সহিত গাহিলেন যে সকলে মুগ্ধ হইলেন। সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হইল যে বালক শুধু গায়ক নয়, তিনি একাধারে গায়ক, বাদক, ভক্ত, কবি প্রেমিক। তিরুনীল কণ্ঠের আত্মীয়দের ভুল ভাঙিল, বিদ্বেষ দূর হইল। তাঁহারা বালকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল বালকের গান গভীর, গলা গলা নয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া সুর উঠে, তাই এত মধুর লাগে। বালক অতঃপর বীণা যন্ত্রটি বাদকের হাতে দিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর চারবার তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। প্রথমবার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় পিতার কাঁধে চড়িয়া জন্মভূমি শিয়ালীর অন্তর্গত মন্দিরাদি দর্শন করিবার কালে কিভাবে তিরুমারান পাড়ী মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা শিব পুরোহিতকে স্বপ্নে আদেশ দিয়া মন্দিরের মণিমুক্তা-খচিত পালঙ্ক এবং ছত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়বার চোল প্রদেশের অন্তর্গত কাবেরী নদীর উভয় তীরস্থ শিবমন্দিরগুলি দর্শন করেন। তৃতীয় বার পাণ্ড্য দেশের মন্দিরাদি দর্শন করেন। মাদুরা ঐ দেশের প্রধান শহর এবং তীর্থ। চতুর্থবার কাঞ্চিপুরম এবং পল্লবদেশের মন্দিরাদি দর্শন করেন।

কাবেরী তীরস্থ মন্দিরাদি দর্শনকালে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর জানিতে পারেন যে সিরুতোন্দর নামক একনিষ্ঠ শিবভক্ত নিকটে বাস করেন। একদিন তাঁহাকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। এই অঞ্চলে বাস করিবার কালে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সিরুতোন্দর এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর এক নিয়ম ছিল শিবপূজা এবং শিবভক্তের সেবা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। এক দিন সিরুতোন্দর শিবের পূজা শেষ করিয়া শিবভক্তের খোঁজ করিতে রাস্তায় বাহির হইলেন কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোন ভক্তের সন্ধান পাইলেন না, ইতিমধ্যে অতিথি দ্বারে আঘাত করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী অতিথিকে আপ্যায়ন করিয়া গৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অতিথির নিয়ম ছিল যে, যে গৃহে গৃহস্বামী উপস্থিত থাকিবেন না সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। সেইজন্য তিনি গৃহস্বামী গৃহে না ফিরা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন এবং ইত্যবসরে স্নান সন্ধ্যা-বন্দনাদি সারিয়া নিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিবভক্তের দেখা হইল না বলিয়া নিরাশ হইয়া সিরুতোন্দর গৃহে ফিরিয়া যখন জানিলেন যে অতিথি দ্বারে উপস্থিত কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে

আতিথ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত, তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং সাদরে আপ্যায়ন করিয়া গৃহে আনিলেন। এই অতিথি সাধারণ অতিথির মত নয়। তাঁহার অদ্ভুত খেয়াল। ছয় মাসে একবার আহার করেন, নরমাংসে তাঁহার খুব প্রীতি। বিশেষতঃ কচি ছেলের মাংসে অধিক প্রীতি, উহা না হইলে তাঁহার চলে না, এবং উহা না পাইলে আতিথ্য স্বীকারও করেন না। আতিথ্যের শর্ত শুনিয়া গৃহস্বামী মহা ফাঁপরে পড়িলেন, বংশে বাতি দেওয়ার একটিমাত্র ছেলে, তাহার মাংস রান্না করিয়া অতিথির সামনে ধরিয়া দেওয়া কোন পিতা-মাতা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন না, উহা করিতে যাওয়া স্বেচ্ছায় নির্বংশ হওয়া ছাড়া কিছু নয়। পিণ্ড দেওয়ার কেহ থাকিবে না এবং পিণ্ড না দিলে পিতৃপুরুষদের কোপে পড়িতে হইবে। অন্য দিকে অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁহার সেবায় অপরাধ ঘটিলে ব্রহ্মশাপে সবংশে নির্মূল হইতে হইবে। মহাভারতের কর্ণ ও পদ্মাবতীকে স্বয়ং ভগবান স্বামী-স্ত্রীর ত্যাগ, দান, সত্য ও সরলতা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-বেশে অতিথি রূপে আসিয়া কচি নরমাংস বিশেষ করিয়া শিশুপুত্র বৃষকেতুর মাংস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কর্ণ ও পদ্মাবতী নিজহস্তে করাতের দ্বারা পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া ঐ মাংস অতিথির সামনে ধরিয়া দিয়া কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে পিতা-মাতা এরূপ অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা অন্য ধাতুতে গড়া। সত্যের মহান্ আদর্শের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সিরুতোন্দর এবং তাঁহার স্ত্রী যখন নিজের পুত্রের মাংস রান্না করিয়া অতিথির সামনে ধরিলেন তখন অতিথি আবার অদ্ভুত আবদার ধরিলেন। তিনি একা খাইবেন না। উক্ত কচি ছেলের সঙ্গে একত্রে খাইবেন। যাহাকে কাটিয়া রান্না করা হইয়াছে তাহাকে কোথায় পাইবেন? তথাপি অতিথির অনুরোধে সিরুতোন্দর বাগানে গিয়া ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। পিতার গলা শুনিবামাত্র পুত্র হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার কোলে উঠিয়া পড়িল। ঘরে আসিয়া মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির দিকে যখন তাকাইলেন তখন অতিথি অদৃশ্য হইয়াছেন। চোখের নিমেষে কখন কিভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং শিব ভিক্ষাণ্ডেশ্বর রূপে সিরুতোন্দরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঐ স্থানে শিব এখনও ঐ ভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

একনিষ্ঠ ভক্ত সিরুতোন্দরের সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটাইয়া তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর

আবার সদলবলে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এবার সিরুতোন্দর তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথে প্রসিদ্ধ শিবভক্ত আপ্পারের সঙ্গে দেখা হইল। তিনিও দলে যোগ দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর অবিলম্বে পাল্কি হইতে নামিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং সম্বোধন করিলেন, 'আপ্পার, হে পিতা', পূর্বে আপ্পার মারুনিকিয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আপ্পার নামে পরিচিত হইলেন। আপ্পার বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু জাতিতে বৈশ্য, তিনি বালককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বালক। আপ্পার প্রাচীনত্বের এবং তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর আভিজাত্যের দাবি করিতে পারেন; কিন্তু যেখানে ত্যাগ, পবিত্রতা ও ভক্তিই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সেখানে সাধারণ নিয়ম খাটে না বরং ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে বয়োবৃদ্ধ আপ্পার প্রণাম দ্বারা অল্প-বয়স্ক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন এবং অভিজাত বংশের ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ অব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া প্রাচীনত্বের সম্মান রাখিলেন। উভয়ের জীবনের মূলমন্ত্র ত্যাগ। ত্যাগের নিকট সকলেই মাথা নত করে।

তীর্থ পরিক্রমা করিতে করিতে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর বেদারণ্য শিবের মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখেন মন্দির দ্বাররুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া তিনি তাল মান লয় সহকারে যখন সুললিত কণ্ঠে গান ধরিলেন তখন রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। তখন হইতে ঐ মন্দিরে তাঁহার রচিত এই ভক্তিমূলক গানটি তেভারমের অংশ হিসাবে পূজার সময় নিয়মিতভাবে গীত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর পাণ্ড্যরাজের রাজধানী মাদুরায় উপস্থিত হইলেন। কুনপাণ্ড্য তখন মাদুরার রাজা, তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী। রাজআনুগত্য বশতঃ অধিকাংশ প্রজা জৈন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দুগণ উৎপীড়িত হইতেন। কিন্তু কুনপাণ্ড্যের মহিষী রানী মাঙ্গারকাসি এবং মন্ত্রী কুলশেখর হিন্দু এবং শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুজনের অনুরোধে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর মাদুরায় আসিয়াছিলেন। রাজার সহানুভূতি হারাইবার ভয়ে জৈনরা তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং তিনি যে ঘরে বাস করিতেন তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। মহাপুরুষ শিবের উদ্দেশ্যে গান রচনা করিয়া গাহিবামাত্র আগুন নিভিয়া গেল এবং তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ভগবান যাহার ভার নেন তাহার বিনাশ হয় না। শত্রুও তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে বিফল মনোরথ হয়।

যেমন কর্ম তেমন ফল, শিবভক্তকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার ষড়যন্ত্র ত বিফল হইলই বরং উল্টা ফল ফলিল। ষড়যন্ত্রকারী জৈনদের কঠিন অসুখ হইল।

দুষ্কর্মের সাহায্যদাতা রাজাও রেহাই পাইলেন না। প্রকৃতির কোপে তাঁহার শরীরে অসহ্য দাহ হইল, অসুখ সারাইবার জন্য জৈনরা নানা প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। অতঃপর রানী মাঙ্গারকাসি এবং মন্ত্রী কুলশেখরের বিশেষ অনুরোধে রাজা তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের শরণাপন্ন হইলেন, তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া প্রাণের আবেগে গাহিলেন এবং রাজাকে শিবের বিভূতি দিলেন। বিভূতি ধারণের পর রাজার রোগ সারিয়া গেল, কিন্তু ইহাতে এই মহাপুরুষের উপর জৈনদের প্রতিহিংসা দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য তাঁহারা নূতন ভাবে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে তাঁহারা তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন, নইলে নয়। একটা তালপাতায় তাঁহারা (জৈনরা) নিজেদের মন্ত্র লিখিবেন, অন্য একটা তালপাতায় তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর শিবের মহিমাসূচক গান লিখিবেন, তারপর উভয় পক্ষের তালপাতা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে, যে পক্ষের তালপাতা অগ্নিতে অবিকৃত থাকিবে সেই পক্ষ জয়ী হইয়াছেন বলিয়া স্বীকৃত হইবেন এবং যে পক্ষের তালপাতা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে সে পক্ষ পরাজিত হইবেন। কার্যকালে দেখা গেল তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের লিখিত তালপাতা আগুনে অবিকৃত রহিল। তাঁহার কৃতিত্ব ঘোষণা করা হইল কিন্তু জৈনরা নিজেদের পরাজয় মানিয়া নিতে স্বীকৃত হইলেন না, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি যেন জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল রাজার সহানুভূতি হারাইলে তাঁহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন। তাঁহারা তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরকে আর একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার আহ্বান জানাইলেন। মাদুরার নিকটবর্তী বাগাই নদী বর্ষায় ভীষণ আকার ধারণ করে। স্রোত এত প্রবল হয় যে সব ভাসাইয়া নেয়, পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর তালপাতায় শিবের মহিমা-সূচক গান লিখিবেন এবং জৈনরাও তালপাতায় তাঁহাদের প্রার্থনা মন্ত্র লিখিবেন। পরে উভয় পক্ষের তালপাতা নদীর প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিবেন। যাঁহার তালপাতা স্রোতের বিপরীত মুখে চলিবে তাঁহার জয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রেও সত্যের জয় হইল, তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের লিখিত তালপাতা স্রোতের বিপরীত মুখে চলিয়া শিবের তথা হিন্দু ধর্মের মহিমা ঘোষণা করিল এবং জৈন ধর্মের ব্যর্থতা ও হীনতা প্রকাশ করিয়া দিল। এই ঘটনার পর

মাদুরার রাজা হিন্দুধর্মের মহিমা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া প্রকাশ্যে উহা গ্রহণ করিলেন এবং উহাই রাষ্ট্র-ধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। রাজার মত পরিবর্ত্তনে সর্বাপেক্ষা সুখী হইলেন তাঁহার মহিষী রানী মাঙ্গারকাসি এবং মন্ত্রী কুলশেখর। জৈনদের বহু দুরভিসন্ধি এবং অত্যাচারের কথা রাজার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি আর জৈনদের ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নন। ফলে বহু জৈন প্রাণভয়ে পলাইয়া গেলেন। অনেকের শাস্তি হইল। এইভাবে আধ্যাত্মিকতার অভাব এবং তজ্জনিত প্রতারণাদি আশ্রয় গ্রহণ অপরাধ প্রকাশ হইয়া পড়াতে জৈনদের প্রভাব অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শিবভক্ত তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের সুনাম বাড়িল। শিবের নিকট শিবপাদহৃদয়ার-এর প্রার্থনার ফল ফলিতে লাগিল।

মাদুরা হইতে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর দক্ষিণাভিমুখে গেলেন। রামেশ্বর হইয়া পতিমনগায় নামক স্থানে পৌছিলেন। উহা বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র। স্বধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে বৌদ্ধেরা ধর্মসভার আয়োজন করিলেন। হিন্দুদের প্রতিনিধিকেও উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এস্থানে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিপন্ন করিলেন। ফলে বৌদ্ধ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর এই মহাপুরুষ তামিল দেশের উত্তর ভাগে তাঁহার বিজয় পরিক্রমা শুরু করিয়া প্রধান শিবক্ষেত্র কালহস্তীতে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাধ-ভক্ত কন্নাপ্পারকে শিব কৃপা করিয়া আপন মাহাত্ম্য এবং ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করেন। অতঃপর মাদ্রাজ নগরস্থ মায়লাপুরম্ অঞ্চলের প্রধান শিবমন্দির কাপালিশ্বরে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ধনীকুবের শিবনেশন চেট্টীর একমাত্র সুন্দরী শিবভক্ত কন্যা পুষ্পবাঈ একদিন ফুল তুলিতে গিয়া সর্পাঘাতে মারা যায়। পিতা কন্যার শোক কিছুতে ভুলিতে পারেন না, তাহার অস্থি সোনার কৌটায় সযত্নে রক্ষা করিয়া নিত্য ভোগ দিতেন। লোকের ধারণা হইল একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে শিবনেশন চেট্টী পাগল হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে বাস করিবার সময় তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর ঐ ঘটনা জানিতে পারেন, একদিন উক্ত চেট্টী কৌটায় রক্ষিত অস্থি তাঁহার নিকটে লইয়া আসিলে তিনি শিবের মহিমাসূচক গান করিলেন, পরে দেখা গেল মেয়েটি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। মেয়ের পুনর্জীবন লাভে পিতা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরকে অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর মেয়েকে ধর্মজীবন যাপন করিতে এবং নিত্য শিবের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন।

মহাপুরুষের কৃপায় মেয়ের জীবন ধন্য হইল। এই অলৌকিক ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের বহু বৌদ্ধ এবং জৈন তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে বৌদ্ধ এবং জৈনদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল।

তীর্থ পরিক্রমা শেষ হইলে তিনি জন্মস্থান শিয়ালীতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বজাতি ব্রাহ্মণগণ ধরিয়া বসিলেন তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের বিবাহের কাল উপস্থিত, বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। একদিন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, 'মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, এস আমরা উভয়ে এই অগ্নিতে প্রবেশ করি।' এই বলিয়া নব পরিণীতা বধূকে নিয়া জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তেজোময় শিবের অঙ্গে মিলাইয়া গেলেন।

এই মহাপুরুষের আবির্ভাব যেমন আশ্চর্যজনক তিরোভাবও তেমন চমকপ্রদ। মাত্র ১৬ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ধর্মজগতে একটা নব জাগরণ আনেন। ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইলেন, গানের মাধ্যমে অনন্ত জ্ঞানের ও সত্যের সন্ধান দিলেন, সান্ত ও অনন্তের সংযোগ ঘটাইলেন। তাঁহার শিক্ষার মূল কথা ভগবান সরূপ, অরূপ, সগুণ ও নির্গুণ, তিনি এক এবং অনন্ত, জ্যোতির জ্যোতি তিনি সর্বাদোষ রহিত, ভক্তের নিকট প্রেমের ডোরে বাঁধা, ভক্তের মাধ্যমে রস আস্বাদন করেন এবং আপন গৌরব ও মহিমা অনুভব করেন।

॥ পাঁচ ॥

মাণিক্য বাচাকর

ভারতবর্ষের অসংখ্য মন্দির, বড়, ছোট, মাঝারি নানা রকমের। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমানে অনেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে মন্দির নির্মাণে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা শিক্ষা ও সমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিলে লোককল্যাণ সাধিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মন্দিরের স্বার্থকতা অস্বীকার করা চলে না। উহার মাধ্যমে শিক্ষা, কৃষ্টি, স্থাপত্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি বরং অধিক হয়। মন্দিরের দেবতা মানুষকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দেয় যে প্রথমে ভগবান্ পরে জগৎ, ভগবানের অস্তিত্বে জগতের

অস্তিত্ব। কর্মের চেয়ে উপাসনার স্থান উর্ধ্বে। মন্দিরের ভাষা নীরব কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। উহার বাণী ত্যাগ। উহা আশার আলো, দুর্বলের শক্তি, জীবনের সমৃদ্ধি এবং অমৃতত্বের পথ-প্রদর্শক। এইজন্য হয়ত ভারতে অসংখ্য মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন এই দেশকে মন্দিরময় ভারত আখ্যা দেওয়া যাইত। দেশে এমন লোক ও সমাজ ছিল এবং আছে যাহাদের লক্ষ্য নিজ ধর্ম, সমাজ ব্যতীত অপরের সংস্কৃতি নষ্ট করা। তাঁহারা গোঁড়া। তাঁহাদের অত্যাচারে উত্তর ভারতে বহু মন্দির ধূলিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ দেশে এখনও অনেক মন্দির অক্ষত আছে। ঐ দেশে এই রকম একটা মন্দিরেই এক মহাপুরুষ ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা অধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক রূপে উদিত হইয়া মন্দিরের স্বার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব ধর্মে এবং সমাজে একটা আলোড়ন আনিয়াছে। মন্দিরটির নাম আভেডিয়ার কোইল (মন্দির)। ঐ মন্দিরেই প্রবন্ধোক্ত মাণিক্য বাচাকর গুরুকৃপা লাভ করিয়া জীবনের লক্ষ্য অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখনও উক্ত মহাপুরুষের স্মৃতি স্বরূপ তাঁহার মূর্তি রক্ষিত আছে এবং উহা নিত্য পূজিত হয়।

বেদান্ত শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উহার তাৎপর্য সংস্কৃত ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বুঝা সম্ভব নয় কিন্তু উহা যদি সর্বাসাধারণের সুবিধার জন্য জনগণের ভাষার প্রচার করা হয় তবে বহু লোকের উপকার হয়। যিনি এই মহৎ কার্য সম্পাদন করেন তিনি দেবতার ন্যায় পূজা পান। মাণিক্য বাচাকর তাঁহার তিরুবাচকম্ নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া অমর হইয়াছেন। উহা বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ শিবভক্ত আপ্পার, সুন্দরার এবং তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের রচিত তেভারমের ন্যায় উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ধর্মকে জীবনের অমূল্য সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থখানি বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের এই জ্যোতিষ্ক অসংখ্য ভক্তের পথ-প্রদর্শক, ভক্তির উৎস, জ্ঞানপিপাসুর সুশীতল বারি। মাত্র ৩২ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার প্রভাবে বহু লোকের জীবন মধুময় হইয়াছে। তাঁহার জীবনের মূল তত্ত্ব, ভগবান সত্য, নিত্য ; জগৎ অনিত্য, বিনাশশীল ; ইহার পিছনে ধাবিত হইয়া অশেষ দুঃখ বরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। তিনি প্রচার করিয়াছেন উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, উপায় বিশ্বাস. অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ. বৈরাগ্য

আশ্রয় গ্রহণ, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের অনুশীলন, ভগবৎ মহিমা কীর্তন, সরলতা, তপশ্চর্যা এবং সত্যকথন।

মাণিক্য বাচাকরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়াছেন। তাঞ্জোরের নিকটবর্তী তিরুভাডাকুর নামক স্থানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। পিতৃদত্ত নাম ভাডাবুরা, তাঁহার জন্মবিবরণ সঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তামিল ধর্মগ্রন্থ তেভারমে তাঁহার বিষয় উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান হয় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দোময় কবিতা, মার্জিত ভাষা, বিশুদ্ধ ছন্দ এবং ভাবের গাম্ভীর্য দেখিয়া মনে হয় তিনি বেদাদি শাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রতিভা, প্রেম বহু লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ছাই চাপা আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে। হীরার টুকরা মাটিচাপা থাকিলেও মূল্য কমে না। অনুকূল সময়ে গুপ্তধন ব্যক্ত হয়। বাজারে চাহিদা বাড়ে। ভাডাবুরার ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্যার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইল।

তিনি যে শুধু আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন তা নয়, ঐহিক বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজ্যচালনা বিষয়ে দক্ষতার জন্য তিনি যৌবনে পাণ্ড্যরাজ অরিমর্দনের পরিষদে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীত্বে তাঁহার ধর্মভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। বিপুল সম্পদ এবং ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কখনও উহার অপব্যবহার করেন নাই। সহস্র কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও মনের স্থৈর্য হারান নাই। কর্তব্যপরায়ণতা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অচলা ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, অদ্ভুত চরিত্র-বল ছিল বলিয়া তিনি সব সময়ে মনের স্থৈর্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজ দরবারে কার্য সমাধা করিয়া যেটুকু অবসর পাইতেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন, ভগবৎ ধ্যান, পূজায় অতিবাহিত করিতেন। রাজারা অনেকে খেয়ালী হন। খেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ তাঁহাদের থাকে বলিয়া উহার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাণ্ড্যরাজ অরিমর্দনের অনেক রকমের খেয়াল ছিল। সুন্দর, তেজী ঘোড়া সংগ্রহ তাহাদের অন্যতম। সুযোগ পাইলেই সংগ্রহ করিতেন। আরব দেশীয় তেজী ঘোড়া তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। একদিন খবর পাইলেন কোন ঘোড়া ব্যবসায়ী তাঞ্জোর জেলার পেরুন দুরাই নামক স্থানে বহু সুন্দর আরব দেশের ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য আমদানি করিয়াছেন। তিনি বহু অর্থ সঙ্গে দিয়া প্রধান মন্ত্রী

ভাডাবুরাকে ঘোড়া সংগ্রহের জন্য পাঠাইলেন। পেরুন দুরাই, তাঞ্জোর হইতে বহু দূরে। তখন যানবাহনের ব্যবস্থা আধুনিককালের মত উন্নত ছিল না। পেরুন দুরাই-এর পথে গভীর জঙ্গল পড়িত। পথ চলিতে চলিতে মন্ত্রী ভাডাবুরা জঙ্গলের মধ্যে এক মন্দিরে আশ্রয় নিলেন, এই স্থানে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহা তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিল। স্বভাবসুলভ ভক্তিবশতঃ ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত আছেন এমন সময় অদূরে বেদপাঠের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিষ্য বিদ্যার্থীদের বেদ শিক্ষা দিতেছেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার জন্মার্জিত শুভ সংস্কার জাগিয়া উঠিল, আধ্যাত্মিক ক্ষুধা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার মনে হইল সাক্ষাৎ ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে গুরুরূপে উপস্থিত হইয়া ভক্তের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য বসিয়া আছেন। তিনি কে, কোথায় থাকেন, কেনই বা নিবিড় অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই ভাবে বেদ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় রত আছেন, কোন প্রশ্নই ভাডাবুরার মনে স্থান পাইল না। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করিয়া জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিলেন, শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও আগন্তুক কে, কোথায় থাকেন, কি জন্য নিবিড় অরণ্যে আসিয়াছেন প্রশ্ন না করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। হয়ত এরূপ আকস্মিক ঘটনা ঘটিবে ব্রাহ্মণের পূর্ব হইতেই জানা ছিল। তাই স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে বৃদ্ধ তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া তাঁহার মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাডাবুরার অন্তরের ফোয়ারা খুলিয়া গেল, তিনি ভগবানের প্রার্থনা মন্ত্র রচনা করিলেন। মন্ত্রগুলির ছন্দ, মাত্রা, ভাব, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের ভগবৎভক্তি, ভাব, বিশ্বাস, লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ এত মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে নূতন নামে অভিহিত করিলেন। ভাডাবুরা মাণিক্য বাচাকর রূপে পরিণত হইলেন। যিনি চিন্তায় ও বাক্যে রত্নের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল তাঁহার ঐ নাম দেওয়া সার্থক হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, জন্মবধির শুনিতে পায়, মূকের বাক্যস্ফুরণ হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে। পাণ্ড্যরাজের পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত থাকিলেও অধীনতা স্বীকার করিতে হয়; আধ্যাত্মিকতার উৎস মুখ খুলিয়া যাওয়ায় চাকরির প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এই ঘটনার পর তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। নিরন্তর ভগবৎ ধ্যানে নিরত থাকিবার চেষ্টা করিলেন, পূর্বে জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন এখন সে দৃষ্টি নাই,

দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়াছে। সদা বিশ্ব-নিয়ন্তার চিন্তায় ডুবিয়া থাকাতে জগতের প্রতি কর্তব্য ভুলিলেন, প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ভুলিলেন। জগৎ ভগবানের লীলাক্ষেত্র, তাঁহার ধ্যান, লীলাকীর্তনে সময় অতিবাহিত হইত। ঘোড়া কিনিবার জন্য পাণ্ড্যরাজ অরিমর্দন প্রদত্ত বিপুল অর্থ শিবের সেবায় ব্যয় করিলেন। ইষ্ট সেবা ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্য থাকিতে পারে ইহা তাঁহার মনে আসিল না।

বহুদিন যাবৎ আরব দেশের সুন্দর তেজী ঘোড়া আসিল না কেন অনুসন্ধান করিয়া পাণ্ড্যরাজ অরিমর্দন জানিলেন যে মন্ত্রীর জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। ঘোড়া পাওয়ার আশা নেই, নৈরাশ্য প্রতিহিংসার রূপ নিল। রাজকোষ অপচয়জনিত অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণায় জর্জরিত করিলেন। তবু একদিন আবার ঘোড়া কবে আসিবে জিজ্ঞাসা করিলে বাদাবুরা (মাণিক্য বাচাকর) শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেন 'আবনি'। তামিল ভাষায় আবনি শব্দের অর্থ শ্রাবণ মাস। বন্দী মন্ত্রীর উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন না বরং বিরক্ত হইলেন। তবু শ্রাবণ মাসের অপেক্ষায় রহিলেন। শ্রাবণ মাসে একটা ভূতুড়ে কাণ্ড হইয়া গেল। শ্রাবণ মাসের শেষে এক আগন্তুক কতকগুলি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ঘোড়া নিয়া আসিলেন। আরবদেশীয় ঘোড়া বলিয়া আস্তাবলে অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে রাখা হইলে, রাত্রে ঐগুলি অন্যান্য ঘোড়াগুলিকে কামড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং শিয়ালের মত বিকট চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। আস্তাবলে একটি ঘোড়াও রহিল না, সব মরিয়া গেল।

কেহ কেহ বলেন, মাণিক্য বাচাকরের ইষ্ট শিব ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অরিমর্দনকে শিক্ষা দিবার এবং ভক্তের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটাইলেন। তাঁহার ইচ্ছায় শ্মশানের শৃগালগুলি আবার ঘোড়ায় পরিণত হইয়াছিল, রাজার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং রাত্রি সমাগত হইলে তাহারা নিজ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আস্তাবলের ঘোড়াগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া বিকট চিৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনায় অরিমর্দনের হুঁশ হইল না। প্রতিহিংসা-বৃত্তি দ্বিগুণ হইল। সমস্ত অনিষ্টের মূলে তাঁহার পূর্ব মন্ত্রী ভাডাবুরা মনে করিয়া তাঁহাকে অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন। পাছে পলাইয়া যায় আশঙ্কা করিয়া প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করিলেন। আইন অমান্য করিবার অপরাধে তাঁহার প্রতি অকথ্য অত্যাচারের হুকুম দিলেন। কিন্তু মাণিক্য বাচাকর কোন প্রতিবাদ করিলেন না, ভগবৎ ইচ্ছা মনে করিয়া সব নীরবে সহ্য করিলেন। ভক্তের ব্যথা ভগবানের প্রাণে লাগে। তিনি উহা সহ্য করিতে পারেন না। ইতিমধ্যে আর

একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটিল। মাদুরা শহরের নিকটস্থ ভৈগাই নদী হঠাৎ স্ফীত হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিল, রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ভক্তের প্রতি অত্যাচার চলিতে থাকিলে ভগবানের কোপে রাজা সবংশে বিনাশ হইবেন আশঙ্কা করিয়া অরিমর্দন মন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন। রাজার সুবুদ্ধি হইল। সঙ্গে সঙ্গে নদীর রুদ্র বেগ প্রশমিত হইল। ভগবৎ কৃপায় এবং ভক্তের শুভ ইচ্ছায় নগর, রাজপ্রাসাদ, রাজ্য এবং রাজা রক্ষা পাইলেন।

কারামুক্ত হইবার পর মাণিক্য বাচাকর দক্ষিণ ভারতের তীর্থ এবং মন্দিরাদি দর্শনে বাহির হইলেন। যখন যে মন্দিরের যাইতেন তখন মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার গান রচনা করিয়া ভক্তিভরে গাহিয়া ইষ্টকে শুনাইয়া খুব আনন্দ পাইতেন। এই ভাবে তিনি বহু গান রচনা করিয়াছেন। তিরুপেগুরাইয়ের শিবের উদ্দেশ্যে যে গান রচনা করেন তাহা ভাষা, ছন্দ, মাত্রা, সুর এবং ভাবের গভীরতার দিক হইতে খুব সুন্দর হইয়াছে বলিয়া সকলে স্বীকার করেন।

ইহার পর তিনি বিখ্যাত চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরে আসিলেন। ঐ সময়ে চিদাম্বরম্ বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। সিংহল হইতে আগত জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের এবং রাজ-আনুকূল্যে উহার প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদে বিচারসভার আহ্বান করিলেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও বিচারে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহু বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, পদস্থ রাজকর্মচারী, গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। মাণিক্য বাচাকরও আসিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলাও যোগ দিলেন। রাজকন্যা তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু তিনি মূক, কথা বলিতে পারেন না। জন্ম হইতে এই রকম। আরোগ্যের সব চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অন্যেরা ইহা জানিতেন না। শাস্ত্র বিচার আরম্ভ হইলে বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার বক্তব্য সুন্দর ভাবে বলিলেন। মাণিক্য বাচাকরের পালা আসিলে তিনি বৌদ্ধ মত এমন যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিলেন যে সকলে চমৎকৃত হইলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিবেন ইহা কেহ আশা করেন নাই, তাঁহার তীক্ষ্ণ শাস্ত্রযুক্তির সামনে বৌদ্ধ ভিক্ষু টিকিতে পারিলেন না। মাণিক্য বাচাকর দৈববলে বলীয়ান ইহা সকলেই অনুভব করিলেন। জয়মাল্য তাঁহার গলায় শোভা পাইল। রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনার মধ্যে যে দৈব শক্তি বিদ্যমান তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐশী শক্তিতে আপনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। ঐ শক্তির প্রয়োগ দ্বারা যদি আমার জন্মাবধি মূক কন্যাকে কথা বলাইতে পারেন আমি আপনার নিকট, চিরকৃতজ্ঞ রহিব।' মহান্ হৃদয় পর-

দুঃখে কাতর হয়। মাণিক্য বাচাকর জানেন তাঁহার নিজের কোন শক্তি নাই। শিবশক্তিই একমাত্র শক্তি। রাজকন্যার আরোগ্যের জন্য তিনি শিবের মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া প্রার্থনার সুরে সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন। ইহার পর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য রাজকন্যাকে অনুরোধ করিলেন। শিবের কৃপায় কন্যার জন্মাবধি রুদ্ধ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, রাজকন্যা সবিনয়ে মহাপুরুষের প্রশ্নের জবাব এমন সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক ভাবে দিলেন যে রাজা আশ্চর্যান্বিত হইলেন। রাজকন্যা যে জন্মাবধি মূক এ ধারণা দূরীভূত হইল। এই আলৌকিক ঘটনার পর মাণিক্য বাচাকরের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হিন্দুধর্মের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস শিথিল ছিল তাহা দূরীভূত হইল। তিনি দৈববলে বলীয়ান্ এবং অবিকল্প পুরুষ এই ধারণা দৃঢ় হইল। দৈবশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা, ভাব, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, সরলতা, উদারতা, সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতে তেষট্টিজন নায়নারের (শিবভক্ত) অন্যতম বলিয়া নিত্য শিবমন্দিরে পূজিত হন।

একদিন চিদাম্বরমের অধিবাসীরা তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব কি বুঝাইয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। তাঁহাদিগকে মন্দিরে লইয়া গিয়া নটরাজ শিবের মূর্তি দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'এই শিবই আমার গানের বিষয়। তিনিই সমস্ত প্রেরণার মূল। তিনি আমার গানের ভাষা, ভাব, ছন্দ, তাৎপর্য। তিনিই সব, শিব ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তিনি সর্বময়, সর্ব বস্তুর আধার। তিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মা, ব্রহ্ম। আমার আমিত্বও তাঁহার মধ্যে নিহিত।' এই কথা বলার পর তাঁহার শরীর শিবের অঙ্গে মিলাইয়া গেল, তিনি শিবময় হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কোথায় গেল এ রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই।

তাঁহার অবদান অমূল্য। তিরুবাচকম্ নামক জ্ঞান ও ভক্তিমূলক যে ছন্দোময় সম্পদ্ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তেভারমের মত তিরুবাচকম্ এখনও দক্ষিণ দেশে মন্দিরে মন্দিরে পূজার অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়া অসংখ্য লোকের ভাবভক্তির খোরাক জোগাইতেছে। উপনিষদের তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া উহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। মাণিক্য বাচাকরের তিরুবাচকম্ সর্বসাধারণের এই অভাব পূরণ করিয়াছে। স্বর্গের মন্দাকিনী মর্ত্যের হিতার্থে প্রবাহিত করাইয়াছে। তাঁহার এই ছন্দোময় অবদান লোকের হৃদয়ে কিরূপ উচ্চ আসন দখল করিয়াছে তাহ নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যায়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মপ্রচারক রেভারেণ্ড জি, ডবলিউ, পোপ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন।

তামিল শিখিয়া, তামিল ভাষায় প্রচার করিয়া সর্বসাধারণকে যীশুর ধর্মে দীক্ষিত করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য দিল। তিরুবাচকম্ তাঁহার মনে এমন গভীর রেখাপাত করিল যে তিনি উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন এবং নিজে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলেন।

মাণিক্য বাচাকরের হৃদয়তন্ত্রী কত উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল তাহা তাঁহার একটা ছন্দেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আমি আবার জন্মগ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ভয় পাই না। আমি মরিতেও ডরাই না। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। স্বর্গ চাই না, মর্ত্যেরও কোন প্রকার সুখ কামনা করি না। প্রভুর মহিমাই আমার ধ্যানের বিষয়, তিনিই নিত্য সঙ্গী, তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই'।

॥ ছয় ॥

তিরুমাঙ্গাই

আলোয়ারের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভক্তিবাদে তাঁহাদের অবদান অপরিমেয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তির স্থান অতি ঊর্ধ্বে। ইষ্টকে প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাদের আবেগপূর্ণ গান, ছন্দোময় কবিতা ভাবোদ্দীপক। তাঁহাদের হৃদয়-দর্পণে আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়. আনন্দ, বিরহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসাদি নানা ভাবের ছায়া পড়ে। দুর্বাদলের মৃদু কম্পনে, পাতায় পাতায় শিশির বিন্দুতে, গভীর বনের নির্জন পরিবেশে, স্রোতস্বতীর কল কল ধ্বনিতে. সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে, হৃদয়ের বীণাতন্ত্রীতে ভক্ত ভগবানের মৃদু স্পর্শ অনুভব করেন। অল্পে ভক্তের স্বাদ মিটে না, তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ শুধু প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ভক্ত হৃদয়কে বিশ্বের দুয়ারে বিলাইয়া দেন, এমন কি প্রিয়ের দূত মনে করিয়া পশুপক্ষীর সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা স্বভাব-কবি। প্রেম আস্বাদন তাঁহাদের লক্ষ্য; প্রেম জীবনের গতি নিয়ামক। অযথা নিয়োগে মানুষ হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, যথাযথ নিয়োগে পাপীও পুণ্যবান হয়। ভগবানের লীলা বুঝা ভার। কাকে কখন কিভাবে কোন্ পথে চালিত করেন তিনিই জানেন। আজ যিনি মহাপাপী বলিয়া সমাজে নিন্দনীয় কাল হয়ত তপস্যার আগুনে দগ্ধ হইয়া তিনি মহা যোগী হিসাবে পূজনীয়। আজকের পাপীর পক্ষে কাল ঋষি হইতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। কর্তৃত্বাভিমানী চান ক্রীতদাসের

আনুগত্য। ভগবান চান প্রেম ভক্তি ভালবাসা, পাথরের মন্দিরের পরিবর্তে অহেতুকী ভক্তির মাধুর্য, শুচিতা, সরলতা, ভক্তের আত্মনিবেদন। তিনি অন্তর দেখেন। যাহাকে যখন টানেন তাহার অন্তর সোনা হইয়া যায়। তস্কর ভক্ত হয়, দস্যু প্রেমিক হয়, কয়লা গলিয়া হীরা হয়। তিনি সকলকে কোলে নেওয়ার জন্য সর্বদা হাত বাড়াইয়া থাকেন কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষ তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

তিরুমাঙ্গাই একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত। প্রায় অষ্টম শতাব্দীতে কোলবা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব নাম নীলন্। বর্ণ নীল ছিল বলিয়া তিনি ঐ নামে পরিচিত হন। যুদ্ধবিদ্যা তাঁহাদের পেশা। শৌর্যবীর্যের দ্বারা তিনি কোলা রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পরে তিরুমাঙ্গাই করদ রাজ্যের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে গা ভাসাইয়া দেন। প্রায়ই সুন্দরী রমণী এবং নর্তকী দ্বারা আবৃত থাকিতেন। ভিষগ্‌কন্যা কুমুদবল্লী মন্দিরের নৃত্যশিল্পী। তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণের জন্য তিনি কন্যার পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু করদ রাজ্যের অধিপতিকে জামাতা হিসাবে পাইবার ইচ্ছা থাকিলেও কন্যার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ কন্যাই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। কুমুদবল্লী যেমন অশেষ রূপবতী, নৃত্যগীতকুশল তেমনি ভক্তিমতী। বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু তাহার ইষ্ট। তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিবে না। বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত অন্যের বৈষ্ণব চিহ্ন থাকে না। সুতরাং যাহার বৈষ্ণব চিহ্ন নাই তাহাকে বিবাহ করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কুমুদবল্লীর বিবাহের আরও একটি শর্ত ছিল। তাহা যেমন দুরূহ তেমন ব্যয়সাধ্য। যিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন তাঁহাকে নিত্য এক হাজার আট বৈষ্ণব সেবা করিতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই শর্ত মানিয়া নেওয়া অত্যন্ত কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিরুমাঙ্গাই কুমুদবল্লীর রূপে এত মুগ্ধ যে তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কঠিন শর্ত মানিয়া নিলেন। প্রতিবন্ধকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যে কোন উপায়ে, যে কোন শর্তে তাহাকে পাইবার জন্য অধীর হইলেন। কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রথম শর্ত পালন করিলেন। পূর্বে তিনি কোন দেবতার উপাসক ছিলেন কিনা জানা নাই, কিন্তু নৃত্যগীতবিশারদা কুমুদবল্লীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি বিষ্ণুপ্রীতি না থাকিলেও বৈষ্ণব সাজিলেন এবং তাহাকে পাইবার জন্য নিত্য এক হাজার আট

বৈষ্ণব সেবার কঠিন শর্তও মানিয়া নিলেন। অবশেষে বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি কুমুদবল্লীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

নিত্য এত অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব সেবা সহজ নয়, সেবার ক্রটি হইলে বিপদ আছে। তা ছাড়া সেবা-কার্যে প্রচুর অর্থের দরকার। নিত্যসেবায় তাঁহার অর্থ সম্পদ ফুরাইয়া গেল। অথচ বিবাহের শর্ত অনুযায়ী বৈষ্ণব-সেবা বন্ধ করিতে পারেন না। তা ছাড়া পুণ্যকাজে আনন্দও আছে। তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ধার করিয়া সেবা-কার্য চালাইলেন। ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসিল যে ধারও পাওয়া শক্ত হইয়া পড়িল। অর্থাভাবে কোলা রাজার দেয় রাজস্ব বাকী পড়িল, রাজস্ব আদায়ের কোন উপায় না দেখিয়া রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সৈন্য চালনায় তিরুমাঙ্গাই বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার শৌর্যবীর্য, কৌশল এবং সংগঠন শক্তির নিকট কোলার সৈন্য টিকিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। রাজা যে কোন উপায়ে শত্রুকে জব্দ করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুভক্ত পরম বন্ধু। কোলারাজা বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে তিরুমাঙ্গাইয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তিরুমাঙ্গাইয়ের নিকট বন্ধন-দশা তত কষ্টকর নয়, কিন্তু এতকাল বৈষ্ণব সেবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। অগত্যা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় বিষ্ণু স্বপ্নে আদেশ দিলেন যে কাঞ্চিপুরমে বৈষ্ণব-সেবা এবং রাজকর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুপ্তধন মিলিবে; তিরুমাঙ্গাই কোলা রাজার অনুমতিক্রমে কাঞ্চিপুরমে আসিয়া গুপ্তধন উদ্ধার করিলেন। অনাদায়ী রাজস্ব শোধ দিয়া পূর্বের ন্যায় নিত্য বৈষ্ণব-সেবায় রত হইলেন। কিন্তু অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকিলে বিপদ ঘনাইয়া আসে। আয়ের সংস্থান না রাখিয়া নিয়ত মুক্তহস্তে ব্যয় করিলে অর্থনীতির কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। তিরু-মাঙ্গাইয়েরও তাহাই হইল। অর্থসম্পদ ফুরাইয়া গেল। অথচ ভয় হইল পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বৈষ্ণব-সেবা বন্ধ করিলে সেবা অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এমন এক উপায় অবলম্বন করিলেন যাহা সমাজবিরোধী, নীতিবিরোধী এবং ধর্মবিরোধী বলিয়া নিন্দনীয়।

তা সত্ত্বেও ইষ্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন কিংবা কৃপা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন রাত্রে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া

উহার অন্তর্গত এক মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যক্রমে উহা বিষ্ণুমন্দির ছিল। বিগ্রহের নানা রকম সোনা হীরা জহরতাদি নিয়া একটা পুঁটুলি বাঁধিলেন। কিন্তু বিগ্রহের কোমল আঙুলের একটি অঙ্গুরীয়ক খুলিতে গিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। কোন প্রকারে খুলিতে না পারিয়া দাঁতে কামড়াইয়া খুলিবার চেষ্টা করিলেন। বিগ্রহের আঙুলে দাঁতের স্পর্শ লাগামাত্র সমস্ত শরীরে একটা ভয়ানক শিহরণ হইল, অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল, লুণ্ঠন-বৃত্তি দূর হইয়া গেল। ভগবৎ প্রেমে আকুল হইয়া তাঁহার মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া তাল মান লয় সহ প্রাণের আবেগে গাহিতে লাগিলেন। এই ভাবে সহস্রের উপর ছন্দোময় শ্লোক রচনা করিলেন। পরবর্তীকালে উহাই তিরুমোলি (বা পবিত্র উক্তি) নামে সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। মন্দিরাদিতে পূজার অঙ্গ হিসাবে উক্ত গান নিত্য গীত হইয়া থাকে। তিরুমাঙ্গাইয়ের জীবনের গতি পরিবর্তন সম্বন্ধে অন্য রকম মতও প্রচলিত আছে, একদা এক সস্ত্রীক ভগবান্ মনুষ্য বেশে রাস্তা দিয়া যাইবার সময় তিরুমাঙ্গাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়, অলঙ্কারের লোভে শক্তিমান ডাকাত তিরুমাঙ্গাই ঐ যুগলের পথরোধ করিয়া অলঙ্কারাদি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া এক পুঁটুলি বাঁধিলেন। আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যুগল বরং ডাকাতকে বিনা বাধায় কাড়িয়া লইবার সাহায্য করিলেন, পায়ের একটা অঙ্গুরী খুলিতে না পারিয়া ডাকাত দাঁতে কামড়াইয়া নিয়া পুঁটুলিসহ সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পুঁটুলিটি এত ভারী হইয়াছে যে কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না। কোন মন্ত্রশক্তির প্রভাবে এরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ করিয়া তিরুমাঙ্গাই উত্তেজিত হইয়া সোজা প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি কোন যাদু করিয়াছ?' উত্তরে বন্দী বলিলেন 'হ্যাঁ, তোমার ধারণা সত্য, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। আমি উহা বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না, আমি তোমায় অমৃতত্ব লাভের পথ দেখাইব, এস দীক্ষা গ্রহণ কর'। দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়কবাট খুলিয়া গেল, স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হইল। ভগবৎ কৃপায় ডাকাত মহাভক্ত হইল। ভগবান কাহাকে কখন কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাইবেন তাহা তিনিই জানেন, তাঁহার লীলা তিনিই বুঝেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নয়।

তিরুমাঙ্গাই শুভ সংস্কার এবং অসাধারণ প্রতিভা নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া অনিচ্ছায় লুণ্ঠন-বৃত্তি গ্রহণ করিলেও তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি এবং কবিত্বশক্তি মলিন হয় নাই। তিনি প্রায়ই তীর্থভ্রমণ এবং তীর্থদর্শনে

বাহির হইতেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া চারজন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল। প্রথম শিষ্য তোলাক্কান্ খুব তর্কবিদ্ ছিলেন, কেহই তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় শিষ্য তালুধুয়ানস্ নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই যে কোন শক্ত তালা খুলিতে পারিতেন। তৃতীয় শিষ্য নিললায় মিথিপ্পান যে কোন লোকের ছায়ামাত্রে পা রাখিয়া তাঁহার গতি রুদ্ধ করিতে পারিতেন এবং চতুর্থ শিষ্য নিরমল নাডাপ্পান জলে-স্থলে সর্বত্র চলিতে পরিতেন। প্রত্যেকের সম্মিলিত শক্তিতে তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতেন।

একদা শিষ্যাদি সহ ভ্রমণ করিতে করিতে কাবেরী তীরস্থ রঙ্গনাথ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ, বাদুড় চামচিকাদির আবাসস্থল, মন্দির জীর্ণ, বিগ্রহের দুরবস্থা, দেবসেবার কোন ব্যবস্থা নাই, শিয়াল এবং অন্যান্য জানোয়ার নির্ভয়ে বিচরণ করে। পূজারী কোনমতে কিছু ফুল দিয়া প্রাণ নিয়া পলায়। যিনি বিশ্বের প্রভু তাঁহার কেন এরূপ দুরবস্থা! যেন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে নির্বাসনে বাস করিতেছেন। তিরুমাঙ্গাইয়ের হৃদয় ব্যথিত হইল। শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন চাঁদা সংগ্রহ করিয়া জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার এবং বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু কাজে হাত দিয়া একেবারে হতাশ হইলেন, একটি পয়সাও সংগ্রহ হইল না বরং মিলিল তীব্র বাক্যবাণ, চোর সন্দেহে অসহ্য অপমান। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি সমাজ-বিরোধী পন্থা অবলম্বন করিলেন, লোকের দুর্ব্যবহার তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কোমল বৃত্তি শুকাইয়া গেল, প্রতিহিংসার আগুন জলিয়া উঠিল, বজ্রের মত কঠোর হইলেন। ধনীর পদলেহন বৃত্তি ত্যাগ করিবার জন্য শিষ্যদের বার বার উত্তেজিত করিলেন, ধনীরা অত্যাচারী অবিশ্বাসী, গরীবের রক্তশোষণকারী, তাহাদের ধন কাড়িয়া লইয়া জীর্ণ মন্দির সংস্কার, বিগ্রহ সেবার বন্দোবস্ত এবং গরীবের সাহায্য করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না, বরং ন্যায় কাজই হইবে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ, শিষ্যদের অলৌকিক শক্তি এই কাজেই সহায় হইল। গোপন ষড়যন্ত্র আশাতিরিক্ত ফল দিল। প্রথম শিষ্য তর্কবিদ্ তোলাক্কান কোন বড় লোকের নিকট যাইয়া তাহাকে তর্কে নিযুক্ত রাখিতেন এবং অন্যান্য শিষ্যেরা কেহ নিশ্বাসে তালা ভাঙিয়া, কেহ মালিকের ছায়াতে পা রাখিয়া তাহাকে চলৎশক্তিহীন করিয়া, কেহ লুণ্ঠনের কাজ সমাধা করিয়া নিতেন। লুণ্ঠনের এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হইলেন এবং দলপতি

তিরুমাঙ্গাইয়ের পরামর্শক্রমে লুণ্ঠিত ধন কাবেরী নদীস্থ একটি দ্বীপে লুকাইয়া রাখিতেন।

ইহার পর তিরুমাঙ্গাই জীর্ণ রঙ্গনাথ মন্দিরের সংস্কারের কাজে মন দিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া বহু দেশের বিখ্যাত শিল্পী কারিগর আনিয়া প্রথমে গর্ভমন্দিরের কাজে হাত দিলেন। নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে দেওয়াল দিলেন। অভ্যন্তর ভাগ শেষ হইতে দুই বৎসর লাগিল, নাটমন্দিরের বহির্ভাগ শেষ করিতে চার বৎসর, দ্বিতীয় প্রাচীর বেষ্টনের কাজে ছয় বৎসর, তৃতীয় প্রাচীর বেষ্টনের কাজে আট বৎসর, চতুর্থ প্রাচীর বেষ্টনে দশ বৎসর এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রাচীরের কাজে আঠার বৎসর লাগিল। হাজার হাজার শিল্পী কারিগর নিয়ত কাজ করিয়া মন্দিরের কাজ শেষ করিতে ষাট বৎসর লাগিয়াছে। তিরুমাঙ্গাই এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। সংকল্প রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইষ্ট ও বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া নিজের এবং শিষ্যদের খুব আনন্দ হইয়াছে।

সিদ্ধি দ্বারা কার্যের ভালমন্দ বিচার হয়। উহাই মাপকাঠি। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ নির্মিত হইবার পর লোকের পূর্বধারণা পরিবর্তিত হইল। ধনীরা মনে করিলেন তিরুমাঙ্গাই প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাদের কাহারও হয়ত আশঙ্কা হইল যদি সাহায্য না করেন তবে তাঁহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে, প্রাণ নিয়া টানাটানি পড়িবে। সাহায্য করিলে প্রাণ রক্ষা পাইবে, নাম-যশও ছড়াইবে। তাঁহারা তাঁহাকে নিজ নিজ এলাকার শিল্পী কারিগর দিয়া মন্দির নির্মাণের কাজে সাহায্য করিলেন। তিরুমাঙ্গাইয়ের লুণ্ঠন দ্বারা ধনীর চেয়ে গরীবেরা অধিক উপকৃত হইয়াছিল। শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল এবং দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

তিরুমাঙ্গাইয়ের একটা বিশেষ গুণ ছিল। তিনি কর্মীদের ভাল বেতন দিতেন, কখনও টাকা বাকী রাখিতেন না। যদিও লুণ্ঠন-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, লুণ্ঠনের এক কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না, সাধারণ ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করিতেন। অসাধারণ সংযমী, ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রেমাশ্রু ঝরিত, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত।

মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করিয়া তিরুমাঙ্গাই শিল্পীদের প্রচুর অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। হাতে এক কপর্দকও রহিল না। লুণ্ঠন কার্য হইতে বিরত হইলেন। পূর্বে যাহারা লুণ্ঠনে সাহায্য করিত তাহারা লুণ্ঠনের অংশ দাবি করিল। নূতন লুণ্ঠনের সুবিধা নাই, অথচ অর্থ না হইলে চলে না। তিরুমাঙ্গাইও অর্থ দিয়া

সাহায্য করেন না, তাহাদের ধারণা হইল তিরুমাঙ্গাই লুণ্ঠনের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। দাবি পূরণ না হইলে তাহাকে হত্যা করিবে ভয় দেখাইল। তাহাদের ষড়যন্ত্র টের পাইয়া তিরুমাঙ্গাই নূতন উপায় উদ্ভাবন করত শিষ্য নিরমল নাডাপ্পানের কানে চুপি চুপি কি বলিলেন। শিষ্য দস্যুদের আশ্বাস দিলেন কাবেরী নদীকূলে গুপ্তধন রক্ষিত, উহার অংশ নিতে হইলে ওখানে যাইতে হইবে। ইহার পর এক প্রকাণ্ড বোট ভাড়া করিয়া তাহাদের লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন বর্ষাকাল। নদীতে প্রচুর জল। স্রোত প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে, দুর্যোগে যাওয়া বিপদজনক হইলেও দস্যুরা লোভে নৌকায় চড়িল। সন্ধ্যায় ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার, মনে হয় ঘোর অমানিশি চারিদিক ঘেরিয়া আছে। শিষ্য নিরমল নাডাপ্পান তাহাদের পথ দেখাইয়া চলিল। তিরুমাঙ্গাই এবং অন্যান্য শিষ্যেরা দস্যুদের খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন মাঝনদীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। একটু পরে তাহা থামিয়া গেল, বোটের আর কোন সাড়া পাওরা গেল না। দস্যুদের কি অবস্থা হইল, নৌকা কোথায় গেল কিছুই বুঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে শিষ্য নিরমল নাডাপ্পান সিদ্ধাই-বলে জলের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়া আসিলেন। মাঝনদীতে কি ঘটিয়াছে গুরুর নিকট সবিস্তারে বলিলেন। সব দস্যুদের সলিল সমাধি হইয়াছে। তিরুমাঙ্গাই বলিলেন, 'যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই, তাহাদের আত্মার সদ্‌গতি হইবে। তাহারা ভাগ্যবান, ভগবান রঙ্গনাথ তাহাদের নিজের কাছে টানিয়া নিয়া বৈকুণ্ঠে আশ্রয় দিয়াছেন। কাবেরীতে সহস্র দস্যুর প্রাণনাশ হইয়াছে, যেস্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এখন কোলারণ নামে প্রসিদ্ধ।

ইহার পর তিরুমাঙ্গাই শিষ্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যে উদ্দেশ্যে লুণ্ঠন-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে। লুণ্ঠনের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন হইতে সর্বান্তঃকরণে ভগবানের সেবা এবং ধ্যানে ব্যাপৃত থাকা আমাদের কর্তব্য।' যেমন সংকল্প তেমন কাজ, ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। দুরন্ত দস্যু নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হইলেন।

॥ সাত ॥

তিরুপ্পান আলোয়ার

শাস্ত্রে দেখা যায় অন্তর্যামী ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অগ্নি, সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, জল, পৃথিবী, নর-নারী, কুমার, কুমারী, সুস্থ, জরাগ্রস্ত, ভক্ত, পাপী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ রূপে সর্বত্র তিনি আপনাকে প্রকাশ করিলেন। তিনি মহৎ সুতরাং সবাই মহৎ, প্রত্যেক রূপ তাঁহার রূপ। কেহ ঘৃণ্য নয়, কাহাকেও ঘৃণা করা মানে সৃষ্টিকর্তাকে ঘৃণা করা। তিনি প্রেম স্বরূপ, সত্য স্বরূপ। তাঁহাকে জানাই জীবনের লক্ষ্য।

হিন্দু মাত্রেই গঙ্গাকে পবিত্র মনে করে, উহার অশেষ মাহাত্ম্য। দক্ষিণ ভারতে কাবেরীই গঙ্গার মত পবিত্র। কুর্গে ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া মহীশূর এবং তামিল প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সাগরে পড়িয়াছে। ইহার জল পবিত্র, উভয়কূলে অবস্থিত জমি উর্বর, দীর্ঘ পাঁচ শত মাইল গতিপথে তিনটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে। মুখে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপট্টম্ নামক স্থানে প্রথম, মধ্যপথে শিবসমুদ্রম্ নামক স্থানে দ্বিতীয় এবং নিম্নে শ্রীরঙ্গমে তৃতীয়টি অবস্থিত। প্রত্যেক স্থানে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দির শত শত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগাইতেছে।

যে মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিতে যাইতেছি তাঁহার লীলাস্থল এই তৃতীয় দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম্। রঙ্গনাথ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা, বৈষ্ণবদের ধারণা রঙ্গনাথ অযোধ্যার ইক্ষাকু বংশের কুলদেবতা। লঙ্কাধিপতি রাবণের ছোট ভাই বিভীষণের নিজের দেশে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মনের সাধে সেবা করিবার ইচ্ছা হইলে রামচন্দ্র প্রীত হইয়া ভক্তকে উক্ত বিগ্রহ দান করেন। কিন্তু দেশে বিগ্রহের মর্যাদা রক্ষা হইবে কিনা মনে দ্বিধাভাব উঠাতে পথে কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গমে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বারো বৎসর অন্তে আসিয়া উক্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়া যাইতেন। মন্দিরের দুরবস্থা পরে চরমে উঠিলে তিরুমাঙ্গাই আলোয়ার চারজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিষ্যের সাহায্যে লুণ্ঠনাদি দ্বারা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহার সংস্কার করেন, এবং বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন। মন্দিরটি সাতটি দেওয়ালে ঘেরা, গর্ভমন্দির, বিমান, তোরণ, গোপুরম, প্রভৃতি নানা কাজ

বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্পী, কারিগর দ্বারা শেষ করিতে যাট্ বৎসর লাগিয়াছে। মন্দির অতি চমৎকার, বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থাও চমৎকার। উৎসবের সময়ে গরুড় বাহনে স্থাপন করিয়া, নানা রকম ফুলের মালায় সাজাইয়া বিগ্রহের শোভাযাত্রা বাহির হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতে থাকেন। সহস্র ভক্ত দর্শক ভক্তি ভরে পূজা দিয়া থাকেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে সুসজ্জিত হাতী, ঘোড়া ধীর মন্থর গতিতে চলে, ষাঁড়ের পিঠে স্থাপিত বাদ্যযন্ত্র তালে তালে বাজিতে থাকে, ফুল, ফল মিষ্টি ধূপ, দীপাদি দ্বারা যখন বিগ্রহের পূজা আরতি হয় তখন একটা সুন্দর আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ভাবে শত শত বৎসর ধরিয়া অগণিত ভক্ত ও দর্শকের প্রাণের আকূতিতে ভবসাগরের কাণ্ডারী, আশ্রয়স্থল, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা ত্রিভুবনেশ্বর রঙ্গনাথের মন্দির ভক্তদের নিকট মর্ত্যের বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে। যে মন্দির অসংখ্য ভক্তের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটায় তাহার অবদান যে অপরিমেয় ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তিরুপ্পন আলোয়ার এই অগণিত ভক্তের অন্যতম। তিনি ভক্তির ডোরে ভগবানকে বাঁধেন। তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে তিনি পঞ্চম, সমাজে অস্পৃশ্য। কিন্তু পঞ্চমেরাই সমাজকে সর্ব প্রকারে সেবা করিয়া সুস্থ রাখে। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার যাহাদের উপর থাকে তাহাদের প্রতি সমাজ ঘোর অবিচার করে, ইহা সমাজের কলঙ্ক, এই অবিচারের ফলে সমাজ বহু কৃতিসন্তানের প্রতিভা এবং আধ্যাত্মিক অবদান হইতে বঞ্চিত হইয়া পঙ্গু হইয়া থাকে। তিরুপ্পন আলোয়ারকে ধান ক্ষেতে পাওয়া যায়। তিনি কোন্ কূলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, কোথায় বাস করিতেন কিছুই জানা যায় না, কোন অন্ত্যজ দয়া করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। জাতিতে অন্ত্যজ কিংবা অন্ত্যজের ঘরে প্রতিপালিত বলিয়া শিক্ষা, দীক্ষা, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন তাহার সবগুলি হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। য়াল (বীণার মত) নামক এক প্রকার তারের যন্ত্র সাহায্যে গান করা তাঁহাদের জাতীয় পেশা ছিল বলিয়া তিনি গান বাদ্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন, সাধারণ লোকের জীবনধারা হইতে পৃথক বলিয়া লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। কিন্তু মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যে পরমার্থ লাভ, অন্তিমে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। রঙ্গনাথ তাঁহার ইষ্ট, বাজাইয়া তাঁহার ভজনে সদা রত থাকিতেন। শুভ সংস্কারের পুঁজি নিয়া

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কখন কখন ভগবৎ ভজন এবং ধ্যানে এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন যে বাহিরের হুঁশ থাকিত না। অচ্যুত বলিয়া মন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ দর্শন করা, পূজা করা কোন প্রকার অধিকার তাঁহার ছিল না। প্রবল ইচ্ছা হইলেও উহা পূরণের কোন প্রকার সুযোগ ছিল না, কিন্তু সমাজের এই অবিচারের জন্য তিনি কখনও সমাজের প্রতি দোষারোপ করেন নাই। বরং নিজের অদৃষ্ট দোষেই ভগবৎ সেবার অধিকার লাভে বঞ্চিত বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেন। রঙ্গনাথের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেন যেন দেহান্তে অশুচিজনিত দোষ রহিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পান। কাবেরী তীরে মন্দিরের সন্নিকটস্থ ঘাটে ভগবৎ ভজন এবং ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। মন্দিরের চূড়ার প্রতিবিম্ব কাবেরীর স্বচ্ছ জলে পড়িলে তিনি তাহাই দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। এই ঘাট হইতে মন্দিরের দেব সেবার জল নেওয়া হইত। একদিন ভজন এবং ইষ্ট চিন্তায় তাঁহার মন এত নিবিষ্ট ছিল যে বাহিরের হুঁশ ছিল না, চক্ষু দিয়া অনর্গল ধারা বহিতে লাগিল। এই সময়ে মন্দিরের সেবক ব্রাহ্মণ পুরোহিত লোকসরঙ্গ মুনি স্নান করিয়া জল নিতে আসিলেন। তিরুপ্পনকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ভাবিলেন সে হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বার বার ডাকা সত্ত্বেও কোন সাড়া পাইলেন না। অচ্যুতের স্পর্শে নদীর জল অপবিত্র হইয়াছে ভাবিয়া তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হইলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ভুল করিয়াও নদীর জল অপবিত্র না করে তজ্জন্য তাহাকে উচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নির্মম ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। ত্যাগ, সংযম, শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষমা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সব ভুলিয়া গেলেন; অহমিকা, ঘৃণা, প্রতিহিংসা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। এত প্রহার করিয়াও প্রতিহিংসা মিটিল না। ইট পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন। তিরুপ্পনের শরীর হইতে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। তিনি রঙ্গনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। প্রভুর সেবার ব্যাঘাত করিয়াছেন বলিয়া নিজেই দুঃখিত। লোকসরঙ্গ মুনির নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তবু অত্যাচারের বিরাম নাই। অবশেষে ভয়ে স্থান ত্যাগ করিয়া রক্ষা পাইলেন, নইলে হয়ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোকসরঙ্গ মুনি তাঁহাকে প্রাণে বধ করিতেন। তিরুপ্পন ভক্ত না হইয়া যদি সাধারণ লোক হইতেন তবে সমাজের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তি ভগবৎমুখী, সহ্য করা ভক্তের স্বভাব।

প্রহারে জর্জরিত তিরুপ্পন পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, মনে খুব আঘাত পাইলেন। এতকাল অচ্যুত বলিয়া মন্দিরে যাওয়া নিষেধ ছিল কিন্তু এখন হইতে নদীতে স্নান করার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইলেন। অভিমানে কাবেরীর

অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট হৃদয়ের আবেগ জানাইলেন, 'মা, কোথায় তোমার উৎপত্তি কোথায় শেষ আমি কিছুই জানি না, আদি অন্ত না জানিলেও তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস অচল। আমি জানি তোমার পবিত্র জলে স্নান করিয়া মানুষ পবিত্র হয়। এমন কি তোমার চিন্তাতেই পাপ বিদূরিত হয়। কত নোংরা জিনিস তোমার স্রোতে ভাসিয়া চলে, তুমি তাহাদের বক্ষে স্থান দাও। অসংখ্য পাপী তাপী তোমার পবিত্র জলে স্নান করিয়া ধন্য হয়; কুকুর, বিড়াল, শৃগাল এবং কত পশু পক্ষী জানোয়ার তোমার জল পান করিয়া ও তোমার বক্ষে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া নোংরা করে, তথাপি তুমি পবিত্র থাক। শুধু আমার বেলায় ব্যতিক্রম কেন হইল বুঝিতে পারি না। তোমার পায়ে স্থান দেওয়ার কথা দূরে থাকুক আমার ছায়াও কি তোমার পক্ষে অসহ্য? আমার ছায়াতেও কি এত অপবিত্রতা জমাট বাঁধিয়া আছে?' ইহার পর তিরুপ্পন ইষ্ট রঙ্গনাথের অবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভু তুমি চিরকাল প্রভু, আমি জনমে জনমে তোমার দাস। আমি বরাবর বিশ্বাস করি তুমি বৈশ্বানর। তোমার স্পর্শে বিশ্ব পবিত্র হয়, তুমি চর, অচর সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, তুমি সকলেরই ভগবান, শুধু দ্বিজাতীদের নও, তুমি একমাত্র তাঁদেরই, অন্যদের নও, তোমার সেবার অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই আছে, অন্যের নাই—তাঁহাদের এই দাবি কি অসঙ্গত নয়? ইহা কি অবিচার নয়? তুমি বিশ্বনাথ, এত অন্যায়, অবিচার কি ভাবে সহ্য করিতেছ? আমার শরীরে প্রহার জনিত রক্ত বহিতেছে। বহুক, তাতে ক্ষতি নাই। তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। অমানুষিক অত্যাচার আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কিন্তু তোমার কথা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বর্ণ-বৈষম্যের জন্য তোমার অসংখ্য ভক্ত, সন্তান, তোমার দর্শন, সেবা, পূজা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে কি তোমার প্রাণে লাগে না? তুমি কি হৃদয়হীন? এই অন্যায়ের আঘাতে তোমার হৃদয়বীণার তার ছিন্ন হয় না? তুমি কি মন্দিরে শৃঙ্খলাবদ্ধ? তোমার কি ভক্তদের দর্শন দিবার, তাহাদের সেবা পূজা গ্রহণ করিবার অধিকার নাই? তুমি কি বধির? কিছুই শুনিতে পাও না? মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে কি তোমার শ্রবণ শক্তি লোপ পাইয়াছে? তুমি কি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছ? কিছুই দেখিতে পাও না? চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্যাদি পাইয়া তুমি কি আপন কর্তব্য ভুলিয়াছ? বিশ্বনাথের কি বিশ্বের প্রতি কোন কর্তব্য নাই? যদি তাহাই হয় তবে তুমি শৃঙ্খলবদ্ধ মুক্ত কবে হইবে? আমি প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্রই শৃঙ্খলমুক্ত হও।"

এইবার মনে হইল চাকা ঘুরিয়াছে। ভক্তের করুণ প্রার্থনা বৃথা যায় নাই। রঙ্গনাথের বিগ্রহ সজীব হইয়া যেন নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করিল। তিনি কার্য দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে ভক্তের অভিমান অমূলক। তিনি চিরকাল ভক্তের অধীন। ভক্তের প্রীতিতে তাঁহার প্রীতি। ভক্তের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত। লোকরসঙ্গ মুনি নদীতে স্নান করিয়া কলসীপূর্ণ জল নিয়া মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন মন্দিরের সমস্ত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তাঁহার বিবেকের দ্বারও রুদ্ধ। নিরীহ তিরুপ্পনকে বেদম প্রহারে জর্জরিত করিয়া রক্তের ধারা বহাইতে তাঁহার বিবেকে একটুও বাধে নাই, বরং অচ্যুতকে উচিত শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছিলেন। মন্দিরের দরজা খুলিবার জন্য লোকসরঙ্গ মুনি নাম ধরিয়া একে একে সকল পুরোহিতদের উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। তাঁহার চীৎকারে মন্দিরের কর্মচারী এবং অন্যান্য পুরোহিত সকলে উপস্থিত হইলেন। কে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছে কেহ জানেন না। অথচ দরজা খোলা না হইলে রঙ্গনাথের সেবা পূজা সব বন্ধ থাকিবে। সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। একটা অব্যক্ত আশঙ্কা সকলকে আচ্ছন্ন করিল। তাঁহাদের মনে হইল অসাবধানতা কিংবা ত্রুটি বশতঃ প্রভুর সেবার বিঘ্ন হইয়াছে। সকল পুরোহিতদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ ত্রুটির প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত প্রভু কোন সেবা পূজা গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছেন। দেবতার অভিশাপে কাহারও রক্ষা নাই।

সূর্যের তেজ সকলের ঘরে এমন কি চণ্ডালের ঘরেও প্রবেশ করে। ভগবানের নিকট উচ্চ নীচ ভেদ নাই, ভক্তকে নির্মম প্রহার করা মানে ভগবানকেই প্রহার করা। অন্ত্যজ ভক্ত তিরুপ্পনকে প্রহার করিয়া লোকসরঙ্গ মুনি নিজেই প্রভুর নিকট অন্ত্যজ হইলেন। তাই তাঁহার মত অবিবেকীর জন্য রঙ্গনাথের দ্বার রুদ্ধ হইল। যে আঘাত তিনি হানিয়েছেন তাহার মূল্য হিসাবে প্রত্যাঘাত তাঁহারই প্রাপ্য। ঘোরতর পাপের ফল তিন বৎসর, তিন মাস, তিন দিন কিংবা তিন ঘণ্টায় পাওয়া যায়। লোকসরঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উহার অন্যথা হইতে পারে না, নিজের অবস্থা বুঝিয়া তিনি অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া রঙ্গনাথের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে দৈববাণী শুনিলেন "কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি আমার পরম ভক্ত তিরুপ্পনকে কঠোর প্রহারে জর্জরিত করিয়াছ। ভগবানই ভক্ত হন। ঐ প্রহার আমার গায়েই লাগিয়াছে। ভক্তের শরীর ভগবানের দেহ হইতে অভিন্ন। তোমার অপরাধ অমার্জনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুষ্কার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

কর এবং তাঁহাকে নিজে কাঁধে করিয়া এই মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়া আমার নিকট লইয়া আস তৎক্ষণ তোমার ক্ষমা নাই, এবং মন্দির দ্বার রুদ্ধই থাকিবে।"

বাণী শুনিবামাত্র লোকসরঙ্গ মুনি ত্বরিত পদে নদীতীরে গিয়া দূরে প্রাণভয়ে কম্পমান তিরুপ্পনকে দেখিতে পাইলেন। এবং প্রাণরক্ষা দুষ্কর হইবে ভাবিয়া তিরুপ্পনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি করজোড়ে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলেন, 'মহাশয় আমাকে স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র দেহ কলুষিত করিবেন না, নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি মহা অন্যায় করিয়াছি। হয়ত কঠিন পাপের ফলেই এরূপ হইয়াছে। আমি তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত। আপনি দূর হইতে ইটপাটকেল ছুঁড়িয়া আমায় শাস্তি দিন। কিন্তু প্রহার করিলে আমার দেহ স্পর্শে আপনার শরীর পাপাক্রান্ত হইবে। আপনি আমার পাপের জন্য নিজেকে কষ্ট দিবেন না।"

লোকসরঙ্গ মুনি কি অন্যায় কার্য করিয়াছেন এখন বুঝিয়াছেন। এ পাপের খণ্ডন নাই। তবু অনেক দিন ভগবানের সেবা করিয়াছেন বলিয়া হয়ত ভগবান কৃপা বশতঃ হৃদয়ের মলিনতা কিছু দূর করিয়াছেন। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হইয়া লোকসরঙ্গ মুনি দৈববাণী অনুযায়ী অবিলম্বে অন্ত্যজ তিরুপ্পনকে কাঁধে তুলিয়া মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে শুচি হইলেন। তিরুপ্পনের অনুরোধ কোথায় ভাসিয়া গেল। শোভাযাত্রায় তাঁহাকে পুরোভাগে বসাইয়া মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত করত বিবিধ উপাচারে পূজা করিয়া ধন্য হইলেন। মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে তিরুপ্পনের রঙ্গনাথ দর্শন হইল। ভক্তের টানে ভগবানের সিংহাসন টলিল। অসম্ভব সম্ভব হইল। ইষ্ট দর্শনে ভক্ত তিরুপ্পনের হৃদয় আবেগে নাচিয়া উঠিল। তিনি ১০টি শ্লোকে রঙ্গনাথের রূপ এবং মহিমা বর্ণনা করিলেন, ক্রমশ, বাক্য রুদ্ধ হইল। তাঁহার আত্মা মর জগৎ ছাড়িয়া রঙ্গনাথের অঙ্গে মিলাইয়া গেল; উক্ত দশটি শ্লোক বৈষ্ণব সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। বেদান্ত দেশিকান ঐগুলির ভাষ্য লিখিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। দৈন্য, সরলতা, বিনয়াদি সৎগুণে ভূষিত অস্পৃশ্য তিরুপ্পন শুধু স্পৃশ্য নয়, ঋষি হইলেন। দ্বাদশ আলোয়ারের অন্যতম হিসাবে পূজা পাইলেন। রঙ্গনাথের মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার মন্দির উঠিল। যুগ যুগ ধরিয়া নীচ ও অন্ত্যজদের দূরে রাখার অপরাধ ক্ষালনের জন্য ব্রাহ্মণগণও এই পারিয়া আলোয়ারের পূজা করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন।

॥ আট ॥

বিদ্যারণ্য স্বামী

মহান্ আদর্শের প্রতিবিম্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়ে না, সেইজন্য ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ঘাত-প্রতিঘাত আসে। তখন কোন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ কাল ও পাত্রানুযায়ী নূতন পটের নির্দেশ দিয়া থাকেন। পথ নির্বাচন কঠিন সমস্যা, আধুনিক বিদ্বৎসমাজে অনেকে বলিয়া থাকেন জীবনে নানা সমস্যা আছে, যাহার দ্বারা ইহার সমাধান হয় তাহাই প্রকৃষ্ট পথ। তাহা জীবনবাদ। আত্মা, মুক্তি, ঈশ্বর ইত্যাদি প্রশ্নের কোন সার্থকতা নাই, উহা জীবনকে সমৃদ্ধ করে না, বিশাল ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে; জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির পরিধি রুদ্ধ করে, প্রাণধর্মের প্রতিরোধ করে, অজ্ঞেয় শূন্যতা আনয়ন করে, মানুষকে সংগ্রাম-ভীরু, অলস, শক্তিহীন, যুক্তিহীন ও কর্মবিমুখ করে, জীবদের মূল্যবোধ কমাইয়া দেয়, এই সব কারণে জীবন বিষাদময় হয়, সুতরাং এই অবান্তর বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করা বৃথা, কেননা জীবনের মূল্য আছে উহাকে অস্বীকার করা যায় না, জীবন মানে চলমানতা, শক্তি, অর্থ, জীবনই লক্ষ্যসাধন, সিদ্ধি ও সত্য। এইজন্যই মনোমুগ্ধকর জীবনবাদই প্রগতির প্রকৃষ্ট লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন এবং দিন দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছেন।

দেহ মন লইয়া মানুষের শরীর, ইহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এই হিসাবে জীবনবাদ সত্য। কিন্তু ইহার চেয়েও অধিক মূল্যবান জিনিসের সন্ধান ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায় এবং ইহা অধিকতর সত্য। ইহা অতিজীবনবাদ। ইহাতে জীবনের নূতন আদর্শ পাওয়া যায়। এই দর্শনের লক্ষ্য আত্মতত্ত্ব আবিষ্কার, গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা। আত্মার অস্তিতেই দেহ, মন, হৃদয়াদির অস্তিত্ব। এই কারণে আত্মবিজ্ঞানের মূল্য সমাধিক। ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তি এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত, সুতরাং ইহার মূল্য অপরিমেয়। অতিজীবনবাদ জীবনবাদের সমৃদ্ধ পরিণতি এবং মহত্তম সত্য, দেহের সীমা আছে, ক্ষয় আছে, মনের ও হৃদয়ের বাধা আছে, পরিবর্তন আছে কিন্তু আত্মার সীমা নাই, ক্ষয় নাই, রূপান্তর নাই। আত্মার জন্যই জীবন সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আত্মাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত জীবনকে নিরন্তর নিজের দিকে টানিতেছে, আত্মাই প্রকৃত জীবন। ইহার মূল কথা বিশ্বাত্মবোধ, ধর্ম বিশ্বমানবধর্ম,

বাণী বিশ্বমৈত্রী, তত্ত্ব একত্ব—এককে বিশ্ব ও আত্মার মধ্যে অনুভব, বৈচিত্রের মধ্যে স্থাপন, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি। সুতরাং ইহাই প্রকৃষ্ট পথ।

অতিজীবন তথা বৃহত্তর জীবনকে ভিত্তি করিয়াই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষী, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্ম, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য এখনও সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় আছে। শত ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় নাই। এই অতিজীবনবাদে আছে আশার আলো, প্রজ্ঞার কিরণ, প্রাণে স্পন্দন জাগাইবার প্রেরণা, সত্যের পথ, শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণ, আর আছে মনুষ্যত্ব গঠনের মাল-মশলা, বিশ্বসমাজ গঠনের ভিত্তি। ইহার প্রসারে আছে আর্য সভ্যতার বিস্তৃতি, দর্শনাদির উদ্ভব, ভাগবতী জীবন যাপন, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব ও অমরত্ব লাভের সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম, অধিকাংশই নগণ্য, গ্রামের খবর অল্পলোকেই রাখেন। কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সেই গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়। অন্ধ্র প্রদেশের বেলারি জিলার অন্তর্গত হাম্পি গ্রাম এই কারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। বিদ্যারণ্য স্বামীর জন্মে এই গ্রাম ধন্য হইয়াছে। সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষেত্রে এই মহাপুরুষের অবদান অপরিমেয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এমন একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন দেশের গৌরব লুপ্তপ্রায় এবং দুরবস্থা সীমাহীন। তিনি নূতন পথের নির্দেশ না দিলে কি অবস্থা দাঁড়াইত অনুমান করা কঠিন।

প্রায় ১২৭৮ সালে দরিদ্র, ধর্মপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ মায়ণের ঘরে ভরদ্বাজ বংশে বিদ্যারণ্য স্বামীর জন্ম হয়, তাঁহার মাতা শ্রীমতীও স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা এবং উদার ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম মাধব। দরিদ্রের ঘরে জন্ম বলিয়া মাধব বাল্যে প্রাচুর্যের সুখে বঞ্চিত ছিলেন কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপকে স্বীকার করেন নাই, বরং তাহার আশীর্বাদ ও অবদান—উদারতা, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব ও অমরত্ব লাভের উপাদানকে সাদরে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার আরও দুই ভাই ছিলেন। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এক ভগ্নীও ছিলেন। তিনিও বিদুষী ছিলেন তবে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই পরিবার ছিল ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বেদ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,

ধর্মচর্চা ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বংশের ধারা। পিতা মায়ণ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত। চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শনাদি বহুবিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রুতিধর ভ্রাতা মায়ণের স্থায় মেধাবী মাধবও শ্রুতবিষয়ের নির্ভুল অবতারণা করিতে পারিতেন। ঐ সময়ে কাঞ্চিপুরম্ নগরেই দাক্ষিণাত্যের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই বাণীমন্দিরে বহু দেশের বহু প্রতিভাবান্ অধ্যাপক, দার্শনিক, আচার্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানে রত থাকিতেন। তাঁহাদের অধীনে গবেষণা চালাইবার সুযোগ মিলিত বলিয়া এখানে বিদ্যার্থীর ভিড় হইত। এইরূপ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভের ফলে বহুসংখ্যক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও উপযুক্ত আচার্য তৈয়ারী হইত। ইহাতে দেশ লাভবান্ হইত। পিতার চতুষ্পাঠীতে পাঠ শেষ করিয়া মাধব এই গবেষণাগারে যোগ দিলেন। এখানে তাঁহার বহু সতীর্থ জুটিয়াছিল। বেঙ্কটনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল দ্বৈত দর্শন। গবেষণার বিষয় পৃথক্ হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল, কখনও শিথিল হয় নাই। মেধাবী মাধব অসাধারণ ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহায়ে অল্প সময়ের মধ্যে বহু শাস্ত্র বিশেষত তাঁহার প্রিয় বিষয় অদ্বৈত বেদান্ত আয়ত্ত করিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিত ও আচার্য নন, তিনি দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী।

কাঞ্চিপুরম্ শিক্ষাকেন্দ্রে গবেষণা শেষ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন এবং গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ করিলেন। বংশের ধারা অনুযায়ী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রের ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনি লিখিয়া অধ্যাত্ম বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিলেন কিন্তু সাংসারিক দৈন্য ঘুচিল না, লক্ষ্মী দেবীর কৃপা হইতে বঞ্চিত রহিলেন, তৎসত্ত্বেও সরস্বতীর আরাধনা হইতে বিরত হইলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার লিখিত ভাষ্যাদি বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট আলোড়ন আনিয়াছে। তাঁহার মধ্যে একটা বিদ্রোহী সত্তা ছিল। আত্মিক আশ্রয়ের প্রয়োজনে তাহা বর্বরতা, মিথ্যা এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। বিশেষত যখন দেখিলেন, শাসকের ক্ষমতা আছে আদর্শ নাই, ক্ষমতার প্রয়োগ আছে স্থায়বিচার নাই তখন এই বিদ্রোহী সত্তা ধৈর্যহীন হইল। ঐ সময়ে প্রতিকূল পারিপার্শিক অবস্থায় লোকের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। বিধর্মীর অত্যাচার, চারিদিকে গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, যুবতীর শ্লীলতাহানি, ব্যাপক মঠ মন্দির ধ্বংস তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। ধর্ম উৎপীড়িত, সংস্কৃতি পদদলিত, অথচ কোথাও অন্যায়ের প্রতিকারে একটি অঙ্গুলি-হেলন নাই। জনসাধারণের ব্যাপক নিশ্চেষ্টতা এবং হিন্দুরাজগণের উদাসীনতা দ্বারা অন্যায়েরই সমর্থন এই দেশপ্রেমিককে পাগল করিয়া তুলিল। ধর্মহীনতাই যে এই দৈন্যের কারণ

ইহা বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না। ইহার প্রতিকার না হইলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য কিন্তু তিনি নিজে নিঃসম্বল দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্য তাঁহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে নিস্পেষিত করিতেছে। তিনি ভালভাবে জানেন দারিদ্র্য-দোষ মানুষের গুণ-রাশিকে নষ্ট করে, নিশ্চেষ্টতা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়, প্রতিকার আনে না, অথচ প্রবল শত্রুর বিশেবত রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে যে বিপুল অর্থ, গণশক্তি এবং শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহার নাই, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই যে এই সব পাওয়া যাইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। মানুষের ইচ্ছায় জগৎ চলে না, দৈবই প্রবল। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপা লাভের আশায় মাধব ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে প্রার্থনা, জপ, ধ্যান এবং কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। সংকল্প সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপাতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইভাবে সাতদিন কাটিয়া গেল। আশার আলো খুঁজিয়া পাইলেন না। একদিন দৈববাণী শুনিতে পাইলেন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। দারিদ্র্যমুক্তি, ঐশ্বর্যলাভ, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রসেবার স্বপ্ন কোনটাই সফল হইবে না। গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া মাধব ভাবিলেন অভিশপ্ত জীবন রাখিয়া লাভ কি! তাহার চাইতে মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়, কিন্তু মৃত্যুবরণেও মানুষের স্বাধীনতা নাই। সময় না হইলে যমরাজ কৃপা করেন না। তাঁহার সম্মুখে একমাত্র পথ আত্মহত্যা; কিন্তু সে কি ভয়ঙ্কর, কল্পনা করিতেও বাধে। ইহার মত গুরুতর পাপ কিছু নাই। অন্য পাপের খণ্ডন আছে এই পাপের খণ্ডন নাই, সাক্ষী শাস্ত্র। এই সময় তাঁহার উপর দেবীর অলক্ষ্য কৃপা বর্ষিত হইল। বৈরাগ্য গ্রহণের লগ্ন আসিল, কিন্তু এই বৈরাগ্য সর্বত্যাগী হইয়া শুধু নিজের মুক্তিলাভের লোভে গিরিগুহায় বসিয়া যোগসাধনের ত্যাগ নয়। এই ত্যাগ সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশমাতৃকার সেবায় এবং ধর্মের আচরণ ও প্রচারে নিজেকে উৎসর্গীকরণ। গভীর চিন্তার পর স্থির করিলেন আর সংসারে ফিরিবেন না। মাধব চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া দক্ষিণদেশে সন্ন্যাসীর পরম ধাম শৃঙ্গেরীমঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং মঠাধীশ বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নব জীবন লাভ করিলেন। নূতন নাম হইল বিদ্যারণ্য তীর্থ। ইহার পর তাঁহার জীবনের পট পরিবর্তন হইল। সুপ্ত মহত্ব ও দেবত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র তৈয়ার হইল। দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিঃসম্বল অভিশপ্ত জীবনের যে ধারা মরুপথে শুকাইবার উপক্রম হইতেছিল তাহা বেগবতী হইল। দারিদ্র্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিল না। বিধি সদয় হইলেন। ত্যাগের মহিমা ঘোষিত হইল। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। বিধর্মীর অন্যায় অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংসকার্য বন্ধ হইল। দেশপ্রেমিকের

স্বপ্ন রূপায়িত হইবার পথ প্রশস্ত হইল। সুযোগও আসিল। বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইল, শান্তি ফিরিয়া আসিল।

হরিহর রায় ওয়ারেঙ্গেল দেশের মন্ত্রী ছিলেন। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজ্যের পতন ঘটিলে তিনি কাম্পিলি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিধর্মী এই রাজ্যও গ্রাস করিল। তখন তিনি যে শুধু নূতন আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা নয়, সপরিবারে বন্দী হইয়া দিল্লী সম্রাটের দরবারে নীত হইলেন। সম্রাট চতুর কূটনীতিবিদ্, রাজকার্য চালাইবার কৌশল তাঁহার ভালভাবে জানা আছে। রাজ্যলিপ্সাও প্রবল, পররাজ্য গ্রাসে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই। হিন্দুর দ্বারা হিন্দুর রাজ্যগ্রাস করিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া নিজ গৌরব বাড়াইতে সব সময়েই প্রস্তুত। বন্দীকে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন হরিহর রায় বুদ্ধিমান। কার্যসিদ্ধি করিতে হইলে এই রকম লোকেরই প্রয়োজন। হরিহর রায়ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তিনি আপাতত হীনতা স্বীকার করিয়া সপরিবারে মুক্তিলাভ করিলেন। দেশে ফিরিয়া হয়সালের রাজার সাহায্যে স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। তাঁহারাও তাহাই হইল। হৃতসর্বস্ব হইয়া স্বীয়ভাই বুক্কা রায়ের সহিত পলায়ন করিয়া উপরি উক্ত হাম্পি গ্রামস্থ ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এখানেই বিদ্যারণ্য স্বামীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই গ্রামেরই নিঃসম্বল দরিদ্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মাধব শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রপাঠ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, অদ্বৈততত্ত্ব মীমাংসা এবং কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। দেশের দুরবস্থা, ধর্মের অবনতি, সংস্কৃতির ধ্বংস, শ্রীরঙ্গম্ মাদুরা এবং অন্যান্য স্থানে বিধর্মী কর্তৃক দেবদেবীর মন্দিরাদির ব্যাপক ধ্বংসের সংবাদ তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। পরাধীনতাই যে এরূপ দুর্দশার প্রধান কারণ এবং একমাত্র স্বাধীনতা দ্বারাই ইহার প্রতিকার সম্ভব ইহা বুঝিতে সন্ন্যাসীর দেরী হইল না। তিনি অকপটে স্বীয় গুরুর নিকট মানসিক অবস্থা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি নিয়া দেশের অবস্থা জানিবার জন্য ভ্রমণে গেলেন। স্বীয়-গ্রামে ফিরিবার পথে উক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে নিঃসম্বল দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হিসাবে যখন আসিয়াছিলেন তখন দেবী বিমুখ ছিলেন। এবার সন্ন্যাসী হিসাবে আসায় দেবী প্রসন্ন হইয়াছেন মনে হইল। তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁহার ইচ্ছা কখন কাহার ভিতর দিয়া কিভাবে পূর্ণ

হইবে তাহা মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহার মধ্যে ভবিষ্যতের বহু সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল এবং বহুকালের সঞ্চিত নৈরাশ্য বিদূরিত হইয়া আশার আলো উদ্দীপ্ত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই মন্দিরেই হরিহর রায় ও তাঁহার ভাই বুক্কা রায়ের সঙ্গে বিদ্যারণ্য স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। এই সাক্ষাতের পর বিদ্যারণ্য স্বামী ও হরিহর রায়ের জীবনের গতি পরিবর্তন হয়।

মন্দিরে আসিবার পূর্বে হরিহর রায় নিজের ঘোড়া এবং শিকারী কুকুর পাহাড়ের নীচে একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যান। তাহারই নিকটে কতকগুলি খরগোশ ছিল। খরগোশ স্বভাবত নিরীহ এবং ভীতু, কিছু দেখিলে প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়, বিরাট শরীরধারী ঘোড়া এবং চিরশত্রু কুকুর দেখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু এখানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অথচ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। পলায়নের পরিবর্তে তাহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভীরুতা ভয়ানক হিংস্রভাব ধারণ করিল। ঐ হিংস্রতার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোড়া ও কুকুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। বিদ্যারণ্য স্বামী এই অলৌকিক ঘটনায় বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু ইহার তাৎপর্য বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দেবীর ইচ্ছাতেই যে ইহা হইয়াছে এই বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, এবং ঐ খরগোশ রক্ষিত স্থানের যে একটা বিশেষত্ব আছে সেই সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দৃঢ় হইল। বিদ্যারণ্য স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হরিহর রায় ঐ স্থানেই দুর্গ এবং নগর নির্মাণের আয়োজন করিলেন। ঐ স্থান খনন করিয়া প্রচুর গুপ্তধন এবং সোনা রূপা পাওয়া গেল। তাহা দ্বারা দুর্গ ও নগর নির্মাণ অনায়াসে সম্পন্ন হইল। এই ভাবে ভবিষ্যতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হইবার আশা উজ্জ্বল হইল। দৈবের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তি উভয়ের সম্মিলনে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। একা ব্রাহ্মণের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, একা ক্ষত্রিয়ের দ্বারাও নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মতেজ রামচন্দ্রের ক্ষাত্রশক্তির সহিত মিলিত হইলেই তাড়কা এবং অন্যান্য রাক্ষস নিধন সম্ভব হইয়াছিল। দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষাদানই অর্জুনকে অপরাজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। দধীচির হাড়ে নির্মিত বজ্রেই বৃত্রাসুর বধ সম্ভব হইয়াছিল।

দুর্গ এবং নগর নির্মাণ কার্য শেষ হইলে বিদ্যারণ্য স্বামীর পরামর্শেই হরিহর রায় রাজ্য পত্তন ও অভিষেকের পূর্বে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের নিকট দীক্ষা

গ্রহণ করিলেন। বিধর্মী দিল্লী সম্রাটের অধীনে কার্য করিবার সময়ে তাঁহার আদেশে স্বদেশ এবং স্বজাতির স্বার্থহানি করিতেছিলেন বলিয়া তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে হৃতশ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইলেন। সেইজন্য গুরুর স্মৃতিরক্ষার্থে নূতন নগরের নাম রাখিলেন বিদ্যানগর, পরে ইহাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রধান নগররূপে পরিণত হইল। রাজ্যচালনা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য স্বামীই মন্ত্রণা দিতেন। তাঁহার প্রেরণা ও মন্ত্রণায় হরিহর রায় বুক্কা রায়ের সেনাপতিত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। শত্রুদের সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিশাল কর্ণাটক দেশের ছোট ছোট রাজাদের লইয়া শক্তিশালী জোট গঠন করিলেন, ফলে শত্রুরা যথেচ্ছ অত্যাচার করিবার সাহস পাইল না। সন্ন্যাসী সংগঠন শক্তির প্রভাবে পরবর্তী তিন শত বৎসর পর্যন্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই বিশাল রাজ্যের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বিধর্মীর অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা, পর্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত বন্ধ হইল। বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রেরণায় হরিহর রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে তিনি রাজ্যের অধীশ্বর নন; প্রকৃত অধীশ্বর বিরূপাক্ষ শিব এবং তিনি প্রভুর দাস হিসাবে তাঁহার রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন মাত্র। উপযুক্ত গুরু এবং মন্ত্রীর মন্ত্রণাবলেই রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইল এবং ইহার কর্তৃত্ব ক্রমশঃ ওয়ারেঙ্গেলে, দেওগিরি, হয়সাল প্রভৃতি রাজ্যের বাহিরেও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। হরিহর রায়ের পরেও যখনই রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিত গুরুর প্রেরণা ও আদেশে বুক্কা রায় অবিলম্বে তাহা কঠোর হস্তে দমন করিতেন। ফলে তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন এক সময় মাদুরার সুলতান ব্যাপকভাবে দেশের চারিদিকে যথেচ্ছ অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহদাহ এবং হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিতে লাগিলেন। খবর শৃঙ্গেরীতে পৌঁছিবামাত্র বিগলিত-হৃদয় সন্ন্যাসী স্থির থাকিতে না পারিয়া ইহার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বুক্কা রায় তামিল দেশের তদানীন্তন শাসনকর্তা বীর কুমার কম্পনকে হৃতগৌরব উদ্ধার করিবার আদেশ দিলেন। কম্পন মূর্তিভঙ্গকারী বিধর্মীদের তাড়াইয়া দেশকে উদ্ধার করিলেন। কম্পনের বিদুষী-পত্নী গঙ্গাদেবী এই বিজয়কাহিনীর বর্ণনা অতি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিজয়নগরের সমৃদ্ধি বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ লেখক রবার্ট স্কট্ তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক ফরগট্‌ন্ এম্পায়ার চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিকরস্ অব ইণ্ডিয়ায় বলিয়াছেন 'সেই সময় বিজয়নগর

রাজ্যের বিস্তৃতি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের চেয়েও অধিক ছিল। সৈন্যবল, অর্থনীতি, সংগঠন শক্তি, রাষ্ট্রপরিচালনাদি বিষয়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় এই রাজ্য শুধু যে প্রবল ছিল তাহা নহে। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার মহত্ত্ব সহজে বুঝা যাইত এবং সর্ববিষয়ে এই ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল একমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য স্বামীর স্বাধীন চিন্তা, স্বধর্মনিষ্ঠা এবং স্বজাতিপ্রীতিতে। তাম্রশাসন, শিল্প, ভাস্কর্য, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্যটক বারবোসা এই সুন্দর ভূমির আন্তরিক বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'এই রাজ্যে খৃষ্টান্, ইহুদি, মুসলমান এবং হিন্দু সকলেই সমান ব্যবহার পাইতেন এবং সকলেই সুখে বাস করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় বিজয়নগর এবং ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ উদার এবং দ্বেষমুক্ত ছিলেন।' শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং পুসলকর লিখিত 'হিস্ট্রি এণ্ড কাল্চার অব ইণ্ডিয়ান পিপল' এবং কে, এ, এন, শাস্ত্রী লিখিত 'দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে' বিজয়নগর সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

যে মহাপুরুষের কৃপায় বিজয়নগর রাজ্য সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি একাধারে কর্মবীর, ধার্মিক, দেশপ্রেমিক, মহাযোগী, ত্যাগী, জ্ঞানী, ভক্ত, বিদ্বান্ এবং সন্ন্যাসী। সংসারে উদাসীন হইয়াও দেশ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দশ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং বিশ বৎসর রাজ্যের প্রধান প্রধান বিষয়ের পরিচালনা ব্যাপারে শৃঙ্গেরী হইতে পরামর্শ দান করিয়া ইহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। রাজ্য নিরাপদ হইলে তিনি ধর্মাচরণ, শাস্ত্রালোচনা, প্রচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতির জন্য সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এই মহৎ কর্ম সম্ভব হইয়াছিল। তিনি শক্তিমান্, প্রতিভাশালী দেশমাতৃকার কৃতি সন্তান। সমন্বয় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি সকল ধর্মের ধারক ও বাহকদের শ্রদ্ধা করিতেন। সব রকম দার্শনিক বিদ্বৎমণ্ডলীদের আমন্ত্রণ জানাইয়া স্ব স্ব মতের গবেষণা কার্যের জন্য তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারা সকলে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বিদ্যারণ্য স্বামীর পূর্বাশ্রমের সহোদর সায়নাচার্য সেই যুগে বিদ্বৎমণ্ডলীতে রাজচক্রবর্তী রূপে সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং নারায়ণ বাজপেয়ী, সোমযাজী, পোন্নেরী দীক্ষিত এবং অন্যান্য বহু বিদ্বান্ ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রাজ্যে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন

যাহার ফলে ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইল এবং তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অধিকাংশ সময় শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত মঠের ধারাবাহিক মঠাধীশ তালিকায় দেখা যায় বিদ্যাশঙ্কর তীর্থ এবং ভারতী তীর্থের পর বিদ্যারণ্য স্বামী ষড়বিংশ মঠাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা যে কতদিকে কত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সীমা নেই। তিনি একাধারে রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা, মন্ত্রণাদাতা চালক, সূক্ষ্মদর্শী, দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, ব্যাকরণবিদ্, লেখক, সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নেতা, সুতরাং তাঁহার যশ যে চারিদিকে বিস্তার লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যক্তিত্ব সচরাচর দেখা যায় না। অসাধারণ ক্ষমতা, দৃঢ় কার্যপদ্ধতি, কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি, রাজনৈতিক দক্ষতা, উৎকৃষ্টতর সংগঠন-নৈপুণ্য, জনসাধারণকে প্রীতি ভালবাসা দ্বারা মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, শান্তভাব, উদারতা এবং স্বভাবের মাধুর্য যুক্ত হইয়া তাঁহাকে এই সাফল্য দিয়াছিল। তাঁহার ভাই সায়নাচার্যকে দিয়া তিনি বেদার্থ প্রকাশ নামে চারিবেদের ভাষ্য রচনা করাইলেন এবং নিজেও বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন। তার মধ্যে ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্যক বার্তিকসার, পরাশর মাধব নামক পরাশর স্মৃতির টীকা, জৈমিনীর ন্যায়মালাবিস্তার নামক পূর্বমীমাংসার টীকা, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, অনুভূতি প্রকাশ নামক ছন্দোময় প্রকরণ গ্রন্থ, শঙ্করাচার্য প্রণোদিত অপরোক্ষানুভূতির টীকা, জীবন মুক্তি বিবেক নামক সন্ন্যাসীর কর্ম ও আচরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, পঞ্চদশী নামক বেদান্তের প্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ, কালমাধব নামক স্মৃতির সংগ্রহ, ধাতুবৃত্তি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আরও অনেক আছে। বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থের তালিকায় তাঁহার পঞ্চাদশী শ্রেষ্ঠস্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের তত্ত্ববিবেক অধিকরণে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশশীল, নিত্য, চেতন, আনন্দময়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগতভেদ রহিত। তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই, আত্মজ্ঞানেই মুক্তি।

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে শৃঙ্গেরী মঠে বেদান্ত চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে একদিন বিজয়নগরের রাজা রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে তিনি যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের একটি মনোরম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'কোটি কোটি রাজা মৃত্যুর কবলে

নিষ্পেষিত হইয়াছেন, কোটি কোটি ব্রহ্মা সৃষ্টিসহ বিলুপ্ত হইয়াছেন। মৃত্যুর কবল হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই সব বিচার করিয়া জীবনে আসক্তি পোষণ করিয়া লাভ কি ?'

ক্রমশঃ তাঁহার শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'বিজয়নগর অধিবাসীর প্রতি আপনার কোন বক্তব্য আছে কিনা বলুন,' তখন তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন—'বিশ্বে এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে আমি নাই, সমস্ত বিশ্বে আমি বর্তমান এবং আমাতে সমস্ত বিশ্ব নিহিত, আমিই যখন সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি তখন কাহারও নিকট কিছু চাহিবার কিংবা কাহাকেও কিছু দিবার নাই। আমার আত্মচেতনা বিশ্বব্যাপ্ত। আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।'

ইহার পর বিদ্যারণ্য স্বামী মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। দীপ নিভিয়া গেল। জীবন অতিজীবনে পূর্ণতা লাভ করিল।

।। নয় ।।

গম্ভীরনাথ

বিবেকের ডাক কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। উহার প্রতিধ্বনি হৃদয় বীণায় বাজিয়া উঠিলে জীবনে নূতন রকমের অনুভূতি হয়। সংসার বিস্বাদ ঠেকে, সাংসারিক সুখ, বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা সবই বিরক্তিকর লাগে। তাঁহাদের মোহে আবদ্ধ হইতে চায় না। সংসারে উদাসীনতা, দেহে অনাসক্তি সেই ডাকের পূর্বাভাস। প্রত্যেকের জীবনে সেই ডাক আসে কিন্তু সময় না আসিলে সেই ডাক পরিষ্কার শুনা যায় না। কখন কখন শুনা গেলেও উহার অন্তর্নিহিত শক্তি হৃদয়ে সাড়া দেয় না। সময় আসিলে উহা শুনা যায় এবং পরিষ্কার রূপেই শুনা যায়। তখন প্রতিরোধ করিবার শক্তি লোপ পায়। ঐ ডাকে মুক্তিকামী বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা সব ছাড়িয়া অনুভূতির সন্ধানে ছুটে, প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষ গম্ভীরনাথকে ঐ ডাক ঘরছাড়া করিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তরে দৈর্ঘ্যে ১৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ২৫০ মাইল বিশাল হিমালয় পর্বত এই বিশাল দেশকে ঘিরিয়া আছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর হিমালয়েরই একটা অংশ।

সুসভ্য আর্য জাতির বাস। এক কালে ব্রাহ্মণ প্রধান ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শতকরা তিন জন মাত্র হিন্দুর মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। এক সময়ে আর্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র সারদা কাশ্মীরের অন্তর্গত ছিল। এখন নাই। কাশ্মীরীদের বর্ণ অতি সুন্দর, লম্বা, ললাট প্রশস্ত, নাক সুচাল। চেহারা সুন্দর। মেয়েদের দেবী বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরীদের নিজস্ব ভাষা আছে, এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। উর্দু ই প্রচলিত ভাষা, গম্ভীরনাথ কাশ্মীরের এক নগণ্য গ্রামে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবিবরণ, সন তারিখ, পিতৃ মাতৃ পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। তবে তাঁহার মধ্যে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ যে ছোট বেলাতেই ছিল তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গ্রামে তাঁহার জন্ম তাহার তেমন বিশেষত্ব ছিল না। উচ্চ শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না। তাহা হইলেও গম্ভীরনাথ বংশগত আভিজাত্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দরিদ্র ও দুঃখীর প্রতি তাঁহার স্বভাবগত সহানুভূতি, বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, সরল অমায়িক ব্যবহার, চরিত্রের মাধুর্য সাধারণত গ্রামবাসীকে আকর্ষণ করিত। বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী সকলেই প্রিয় দর্শন বালককে ভালবাসিত এবং সমীহ করিয়া চলিত। ছোট বেলা হইতেই তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল। শ্মশান কিংবা নির্জন স্থানে আপন মনে দিন কাটাইতেন। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। সাধুসন্ত দেখিলে সেবা করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন এবং প্রাণপণে সেবা করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ কিংবা ভগবৎ মহিমা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বিষয়ের দিকে ঝোঁক কমিল এবং ধর্ম বিষয়ে ঝোঁক বাড়িল। এইজন্য তাঁহাকে আত্মীয়দের নিকট তীব্র তিরস্কার শুনিতে হইত। সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক পিপাসা বাড়াইল। প্রবল শুভ সংস্কার মুক্তির পথে টানিল। জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ এবং তাহাতেই শান্তি—অন্য কিছুতেই নাই, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন।

গন্তব্য স্থির হইলেও পাথেয় এবং পথের নির্দেশ দরকার, পাথেয় সদ্‌গুরুর কৃপা এবং পথ তাঁহার নির্দিষ্ট। যোগদীক্ষা, গুরুকরণ না হইলে পথ চলা দুষ্কর। শারীরিক, মানসিক দুর্বলতা, লোভাদি সবই পথের কণ্টক। একমাত্র সদ্‌গুরুই এই কণ্টক দূর করিতে পারেন। ভগবদ্ কৃপা হইলেই সদ্‌গুরু জুটে। একদিন জনৈক বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সাধু নিজে দীক্ষা দিলেন না তবে সৎ পরামর্শ দিলেন। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর নামক স্থানে নাথ পন্থীদের বিখ্যাত মঠ আছে। তাঁহারা যোগী, বিখ্যাত

যোগী গোরক্ষনাথ হইতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, গোপালনাথ উক্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। তিনি উঁচুদরের যোগী। আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। বহু মুক্তিকামী তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় নিলে পথের নির্দেশ মিলিবে সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ সাধুর পরামর্শে গম্ভীরনাথ বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা, গ্রামের মনোরম পরিবেশ, সবরকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া বহু কষ্টে গোরক্ষপুর আশ্রমে পৌছিলেন। ভাগ্যক্রমে অধ্যক্ষ গোপালনাথের কৃপাও লাভ করিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই শিষ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখিয়া গুরু প্রীত হইলেন। এবং কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট অন্তরস্থ আধ্যাত্মিকতার উৎসমুখ খুলিয়া দিলেন। সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী মুণ্ডন, কাষায়াদি ধারণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করিয়া গম্ভীরনাথ রীতিমত দীক্ষিত হইলেন। নূতনভাবে নামকরণ না করিয়া গুরু পূর্ব নামই রাখিলেন।

সন্ন্যাসী পূর্বজীবন ভুলিবার চেষ্টা করে, গম্ভীরনাথ সেজন্য ঐ প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলেন। তাঁহার পূর্বজীবনের ঘটনা বিশেষ জানা যায় না। গুরুকরণের পর তাঁহার উপর অনেক নূতন দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। বিগ্রহ সেবা, গুরু সেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার, গরু-মহিষের তত্ত্বাবধান সবই তাঁহাকে করিতে হইত। এইসব নবাগত সাধুদের নিত্যকর্ম। আশ্রমের হিসাবপত্র রাখার দায়িত্বও জুটিল। নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও গম্ভীরনাথ কর্ম ও উপাসনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতেন। সেবা ও ধ্যান দুইই প্রয়োজন। কোনটাই অবহেলার বিষয় নয়। অতিশয় ব্যস্ততার মধ্যেও ধ্যানাভ্যাসে কখনও বিরত থাকিতেন না। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে ভগবৎ সান্নিধ্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার মনে হইত আশ্রমের জনাকীর্ণ আবহাওয়া যোগাভ্যাসের পক্ষে অনুকূল নয়। আত্ম-সমীক্ষার জন্য নির্জন স্থানে ধ্যানাভ্যাস করিলে জীবনের উদ্দেশ্য হয়ত সফল হইবে।

বারাণসী পুণ্য তীর্থ। জ্ঞান বৈরাগ্যদাতা ৺বিশ্বনাথ এবং মাতা অন্নপূর্ণার প্রিয় স্থান। মা গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে প্রবাহিত হইয়া স্থানের মাহাত্ম্য আরও বাড়াইয়াছেন। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হইয়া এই তীর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মুক্তিধামে তপস্যা করিলে শীঘ্রই ফল লাভ হইবে এই বিশ্বাসে গম্ভীরনাথ গুরুর অনুমতি নিয়া রওনা হইলেন। পথ চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত এবং পথশ্রান্ত হইয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িয়াছেন এমন সময়ে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ পাইয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়াইলেন।

বারাণসীতে পাঠ, জপ, ধ্যানাদিতে তিন বৎসর কাটাইলেন। ইতিমধ্যে উঁচুদরের যোগী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িলে দর্শনার্থীর ভিড় জমিতে লাগিল, ভিড় এড়াইবার জন্য তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া ঝুসি হইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন এবং আরও তিন বৎসর তপস্যায় মগ্ন রহিলেন। এই সময়ে মুকুটনাথ নামক কোন যুবক সাধু দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করেন। এই স্থান হইতে নর্মদা গিয়া কিছু কাল তপস্যায় কাটান। গম্ভীরনাথ ভ্রমণ করিতে করিতে পথে জনৈক সাধুর কুটীয়ায় থাকিয়া কিছুদিন ধ্যানে কাটাইলেন। সাধু তখন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কুটীয়ার ধ্যানে বসিলে গম্ভীরনাথ দেখিতেন একটা সাপ তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। উপর্যুপরি তিন দিন এরূপ ঘটিল। কুটীয়ার মালিক ফিরিয়া আসিলে গম্ভীরনাথ তাঁহাকে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা জানাইলেন। শুনিয়া সাধু বলিলেন, 'আপনি ভাগ্যবান, কোন মহাপুরুষ সাপের বেশে আপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে আপনার কল্যাণই হইবে।'

নর্মদা হইতে আরও কয়েকটি তীর্থ শেষ করিয়া গম্ভীরনাথ গোরক্ষপুর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পর গুরু গোপালনাথ এবং আশ্রমবাসীরা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ভিড় এড়াইয়া আবার নির্জন বাসের জন্য রওনা হইয়া তপস্যার উপযুক্ত স্থান পরম রমণীয় ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের পাদদেশে কপিলধারায় আসিলেন। এই স্থান পুণ্যতীর্থ গয়াধামের নিকটে। এখানেই সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করিয়া ভগবান বুদ্ধরূপে বিশ্ববিখ্যাত হন। নদীয়াচাঁদ নিমাই সদ্‌গুরু লাভ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হন। গম্ভীরনাথ অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করেন। যোগদণ্ড, কমণ্ডলু এবং শীত নিবারণের একখানা কম্বল মাত্র সম্বল। ভগবান শরণাপন্নের যোগক্ষেম বহন করেন। অক্রুর কুর্মী নামক জনৈক গরীব কাঠুরিয়াকে তাঁহাকে সেবা করিবার জন্যই বোধ হয় ভক্ত হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। অক্রুর কুর্মী গয়ার বাহিরে থাকিত, জঙ্গলের কাঠ কুড়াইয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে সংসার প্রতিপালন করিত। গম্ভীরনাথকে ধুনীর কাঠ এবং জীবনধারণের ফলমূল জোগাইত। ধীরে ধীরে অক্রুরের ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও গম্ভীরনাথের ভক্ত হইল। ঐ দরিদ্র পরিবারের প্রতি গম্ভীরনাথেরও প্রচুর সহানুভূতি ছিল। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এই সময়ে নৃপতিনাথ এবং সিদ্ধনাথ নামে দুইজন মুক্তিকামী সাধক সদ্‌গুরুর

অনুসন্ধানে আসিয়া কপিলধারার নিকটে কোন মন্দিরে থাকিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেছিলেন। গম্ভীরনাথের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ নৃপতিনাথের তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা জন্মিল। তাঁহাকে গুরুর মত সেবা করিতেন। কুটীয়ার প্রবেশ পথে বন্য জানোয়ার তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ত্রিশূল হস্তে পাহারা দিতেন, সর্বপ্রকার বিঘ্ন দূর করিয়া তপস্যার সাহায্য করিতেন। দর্শনার্থীর ভিড় জমিতে দিতেন না। তা সত্ত্বেও উচুদরের যোগী বলিয়া গম্ভীরনাথের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল এবং ভিড়ও হইতে লাগিল।

এই সময়ে মাধোলাল পাণ্ডা নামক জনৈক ক্ষমতাশালী ধনী এক মোকদ্দমায় পড়িয়া খুব বিপদে পড়েন। হারিয়া গেলে ভিখারী হইয়া রাস্তায় বসিতে হইবে। সব রকম তদ্বির করিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন রায় তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইবে না, তখন অনন্যোপায় হইয়া গম্ভীরনাথের শরণাপন্ন হইলেন। অলৌকিক উপায়ে চাকা ঘুরিয়া গেল। যোগীর কৃপায় মাধোলাল বিপদ-মুক্ত হইলেন। মোকদ্দমার রায় তাঁহরে স্বপক্ষে গেল। এই ঘটনার পর মাধোলাল গম্ভীরনাথের বিশেষ ভক্ত হইলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার জন্য একটা গুহা নির্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে সুখাসনে বসিয়া ধ্যান করিবার জন্য সুন্দর বেদী করাইয়া দিলেন। গম্ভীরনাথ উক্ত গুহায় দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছেন। সুমধুর স্বরে ভজন গান করিতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, কিছুকাল মৌনী থাকিয়াও তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন।

তপস্যার ফল ফলিল। বাড়ীঘর, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিবার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি পাইলেন। জ্ঞানলাভের পর যোগীর শত্রু-মিত্র সমান হইয়া যায়, বনের পশু পক্ষী জানোয়ার মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কোন অনিষ্ট সাধন করে না, বার বার পাহাড়ের নাথযোগীরা, নানক সম্প্রদায়ের ঠাকুরদাস বাবা, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ রামদাস কাটিয়াবাবা, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকেরা তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন।

গীতায় যে সমদর্শনের কথা বলা হইয়াছে ব্রহ্মজ্ঞানী গম্ভীরনাথের জীবনে তাহার আভাস পাওয়া যায়।······

তাঁহার চোখে বিশিষ্ট লোক যেমন সম্মানের পাত্র সামান্য কাঠুরিয়া অক্রুর কুর্মীও সেইরূপ সম্মানের পাত্র। একবার উক্ত অক্রুর কুর্মীর খুবই অসুখ হয়। চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না। জীবনের কোন আশা ছিল না। তবু আত্মীয়েরা

তাহার জরাজীর্ণ দেহটাকে বহন করিয়া গম্ভীরনাথের সামনে উপস্থিত করিলেন। তিনি তাহাকে স্পর্শ করিলেন এবং পরে তাহার গায়ে কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর মুমূর্ষু রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। অক্রুর কুর্মী আরও বহুকাল বাঁচিয়া ছিল।

ভালবাসায় শত্রু মিত্র হয়, পশু মিত্রভাবাপন্ন হয়। কখন কখন একটা বাঘ জঙ্গল হইতে আসিয়া যোগী গম্ভীরনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত। একদিন দর্শনার্থীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন এমন সময় বাঘটাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন। তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া গম্ভীরনাথ বলিলেন, 'ভয়ের কোন কারণ নাই, শান্তভাবে অবস্থান করিলে কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না।' বাঘটি পোষা জানোয়ারের মত একবার যোগীর দিকে এবং পরে দর্শনার্থীদের প্রতি তাকাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গোরক্ষপুর আশ্রমে থাকিবার কালেও তিনি জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র মানুষ শান্তভাব ধারণ করিত। গয়ার নিকটে সুনীলাল ধারিয়াল নামে এক বদ্ধ পাগল ছিল। লাঠির আঘাত দিয়া কিংবা ইট-পাটকেল ছুঁড়িয়া কপিলধারার সাধুদের প্রতি অত্যাচার করিতে সে খুব আনন্দ পাইত। একদিন তাহার পাগলামি চরমে উঠিলে গম্ভীরনাথ তাহার গালে ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন। ইহার পর সুনীলালের ব্যবহার স্বাভাবিক লোকের মত হইল। পাগলামি সারিয়া গেল এবং ব্যবসা করিয়া খুব সাংসারিক উন্নতিলাভ করিল।

পাগলামি ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নয়। দলগত পাগলামিও দেখা যায়। একবার এলাহাবাদে কুম্ভমেলার সময় বৈরাগী নাগারা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া নাথ যোগী এবং সন্ন্যাসীদের আখড়ায় অতর্কিতে আক্রমণ করিল। গম্ভীরনাথ উত্তেজিত নাগা জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শান্তভাবে বলিলেন, 'শান্তি'। একটিমাত্র কথায় বৈরাগী নাগারা শান্ত হইয়া ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করিল। রক্তারক্তির সম্ভাবনা দূর হইল। গম্ভীরনাথকে সেবা করিয়া কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভক্তের মনে অহঙ্কার আসিল। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিবেন না এ ধারণার বশবর্তী হইয়া শুধু কৌতুহলবশতঃ তিনি গম্ভীরাথকে যোগবিভূতি দেখাইবার জন্য বার বার জিদ করিলেন। মনস্তত্ত্ববিৎ গম্ভীরনাথ উক্ত বিশিষ্ট ভক্তের অহঙ্কার রূপ মানসিক রোগটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে গুরু গোরক্ষনাথের পূর্বজীবনের একটা ঘটনা উদ্ধৃত করিলেন। কোন বিশিষ্ট ভক্ত গোরক্ষনাথকে ঐরূপ অনুরোধ করিলে তিনি

উক্ত ভক্তের দেওয়া দুধ এবং অন্যান্য খাদ্য বমন করিয়া দিলেন। ভয়ে উক্ত ভক্ত গোরক্ষনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই ঘটনা শুনিয়া বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভক্তটি অলৌকিক শক্তি দেখাইবার জন্য আর জিদ করিলেন না। ক্রমে কপিলধারা গুহার সামনে ভিড় জমিতে থাকে। উক্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভক্ত মাধোলাল তাঁহার জন্য একখানা সুন্দর বাগান ক্রয় করিলেন। গম্ভীরনাথ এই বাগানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

একবার কয়েকজন সাধুকে নিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি উদয়পুর রাজ্যে পৌছিলেন। ধুনী জ্বালিয়া খোলা জায়গায় সারারাত্রি পড়িয়া থাকিতেন। তখন বর্ষাকাল। একদিন প্রবল বর্ষায় সব স্থান জলময় হইয়া গেল, কিন্তু যেস্থানে দলবল নিয়া গম্ভীরনাথ থাকিতেন সেখানে একটুও বৃষ্টি হয় নাই। তাঁহার যোগশক্তির জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল। কথা উদয়পুরের মহারাজের কানে উঠিলে তিনি গম্ভীরনাথকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিলেন। গম্ভীরনাথ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেও মহারাজ ছাড়িবার পাত্র নন। নিজে আসিয়া যোগীকে দর্শন করিবেন স্থির করিলেন। মুক্তিকামী সর্বদা আত্মপ্রচারে বিরত থাকেন। গম্ভীরনাথ চুপি চুপি সদলে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সারদাকান্ত ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকেরা তাঁহাকে যোগী হিসাবে খুব সম্মান দেখাইতেন। বিখ্যাত সাধু গোকুলনাথ তাঁহাকে উঁচুদরের রাজযোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যোগীদের কার্যকলাপ অদ্ভুত, তাঁহারা মান-যশ উপেক্ষা করেন, দীন-দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখান, এমন কি পাপীর জন্য হৃদয়কবাট মুক্ত রাখেন। গয়ায় বাস করিবার সময় কয়েকজন গুণ্ডা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমে প্রবেশ করিলে গম্ভীরনাথ তাহাদের বাধা না দিয়া যাহা প্রয়োজন লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন এবং কম্বলটিও দিতে চাহিলেন, তাহারা যাইবার সময় কম্বল না নিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর তাহাদের জীবনে পরিবর্তন আসিল, চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল।

গোরক্ষপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ গোপালনাথের শরীর রক্ষার পর প্রথমে দিবরনাথ পরে সুন্দরনাথ অধ্যক্ষ হইলেন। সেই সময়ে আশ্রমের কাজকর্মে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সাধু ভক্তের বিশেষ অনুরোধে আশ্রমকে বিপদ-মুক্ত করিবার জন্য গম্ভীরনাথ সুন্দরনাথই অধ্যক্ষ থাকিবেন এই একটিমাত্র শর্তে মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসীম ধৈর্য; নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শান্ত এবং নির্লিপ্ত থাকিতেন।

তাঁহার জীবনী-লেখক অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁহার (গম্ভীরনাথের) শান্ত ভাব সকলকে আকৃষ্ট করিত। তিনি খুবই সাদাসিধা ছিলেন। দু'একখানা মাত্র কাপড় রাখিতেন, যাহা না হইলে চলে না। সদা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। সকলের জন্য যাহা রান্না হইত তাহাই তিনি খাইতেন। সাধু, গৃহস্থ, অতিথি সকলকে সমাদর করিতেন'। কখন কখন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহার যোগবিভূতি প্রকাশ পাইত। একদিন আশ্রমে বহু সাধু খাওয়ার সময় উপস্থিত হইলেন। যত সংখ্যক লোকের জন্য রান্না হইয়াছিল তাহার তিন গুণ অতিথি হইল। হঠাৎ এই প্রকার বিপর্যয়ের কথা তাঁহাকে জানানো হইলে তিনি সেবককে খাদ্যদ্রব্যের উপর একখানা নূতন কাপড় ঢাকিয়া দিতে বলিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে কোন অসুবিধা হইবে না। সব ঠিক হইয়া যাইবে, খাদ্য কম পড়িবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার কথা ফলিয়া গেল। আর এক দিন আমের সময়ে হঠাৎ বহু সংখ্যক সাধু খাওয়ার সময় উপস্থিত হইলেও তিনি আমের ঝুড়ির উপর একখানা নূতন কাপড় বিছাইয়া দিতে বলিলেন। সেবারও বিপদ কাটিয়া গেল। আশ্রমের মঙ্গল কামনা শুধু তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত হইতেন তাঁহাদের মঙ্গল কামনাও তিনি করিতেন। একবার কোন বিশিষ্ট মহিলার একমাত্র পুত্র লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়িতে গিয়া বহুদিন তাঁহার মার নিকট খবর দেন নাই। উদ্বিগ্না মাতার দুশ্চিন্তায় ব্যথিত হইয়া গম্ভীরনাথ ধ্যানের ঘর হইতে ঘণ্টাখানেক পরে বাহির হইয়া মাতাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁহার পুত্র ভালই আছে। এখন বাড়ী ফিরিবার পথে। পরের সোমবার গোরক্ষপুরে পৌছিবে। পুত্র নির্দিষ্ট দিনে গোরক্ষপুরে গম্ভীরনাথকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন কারণ যে সময় গম্ভীরনাথ ধ্যানঘরে ধ্যানে ছিলেন সেই সময় তিনি তাঁহাকে ষ্টীমারে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার পক্ষে এই সময় গোরক্ষপুরে আসা কি করিয়া সম্ভব বুঝিতে পারিলেন না।

মঠের কর্মচারীদের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। সর্বদা তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেন। কেহ কখন ভুল করিলে তাহা সংশোধন করিয়া তাহাকে অন্য বিভাগে বদলি করিতেন, কখন কখন বকিতেন, কিন্তু বরখাস্ত করিতেন না। কারণ দারিদ্র্য-মুক্তির জন্য সে আবার অন্যায় করিবে। দরিদ্র এবং আশ্রম জমিদারির প্রজারা সকলেই তাঁহার সমবেদনার পাত্র ছিল। কেহ কোন জিনিস চাহিলে তিনি কখনও 'না' বলিতে পারিতেন না, পশু পক্ষী কুকুর বিড়াল তাঁহার ভালবাসা বুঝিতে পারিত। গরম জলে গুটী পোকা মারিয়া রেশমের কাপড় তৈয়ার হয় বলিয়া তিনি রেশমের বস্ত্র পরিধান করিতেন না।

১৯০৯ সাল হইতে তাঁহার জীবন নূতন খাতে বহিতে লাগিল। শিষ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। বেশীর ভাগই বাংলাদেশের লোক। কেহ কেহ তাঁহার নিকট স্বপ্নে দীক্ষা পান। ময়মনসিংহের এক বালক এবং কুমিল্লার কোন বিশিষ্ট ডাক্তার তাঁহার নিকট স্বপ্নে দীক্ষা পাইয়া পরে গোরক্ষপুরে স্বপ্নাদিষ্ট দীক্ষাদাতাকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। গোরক্ষপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রস্তিচন্দ্র সেন বাহিরের লোকদের চিকিৎসা করিতেন। নিজ পরিবারস্থ কোন লোকের অসুখ হইলে ঔষধ দিতেন না। গম্ভীরনাথের ধুনির ছাই রোগীরা শরীরে লেপন করিয়া সুফল পাইতেন। একবার যোগীর আশাবারি ধূপের ছাই মরণোন্মুখ পুত্রের শরীরে লেপন করিয়া তাহাকে বাঁচাইলেন। গম্ভীরনাথ যোগ-বিভূতি নিজের জন্য প্রয়োগ করেন নাই। একবার প্রতিবেশী মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িত হইলে কোন প্রকার যোগের সাহায্য না নিয়া উকীলের পরামর্শের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন। নিজে অসুস্থ হইলে উপযুক্ত ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিয়মমত ঔষধপত্র ব্যবহার করিতেন। কখন কখন অসুস্থ অবস্থায় ছেলেদের মত অধৈর্য হইয়া পড়িতেন। রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া শিষ্যসেবক কালীনাথ ব্রহ্মচারী একদিন গুরুকে যোগ-প্রয়োগ করিয়া রোগমুক্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি কী ভগবানের বিধান উল্‌টাইয়া দিব?' অবশ্য ডাক্তারের দীর্ঘ চিকিৎসায় তিনি সারিয়া উঠিলেন। ইহার পর চোখের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে আসিলেন। এখানে ছয় শতের উপর ভক্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

পরে কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে গেলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের উপর নাথ সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তুত নাথ দলিচায় তিনি থাকিতেন। কুম্ভ হইতে ফিরিয়া মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। যতই দিন ঘনাইয়া আসিল ততই তাঁহার মন অন্তর্মুখীন হইল। বাহিরের বিষয়ে উদাসীন হইলেন। পারের ডাকের আভাস পাইলেন। বৃদ্ধ বয়সেও একবার গোরক্ষপুরে যোগী চকের নিকটস্থ শিবমন্দিরে জীর্ণ শরীরে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিয়া কাটাইলেন। ইহার কিছুদিন পর পঞ্জিকা দেখিয়া দিন স্থির করিয়া একদিন আশ্রমবাসীদের ডাকিয়া বলিলেন যে ঐ নির্দিষ্ট দিনে তিনি অন্য জমি-দারিতে যাইবেন। তিনি যে আনন্দধামে যাইবেন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া সকলে তাঁহার জীর্ণ শরীরের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার যাওয়া বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, উত্তরে তিনি বলিলেন, 'ভাবনার কোন কারণ নাই। গন্তব্যস্থান খুবই মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্যহানির ভয় নাই। সেখানে সুখ-দুঃখ পৌঁছায় না।'

১৯২১ সালের ১৭ই মার্চ বারুণী ত্রয়োদশী তিথিতে পঞ্জিকানির্দিষ্ট দিনে তিনি যখন মহাসমাধিতে লীন হইলেন তখন ভক্তেরা 'অন্য জমিদারিতে যাইবেন' কথার অর্থ সম্যক বুঝিতে পারিলেন। মহাপুরুষের তিরোভাব-রহস্য বুঝা কঠিন।

॥ দশ ॥

পওহারী বাবা

প্রেমাপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। উত্তর প্রদেশের জোনপুর জিলার এই নগণ্য গ্রামটির কথা অনেকে জানেন না। কিন্তু এই গ্রামটি মহাপুরুষের জন্মে ধন্য হইয়াছে। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস। অযোধ্যাপ্রসাদ এই গ্রামেরই অধিবাসী। তিনি ধার্মিক, চরিত্রবান, প্রসিদ্ধ রামানুজ সম্প্রদায়ের বরগলাই বৈষ্ণব। এই প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষ পওহারী বাবা ১৮৪০ সালে ধার্মিক ব্রাহ্মণ অযোধ্যাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম হরভজন। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে অযোধ্যাপ্রসাদের এক বড় ভাই ছিলেন। গাজীপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে কুর্তা নামক স্থানে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তিনি প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যায় দিন কাটাইতেছিলেন। এইজন্য নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ শরীরে ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া প্রায় অন্ধের মত হইয়াছেন। তাঁহার অসুস্থতার খবর পাইয়া ছোট ভাই অযোধ্যাপ্রসাদ রক্তের টানে গুরুতুল্য বড় ভাই লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি জোনপুর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার দুরাবস্থা দেখিয়া প্রথম পুত্র গঙ্গাপ্রসাদকে সেবক হিসাবে পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ভগবৎ-নির্ভরশীল। শারীরিক আরামের জন্য সেবক হিসাবে কাহাকেও গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। বহু পীড়াপীড়ির পর গঙ্গাপ্রসাদের পরিবর্তে তাহার ছোট ভাই হরভজনকে সেবক হিসাবে কাছে রাখিতে স্বীকার পাইলেন। কারণ তিনি জানিতেন ঐ বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং তপস্যায় সিদ্ধ হইলে কালে সে মহাপুরুষ হইতে পারিবে সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই হরভজনই পরবর্তীকালে পওহারী বাবা রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী দশ বৎসরের বালক হরভজন কুর্তা আশ্রমে সেবকরূপে

আসিলেও ব্রহ্মচারীর মত সসম্মানে থাকিতেন। পরনে গেরুয়া, ব্রহ্মচারীর বেশ, মুণ্ডিত মস্তক, গলায় পবিত্র উপবীত, সুন্দর ফুটফুটে চেহারা দেখিলে দেবকুমার বলিয়া মনে হয়। তাঁহার চালচালন, মধুর ব্যবহার. ভগবৎ-পরায়ণতা, অকৃত্রিম ভক্তি, জ্ঞান, ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, সুন্দর চাহনি সমস্তই লুক্কায়িত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিচায়ক। পূর্বেই বলা হইয়াছে বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার ভিতরের দেবত্ব প্রকাশ পায়। বৈষ্ণব বংশের ধারা অনুযায়ী তাঁহাকে রামানুজ দর্শন এবং অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। হরভজনও মেধাবী। শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিতে তাঁহার কিছু অসুবিধা হইল না। দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী হইতে তাঁহার ভাবী-জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়। খুব ভোরে শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন, গঙ্গাস্নান, বিগ্রহ সেবা, ভোগ রান্না ও নিবেদন, জ্যেষ্ঠতাত লক্ষ্মীনারায়ণকে খাওয়ানো প্রভৃতি নানা কাজ শেষ করিয়া যেটুকু অবসর পাইতেন তাহারও সদ্ব্যবহার করিতেন। গাজীপুরের বিখ্যাত বাচন পণ্ডিত এবং অন্যান্য আচার্যের নিকট সংস্কৃত, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে অধ্যবসায় ও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া হরভজন বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে হরভজনের জীবনে কিছু বিপর্যয় ঘটিল। জ্যেষ্ঠতাত লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিল। আত্মীয়, পথপদর্শক, শিক্ষকের মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন। মনের শান্তি হারাইলেন। অশান্তির হাত হইতে মুক্তির আশায় আশ্রমের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। দ্বারকায় রণছোড়জী দর্শন করিয়া গিরনারে আসিলেন। এইখানে এক নির্জন গুহায় উন্নত এক প্রাচীন যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যোগী প্রায় সব সময়ই ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

হরভজন যোগশিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। যোগী কাহাকেও দীক্ষিত করেন না কিন্তু হরভজনকে দেখিয়া তাঁহার স্নেহ হইল। তিনি শরণার্থীকে যোগধর্মে দীক্ষিত করিলেন। কঠিন যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি ধৈর্যের সহিত কয়েক বৎসর অভ্যাস করার ফলে হরভজনের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল। তিনি যেন নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। ইহার পর আরও কয়েকটা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি গাজীপুর কুর্তা আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রমবাসী এবং এবং প্রতিবেশীরা তাঁহাকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মধ্যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

তাঁহাদের ধারণা হইল এই দেবমানব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগাইতে সমর্থ হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহার পর আশ্রমের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িল। বিগ্রহ সেবা, আশ্রম পরিচালনা, অতিথি-অভ্যাগতদের সৎকার করা সকলই তাঁহাকে দেখিতে হইত। শত শত লোক তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম আশ্রমে আসিত। তিনি তাঁহাদের আশার বাণী শুনাইতেন।

গিরনার পাহাড়ের যোগীর সংস্পর্শ এবং বারাণসীর প্রসিদ্ধ যোগী নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তাঁহার চিন্তাধারা খুব অন্তর্মুখীন হইল। ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসর্পণ, ভক্তি, জ্ঞান, তপস্যা, বংশগত বৈষ্ণব দীনতা, আধ্যাত্মিকতা, যোগশক্তি সমস্তই যেন তাঁহার মধ্যে দিবালোকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার সরল প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ইহার পর তিনি আরও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। অন্ন ত্যাগ করিলেন। বিল্বপত্র বাটিয়া দুধ ও চিনি মিশানো শরবত খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া শুধু শরবত দ্বারা জীবন যাপন করা বায়ুভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকারই সামিল। সেইজন্য তিনি লোকের নিকট পওহারী বাবা নামে পরিচিত হইলেন। আশ্রমের মধ্যে একটা গুহা নির্মাণ করিয়া উহার মধ্যে আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। প্রথম প্রথম এক দুই দিন, পরে এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ উহার মধ্যে বসিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। এই সময়ের মধ্যে খাওয়ার প্রয়োজনে গুহার বাহির হইতেন না; তথাপি যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শারীরিক ক্ষয় দেখা দেয় নাই বরং মুখের লাবণ্য আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। যোগীদের পক্ষেই এরূপ সম্ভব হয়, সাধারণের পক্ষে নয়।

তাঁহার মন যতই অন্তর্মুখীন হইল ততই যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবৎধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল। এইজন্য গুরুর সাহায্যের আরও অধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। পূর্বপরিচিত যোগীর সাহায্য পাইবার আশায় আবার আশ্রম ছাড়িয়া গিরনারের দিকে রওনা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার শরীর রক্ষার খবর পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। আকাশ হইতে পড়িলে মানুষের যেমন হয় তাঁহার মনের তখন সেইরূপ অবস্থা। যাহা হউক ভগবৎ কৃপায় তিনি এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিলেন। মন কিছু শান্ত হইলে তিনি অযোধ্যার রামানুজ সম্প্রদায়ের কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পওহারী বাবা কোন দিন কাহারও নিকট তাঁহার গুরুর নাম প্রকাশ করেন নাই, সেইজন্য তাঁহার গুরুর নাম জানা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর তিনি গাজীপুর কুর্তা আশ্রমে ফিরিয়া

আশ্রমের কাজে মন দিলেন। আশ্রমবাসীদের মধ্যে কাজের বিভাগ এমনভাবে করিলেন যাহাতে আশ্রমের পরিচালনা বিষয়ে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়। ভক্তদের মধ্যে অধিকাংশই গৃহস্থ। চাষবাস করিয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের দানে আশ্রম চলিয়া যাইত। প্রতি লাঙলে পাঁচ সের খাদ্যশস্য আশ্রমে দান করিতেন। তাহাতেই বিগ্রহ সেবা, আশ্রমবাসীদের ভরণপোষণ, সাধুসেবা, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা চলিয়া যাইত। মাঝে মাঝে অধিকসংখ্যক সাধু এবং দরিদ্রের সমাবেশ হইলে তিনি ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের পরিতোষপূর্বক খাওয়াইতেন। তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল। খানদানী বৈষ্ণব হিসাবে তিনি একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, ভক্তেরা যে সমস্ত জিনিস বিগ্রহসেবা এবং সাধুসেবার জন্য আনিবেন তাহাতে রামনাম লেবেল থাকিবে। যে জিনিসে ঐ প্রকার কোন লেবেল থাকিবে না সে জিনিস সেবায় লাগিবে না। আশ্রমের কাজের ব্যবস্থা করিয়া মাঘ মেলার সময় প্রয়াগে কুটির নির্মাণ করিয়া তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময় যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার শরীরের রং এমন সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত।

পওহারী বাবা যোগী, বৈষ্ণব, ভক্ত। স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল। কোন রোগ শরীরে নাই। কিন্তু শরীব ধারণ করিলে টেক্স দিতে হয়। তিনিও রেহাই পাইলেন না। একদিন ভীষণ জ্বর আসিল। বিরামের লক্ষণ নাই। উপসর্গ জুটিল, স্বর বসিয়া গেল। ভোগ কাটিয়া গেলে শরীর ঠিক হইয়া যাইবে এই বিশ্বাসে তিনি ভক্তদের অনুরোধেও কোন ঔষধ খাইলেন না। প্রয়াগের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বিশেষ পীড়াপীড়িতে ঔষধ গ্রহণে রাজী হইলেন। অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের ঔষধের এবং মিষ্ট পথ্যেরও ব্যবস্থা লইল। রাত্রে সদ্‌ব্যবহারের জন্য ঔষধ এবং পথ্য উভয়ই তিনি পৃথকভাবে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে কোন কোন ভক্তের মনে সন্দেহ হইল। ঔষধ ও পথ্য খাইবেন কি ফেলিয়া দিবেন সেই বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিলেন। তাঁহাদের সন্দেহ অমূলক ছিল না। রাত্রে সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলে তিনি ঔষধ ও পথ্য উভয়ই নদীতে নিক্ষেপ করিয়া স্নানান্তে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পরের দিন যে সকল ভক্ত তাঁহার কার্যে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিলেন যে পওহারী বাবা ভক্তদের কষ্টার্জিত অর্থের সদ্‌ব্যবহার করেন নাই। যদি ঔষধ এবং পথ্য গ্রহণে তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা তবে উহা আনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা নিজের চোখে দেখিয়াছেন যে ঐগুলি জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তখন পওহারী বাবা মৃদুহাস্যে বলিলেন

যে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। দুই-ই রোগকে দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। ভক্তেরাও দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে তাঁহার জ্বর নাই, কোন রোগের লক্ষণও নাই। তিনি পূর্ববৎ সুস্থ। কি করিয়া ইহা হয় বলা যায় না, কিন্তু হইতে দেখা যায়।

একদিন পওহারী বাবা কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় একজন ক্ষেপা সাধু তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ গালাগালি করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। ভক্তেরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য তাড়া করিলেন, কিন্তু পওহারী বাবার জন্য পারিলেন না। ক্ষেপা সাধুর প্রতি তাঁহার দয়া হইল। তিনি বলিলেন, ক্ষেপামি রোগবিশেষ। প্রহারের দ্বারা রোগের উপশম হয় না। ক্ষেপা সাধুকে তাঁহার নিকট আনা হইলে তিনি তাঁহার প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উপস্থিত সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে সাধুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্ষেপামি একেবারে নাই, ব্যবহার সুস্থ লোকের মত। আর একবার আশ্রমে জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণব সাধু আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় অহঙ্কারী, স্বার্থপর এবং আফিংখোর। প্রচুর দুধের দরকার বলিয়া দাবি করাতে পওহারী বাবা সাধ্যমত তাঁহার সেবা করিলেন, তথাপি অভিসন্ধিপরায়ণ সাধুর মন উঠিল না। পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা এবং বদরীনাথ প্রভৃতি ধাম দর্শনে যাইবেই বলিয়া প্রচুর অর্থের দাবি করিলেন। এই অসম্ভব দাবি পূরণ করা পওহারী বাবার পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিবেশীর নিকট ভিক্ষা করিয়া দু'এক খণ্ড বস্ত্র মাত্র সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে ধূর্ত সাধুর মন উঠিল না। অন্য লোকের সামনে পওহারী বাবাকে কিছু বলিলেন না কিন্তু পরে একা পাইয়া যথেচ্ছ গালাগালি করিয়া আবার অর্থের দাবি করিলেন। পওহারী বাবা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, 'আমি যথাসাধ্য করিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত কোন অর্থ নাই। থাকিলে অবশ্যই দিতাম। একমাত্র সম্বল আশ্রম বিগ্রহের কিছু সোনার অলঙ্কার, যদি তাহা দাবি করেন তবে বলিবার কিছু নাই।' ধূর্ত সাধুটি খুব হুঁশিয়ার, ধরা পড়িয়া ভবিষ্যতে বিপদে পড়িবার ভয়ে বিগ্রহের অলঙ্কার লইতে স্বীকার করিলেন না, তবু দাবি করিলেন আশ্রমে এত ভক্তসেবা করিয়া বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া এই অর্থই তাঁহাকে দেওয়া হউক অন্যথা পওহারী বাবা যেন আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া যান। দীনভাবাপন্ন বিদ্বেষমুক্ত পওহারী বাবা ঐ রাত্রেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া

চলিয়া গেলেন। পরের দিন প্রতিবেশীরা আশ্রমগুহা তালাবন্ধ দেখিয়া ও তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সেই ধূর্ত সাধুরও কোন হদিস মিলিল না। একই রাত্রে দুজনেরই অন্তর্ধানের রহস্য জানা গেল না।

বাকী জীবন ভগবৎ ধ্যানে কাটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি রাত্রেই পুরী রওয়ানা হইলেন। জগন্নাথধামের পথে অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার সে সংকল্প পূর্ণ হয় নাই। কিছু সুস্থ হইয়া মুশিদাবাদের নিকটে বহরমপুরে গঙ্গাতীরে কুটীয়া নির্মাণ করিয়া ধ্যানভজনে মন দিলেন। অবসর সময়ে বাংলা ভাষা শিখিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া খুব আনন্দ পাইলেন। ইতিমধ্যে কোন সূত্রে খবর পাইয়া ভক্তরা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে আবার গাজীপুর কুর্তা আশ্রমে নিয়া গেলেন। পূর্বস্থানে ফিরিয়া তিনি আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। গুহা হইতে প্রায় বাহির হন না, কখন কখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে সামান্য ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। বিশেষ কোন পর্ব উপলক্ষে শত শত ভক্তেব সমাগম হইলে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের দর্শন দিতেন। ইদানীং অনেকদিন যাবৎ তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন যে পওহারী বাবা হয়ত শরীর রক্ষা করিয়াছেন কিংবা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পর হঠাৎ এক শুভ দিনে গুহার বাহির হইয়া সাধু ভোজন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তেরা অবিলম্বে তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিলেন। ইহার পর তাঁহার সুনাম সমস্ত উত্তরাখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল।

এক রাত্রে বাসনপত্র চুরি করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমে এক চোর প্রবেশ করিয়াছিল। সে সময়ে গুহা হইতে পওহারী বাবাকে বাহির হইতে দেখিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চোর পলাইবার চেষ্টা করিল। তিনি বাধা না দিয়া বরং যাহা ইচ্ছা লইয়া যাইবার জন্য চোরকে অনুরোধ করিলেন। চোর তাঁহাকে ভাল ভাবে জানিত, তাঁহার প্রীত্যর্থে কিছু বাসনপত্র নিল, কিন্তু বাহিরে আসিয়া অপহৃত বাসনপত্র ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'জিনিসগুলি ফেলিয়া যাইবেন না, যাহা নিয়াছেন তাহা আপনারই, ফেলিয়া গেলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে।'

আর একদিন ধ্যানের সময় এক বিষধর সর্পের তাড়ায় একটি ইঁদুর ভয়ে তাঁহার কাঁধের উপর লাফাইয়া পড়িলে তিনি উহাকে কাপড়ের তলায় আশ্রয় দিলেন। শিকার ফস্‌কাইয়াছে দেখিয়া সর্পটি তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের ক্রিয়ায় তাঁহার

সংজ্ঞা লোপ পাইল। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য ভক্তগণ ওঝা ডাক্তার আনাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ এবং বহু ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা গেল। তাঁহারা পওহারী বাবার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ দু'দিন পর ভগবৎ কৃপায় তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। যাহার দ্বারা প্রাণী জীবন ধারণ করে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চনা করিলে বঞ্চনাকারী প্রতিফল পায়। পওহারী বাবা স্বীকার করিলেন সর্পকে বঞ্চনা করার ফল তিনি হাতে হাতে পাইয়াছেন। তবু ভগবৎকৃপায় শরীরের উপর অল্পেই তাহার অবসান হইয়াছে।

যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার আকর্ষণী শক্তি এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করেন কিন্তু স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায় তিনি উক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া পওহারী বাবার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। ইঁহার বর্ণনা দিতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে পরমহংসদেবের পরেই স্বামীজী পওহারী বাবাকে স্থান দিতেন। তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞান মানব কল্যাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্য একবার স্বামীজী অনুরোধ করিলে পওহারী বাবা বলিয়াছিলেন, 'সমাজের সংস্পর্শে না আসিয়াও উক্ত জ্ঞান জনহিতে প্রয়োগ করা সম্ভব'। সংঘ গঠন করিবার প্রশ্নে একদিন তিনি বিদ্রূপচ্ছলে বলেন, নাসাহীন সাধুর সম্প্রদায় তৈয়ার করিতে চান না। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য গল্পচ্ছলে বলেন, 'একবার এক সিঁদেল চোর কোন বড়লোকের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে। গৃহস্থ তাহাকে প্রাণে না মারিয়া শাস্তি-স্বরূপ কান কাটিয়া ছাড়িয়া দেন। লোকসমাজে মুখ দেখানো সম্ভব নয় ভাবিয়া চোর লজ্জায় জঙ্গলে পলাইয়া সাধুর ভেক্ নিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিছুদিন পর ভাল সাধু বলিয়া চারিদিকে প্রচার হইলে, বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, নিজের স্বরূপ জানেন বলিয়া তিনি কাহাকেও শিষ্য করিতে রাজী হইলেন না কিন্তু একজনকে কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া তাহার নাক কাটিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিলেন এবং শিষ্যকে উপদেশ দিলেন সে ইচ্ছা করিলে অন্যদেরও নাক কাটিয়া শিষ্য করিতে পারে এবং নাসাহীন সাধুর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারে।'

পওহারী বাবার দিন ঘনাইয়া আসিল। পারের ডাক আসিয়াছে। ১৮৯৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, একদিন সকালবেলা উত্তর দিকে মুখ করিয়া একটা কম্বলের উপর পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। সামনে হোমকুণ্ড, ঘৃতপাত্র, ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, দীপ জ্বলিতেছে, নিকটেই সন্ন্যাসীর যোগদণ্ড, কমণ্ডলু, আশাবারি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল হোমাগ্নিতে তাঁহার দেহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগী নিজ দেহ হোমাগ্নিতে উৎসর্গ করিয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন, জ্ঞানলাভের পর আত্মহুতি দ্বারা জীবন অতিজীবনে যুক্ত করিয়া দিলেন। উহা শাস্ত্রসম্মত।

॥ এগারো

তুলসীদাস

পরিবর্তন মানে স্থিতাবস্থা হইতে বিচ্যুতি। ইহা সব সময়ে সমান ভাবে আসে না। ইহার গতিবেগ কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ, কখনও সরল, কখনও বক্র, কখনও নিশ্চিত, কখনও অনিশ্চিত। কিভাবে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা পূর্ব হইতে জানা যায় না বলিয়া সাবধান হওয়া যায় না। সাবধান হইলেও যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, কোন প্রকারে এড়ানো চলিবে না। পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম। উহা সুখ ও সম্মানের মধ্য দিয়াও হইতে পারে আবার দুঃখ ও অপমানের মধ্য দিয়াও হইতে পারে। তবে দুঃখ ও অপমানের মধ্য দিয়া হইলেই উহা অধিক ফলপ্রদ হয়। যে মহাপুরুষের জীবন আমরা আলোচনা করিতেছি তাঁহার জীবনের পরিবর্তন দুঃখ ও অপমানের মধ্য দিয়াই আসিয়াছে। এই পরিবর্তন তাঁহাকে দিয়াছে শান্তি, অমরত্ব এবং তাঁহার মধ্য দিয়া সমাজকে দিয়াছে সাহিত্য, ধর্মভাব, শিখাইয়াছে ভক্তির মহিমা, আনিয়াছে জ্ঞানের আলো।

তুলসীদাস গরীব ব্রাহ্মণ। পুরোহিতের কাজ করেন। একদিন কর্ম উপলক্ষে দূরে গ্রামে যজমানগৃহে গিয়াছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্বেই তাঁহাকে নিজগ্রাম রাজপুরে ফিরিতে হইবে। ঘরের টান বড় টান। সেইজন্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন। যাঁহাকে দেখিবার জন্য এত ছুটাছুটি, গৃহে ফিরিয়া দেখেন তিনি নাই। তিনি আর কেহ নন তাঁহার

স্ত্রী রত্না। শুধু নামে নয়, রূপেও। রত্না যুবতী, পরমা সুন্দরী, পূর্ণ যৌবনা। গৃহে স্ত্রীকে না দেখিয়া তুলসীদাস স্তম্ভিত হইলেন। মাথায় যেন বাজ পড়িল। সর্বত্র খোঁজ করিলেন কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবেশীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে রত্না হঠাৎ পিতার অসুস্থতার খবর পাইয়া স্বামীর আসিবার অপেক্ষা না করিয়া এবং অনুমতি না নিয়াই সংবাদবাহকের সঙ্গেই পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছেন। ছোটবেলাতেই তুলসীদাস পিতৃমাতৃহীন হইয়া অসহায় হন। স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে লালিতপালিত হইবার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এইজন্য তাঁহার সমস্ত আকর্ষণটা রত্নার উপরে পড়িয়াছিল। তা ছাড়া রত্না পরমা সুন্দরী, যুবতী। তাঁহার চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গী সবই মধুর। রত্নাকে না দেখিয়া তুলসীদাস এক মুহূর্ত থাকিতে পারেন না। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহিণীহীন গৃহ অরণ্যতুল্য। সুতরাং ঘরে থাকা বৃথা। রত্নার চিন্তা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য স্থির করিলেন, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া এক কাপড়েই বাহির হইয়া পড়িলেন। শ্বশুরালয়ে রত্নার মুখ দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। পথ চলিতে চলিতে আকাশের কালো মেঘ গাঢ় হইল। ভীষণ ঝড় উঠিল। গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়াতে রাস্তা চলা কঠিন হইল। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি। ধারার বিরাম নাই। বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণও নাই। শিলাবৃষ্টি বন্দুকের গুলির মত শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। দুর্গম পথ, বৃষ্টির জন্য আরও দুর্গম হইয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে রাস্তা চলা কঠিন। বিদ্যুৎ চমকাইলে সামান্য দেখা যায়, আবার অন্ধকার হয়। ডালপালা পড়িয়া শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তুলসীদাসের সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ শরীরের কথা ভুলাইয়া দেয়। দুর্গম পথ চলিয়া অবশেষে গভীর রাত্রে রক্তাক্ত কলেবরে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত হইলেন রত্না। স্ত্রৈণ স্বামীর অবিবেচনায় ঘৃণা ও লজ্জায় জর্জরিত হইয়া ভীষণ তিরস্কার করিলেন, 'তুমি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া যে আচরণ দেখাইলে তাহা অতি গর্হিত। কামুক ভিন্ন কেহ এরূপ করে না। প্রেমিকের ভালবাসা পবিত্র, মোহমুক্ত। যে ভালবাসা আমার শরীরের উপর ঢালিয়া দিয়াছ তাহা যদি ভগবানের জন্য দিতে পারিতে তবে দেবতা প্রসন্ন হইতেন এবং নিজেও দেবতা হইতে পারিতে। প্রকৃত ভালবাসা দেবোপম। রূপজ মোহে ঢালিয়া উহার অপব্যবহার করিয়াছ। তোমায় ধিক্, শত ধিক্' এই বলিয়া রত্না নিষ্ঠুরভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুর্যোগ সত্ত্বেও স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দিলেন না।

ভালবাসার প্রতিদানে তীব্র অবহেলা ও ঘৃণা। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ভালবাসা ঠিকই রহিল কিন্তু তার গতি বিপরীত দিকে গেল।

জীবনের সন্ধিক্ষণে ভগবৎ কৃপাতেই ভাগ্যক্রমে এরূপ পরিবর্তন আসে। তীব্র রূপজ আকর্ষণ ভগবানের দিকে মোড় ফিরিল। রাম তাঁহার ইষ্ট। তিনি বিশ্বপতি। সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি এমন সুন্দর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্ট বস্তুর চেয়ে অধিক সুন্দর। রত্নার চেয়ে যে বেশী সুন্দর হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নিজ পতির জন্য রত্নার দরজা বন্ধ হইল কিন্তু বিশ্বপতির জন্য তুলসীদাসের হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল। হৃদয়ে ইষ্ট রামের আসন পাতা হইল। রত্নার তিরস্কার ও অপমান এখন তাঁহার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হইল। এই হিসাবে রত্নাই তাঁহার গুরু। চোখ ফুটাইয়া স্বামীকে ভগবানের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন কিন্তু নিজের চোখে ঠুলি পরিয়া ভগবানের পথ হইতে সরিয়া আসিলেন। পতি পরম গুরু, স্ত্রীর পক্ষে ভগবান স্বরূপ। স্বামী দেবতাকে পায়ে ঠেলার বিপদ আছে। উদ্দাম যৌবনে বুঝিতে না পারিলেও পরে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। রত্নারও তাহাই হইল।

ভগবান চিহ্নিত ভক্তকে কখনও সংসার মায়ায় ডুবান না, কোন না কোন উপায়ে তাঁহাকে পাঁক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতেন। তুলসীদাস কখনও রত্নার আঁচল ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, এখন অনন্তের ডাকে যাইতেই হইবে, উপায় নাই।

ইহার কয়েক বৎসর পরে দেখিতে পাই, তুলসীদাস জীবন-নাট্যে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ অর্থপূর্ণ, তিনি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ কবি। হিন্দি সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব দান। তাঁহার রচিত 'রামচরিত মানস' ঘরে ঘরে আদৃত, এই ভক্তিমূলক কাব্য হিন্দি সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। বেদান্তের বিখ্যাত পণ্ডিত, সন্ন্যাসী সমাজের মাথার মণি মধুসূদন সরস্বতী তাহার অপূর্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন 'বারাণসীর উদ্যানে তুলসীদাস পবিত্র তুলসীবিশেষ। বৈষ্ণবগণ এই তুলসীকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞানে নারায়ণের মাথায় চড়ান। ইহার হাওয়া ও গন্ধ চারিদিক আমোদিত করে।' তুলসীদাস রামচরিত মানসে শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ রাজা, আদর্শ পিতা, আদর্শ দেশসন্তান হিসাবে যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলে না। ভাষার মাধুর্য, বিষয় নির্বাচন, চরিত্র অঙ্কনের কৌশল এত চমৎকার যে বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। এই অমূল্য গ্রন্থখানি এত জনপ্রিয় যে বহু ভাষাতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে। সম্প্রতি রুশ ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

যে মহাপুরুষের প্রতিভা চারিদিকে এত ছড়াইয়াছে তাঁহার পূর্ব-পরিচয় কিছু জানা আবশ্যক। উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের নিকট বান্দা জেলার নগণ্য রাজপুর গ্রামে ১৬৪৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী। ধার্মিক ব্রাহ্মণ। মাতা হালসীদেবীও স্বামীর মত পুণ্যবতী। দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়েই মারা যান। পিতৃমাতৃ স্নেহে বঞ্চিত তুলসীদাস কুলগুরু আত্মারামের গৃহে আশ্রয় পাইয়া প্রতিপালিত হন এবং শিক্ষালাভ করেন। মেধাবী ছাত্র শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে গুরুর অনুরোধে দীনবন্ধু পাঠক নামক জনৈক প্রতিবেশী ধার্মিক ব্রাহ্মণের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা রত্নার পাণিগ্রহণ করেন। রত্নার অদর্শনে তুলসীদাস চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন এবং তাঁহার জন্য সব সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিতে পারিতেন অথচ এই রত্নাই সেই গভীর দুর্যোগের রাত্রে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র, বহু ভক্তসাধক ও জ্ঞানীর তপস্যাক্ষেত্র, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসীর কথা শুনিয়া রামভক্ত তুলসীদাস মুক্তিলাভ করিয়া জীবন সমস্যা সমাধান কল্পে এই শিবক্ষেত্রে আসিয়া বহু কষ্টে সনাতন দাসের সংস্কৃত টোলে আশ্রয় পাইলেন এবং শাস্ত্রপাঠ ভজন ও রামের ধ্যান ও মহিমা কীর্তনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। জনাকীর্ণ স্থান সাধনভজনের প্রতিকূল। এইজন্য দূরে নির্জন অরণ্যে গাছতলায় কুটীয়া নির্মাণ করিয়া শারীরিক কষ্ট, অন্নবস্ত্রের ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভগবান লাভের আশায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। নিজ কুটীয়া পরিষ্কার করিয়া পাত্রের অবশিষ্ট জল গাছতলায় ফেলিতেন। উক্ত গাছের ডালে এক উপদেবতা বাস করিত। তুলসীদাসের উপর প্রসন্ন হইয়া একদিন দেহধারণ পূর্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সোজাসুজি সাহায্য করিতে অপারগ হইলেও উপদেবতা একটা উপায় বলিয়া দিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরে একটা জায়গায় নিত্য রামনাম কীর্তন হয়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কীর্তন শুনিবার জন্য প্রথমে আসিয়া এককোণে বসিয়া নীরবে ভজন শুনিবার পর সকলের শেষে চলিয়া যান। তিনি কাহারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না। তিনি রামের প্রধান ভক্ত ছদ্মবেশী মারুতি। ইহার পর তুলসীদাস নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বহু অনুনয় করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন। গুরুকরণ আধ্যাত্মিকতার সোপান। বহু সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয়। দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। এইভাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী মারুতির নিকট দীক্ষালাভ করিবার পর তুলসীদাসের হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল। তিনি নূতন আলোর সন্ধান পাইলেন।

কঠোর তপস্যায় মাসের পর মাস চলিয়া গেল। এতটুকু সময় তিনি নষ্ট করেন না। এত তপস্যাতেও ইষ্ট দর্শন হইল না বলিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া বিরহজনিত দুঃখের অবসানের জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া গুরুকে ধরিলেন। শিষ্যের প্রতি সমবেদনা জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্বাসবাণী শুনাইলেন এবং বলিলেন, 'চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে রামচন্দ্রের জন্মদিন, ঐ দিন নিজ কুটীয়ার নিকটেই তোমার অভিষ্ট লাভ হইবে। ধৈর্য অবলম্বন কর, হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।' নির্দিষ্ট শুক্লা নবমীর দিন আসিল। সকাল হইতে তুলসীদাস অপেক্ষা করিতেছেন। ইষ্ট দর্শন আশায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। আবার হতাশার আন্দোলনও মনে চলিতেছে, এমন সময়ে একজন বেদে সস্ত্রীক তাঁহার কুটীয়ার সামনে বানরের খেলা দেখাইতে উপস্থিত হইল। সঙ্গে একজন যুবক সন্ন্যাসী হাতে কমণ্ডলু, তুলসীদাসের ইষ্ট দর্শনের আশা মিটিয়া গেল। বানর-নাচ দেখা ইষ্ট দর্শন নয়। গুরু বলিয়া দিয়াছেন নির্দিষ্ট দিনে ইষ্ট দর্শন দিবেন কিন্তু কিভাবে দিবেন তাহা মারুতি বলিয়া দেন নাই, তিনি যদি ছদ্মবেশে আসেন তবে তুলসীদাস তাঁহাকে কি করিয়া চিনিবেন। ঘটনাও তাহাই হইল। বিরক্ত হইয়া তুলসীদাস বেদের দলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং কুটীয়ার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ছদ্মবেশী ইষ্ট হতাশ হইয়া দল নিয়া চলিয়া গেলেন। তুলসীর ভাগ্য মন্দ। ইষ্ট দর্শনের জন্য মন এখনও পবিত্র হয় নাই। আরও তপস্যার প্রয়োজন। হতাশায় হৃদয় ভরিয়া গেল। গুরুবাক্য ফলিল না। ইষ্ট দর্শন হইল না।

পরের দিন তুলসীদাস ক্ষুণ্নমনে দশাশ্বমেধ ঘাটে মারুতির নিকট অনুযোগ করিলেন যে তাঁহার আশীর্বাদ-বাণী সফল হয় নাই। রামনবমী চলিয়া গেল কিন্তু রামের দর্শন মিলিল না। মৃদু হাসিয়া মারুতি উত্তর দিলেন, 'আমার কথা অন্যথা হইবার নয়। পূর্বদিন রাম সীতা বেদে বেদেনীর বেশে, লক্ষ্মণ সাধু ভিক্ষুকের বেশে, আমি স্বয়ং বানরের বেশ ধারণ করিয়া তোমার কুটীয়ার সামনে আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমার মন এখনও পবিত্র হয় নাই বলিয়া চিনিতে পার নাই। রাম সর্বশক্তিমান। যে কোন বেশে তিনি আসিতে পারেন। তিনি শুধু ধনুকধারী রূপে আসিবেন, অন্যভাবে আসিবেন না এমন কোন কথা নাই। বেদের বেশে আসিলে রামের রামত্ব কমে না বরং মহিমা বাড়ে।' গুরুর কথা শুনিয়া তুলসীদাস মাথায় হাত দিলেন। নিজের বোকামিতে ইষ্ট দর্শনের অমূল্য সুযোগ হারাইয়াছেন। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। আরও তপস্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অণুতে পরমাণুতে রাম, রামই সব হইয়াছেন আর এই দেহই রামের মন্দির। অন্ধকারে মন্দিরের দেবতা

দেখা যায় না। নিরন্তর ইষ্ট দর্শন করিতে হইলে রামনামে ডুবিয়া যাইতে হইবে। তিনি বলেন "রাম-নাম-মণি-দ্বীপ ধরু, জীহ দেহরী-দ্বার। তুলসী ভিতর বাহের হুঁ জৌ চাহসি উজিআর" (রামচরিত মানস, বালকাণ্ড দোহা ২১)। তাঁহার ক্রমশঃ বিশ্বাস হইল রামনামের যথার্থ স্বরূপ, মহিমা, রহস্য ও প্রভাব জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক নামরূপ জপ সাধন করিলে হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম প্রকাশিত হন (রাঃ চঃ মাঃ বালকাণ্ড ২২।৩-৪) এবং যাঁহারা রামের গুণগান সাদরে শ্রবণ করেন তাঁহারা জলযান (নৌকাদি) ছাড়াই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন (রাঃ চঃ মাঃ সুন্দরকাণ্ড ১৩০)। তাই তিনি নিয়ত প্রার্থনা করেন 'বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্'।

ইহার পর একদিন গুরু মারুতি শিষ্যের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রামের লীলাস্থল চিত্রকূটে গিয়া তপস্যা করিতে বলিলেন। গুরুর আদেশে তুলসীদাস বারাণসী ছাড়িয়া চিত্রকূটে কুটির নির্মাণ করিয়া ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া দীর্ঘ ১৮ বৎসর কাটাইলেন। এই সময়ে একদিন পূজার চন্দন পিষিবার কালে দেখিলেন সম্মুখে জটাবল্কলধারী এক পরম সুন্দর বালক, হাতে তীরধনুক, চন্দনের বাটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। তুলসীর মনে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। পূজার চন্দন দিয়া বালকের কপালে তিলক দিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন সময় বারাণসীর ছদ্মবেশী বেদে দম্পতি, ভিক্ষুক এবং বানর-নাচের ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য স্থির করিলেন। আর সুযোগ হারাইবেন না। আদর করিয়া বালকের কপালে তিলক দেওয়া মাত্র তুলসীর শরীর-মনে ভীষণ শিহরণ হইল। আনন্দ আর ধরে না। ইষ্ট রাম বালকরূপে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বালককে জিজ্ঞাসা করিলে রাম মৃদুহাস্যে সম্মতি জানাইলেন। তুলসীদাস ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইলেন। অনেকক্ষণ পর ভাবের উপশম হইলে তুলসীদাসের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন বালক নাই। অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু তুলসীর প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছে অনাবিল শান্তি আর আনন্দের ভরা কলস।

একদিন ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে তুলসীদাস ভাবের ঘোরে দেখিলেন রাম স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'রামায়ণ রচনা করিয়া ভগবৎ মহিমা প্রচার কর। জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ কর। তাহাতে মানুষ ভগবৎ পথে চলিতে শিখিবে।' ইহার পর রামের লীলাস্থল যথা দণ্ডকারণ্য, সরযূ তীরস্থ স্থানাদি দর্শন করিয়া রামায়ণ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু তীর্থভ্রমণ করিলেন। বৃন্দাবনে অধিকাংশ মন্দির রাধাকৃষ্ণের। ঐ মূর্তির প্রতি তাঁহার

বিদ্বেষভাব নাই, তথাপি ইষ্ট রামের মূর্তি তাঁহার ভাল লাগে। তাই মদনগোপালের নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি ধনুকধারী রাম রূপেই তাঁহাকে দর্শন দেন। ভগবান ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রার্থনা শুনিলেন। মন্দিরে অন্যেরা মদনগোপালের মূর্তি দেখিতে পাইলেও তুলসীদাস রামের মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইলেন।

ইহার পর নৈমিষারণ্য এবং অন্যান্য লীলাস্থল দর্শন শেষ করিয়া পূর্বস্থান বারাণসীতে ফিরিয়া গোপাল মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। এতদিন বহুদক ছিলেন এবার কুটীদক হইলেন। গোঁড়া পুরোহিতের সঙ্গে উদারভাবাপন্ন তুলসীদাসের বিরোধ ঘটিলে তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া অসিঘাটের উপর এক গৃহে আশ্রয় নিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐখানেই কাটাইয়া দিলেন। ঐখানে বসিয়াই তিনি প্রসিদ্ধ রামচরিত মানস রচনা করিলেন। ভক্তগণ এখনও তাঁহার এই তপস্যার স্থানে গিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই তিনি রামচরিত মানস রচনা করিবার সংকল্প করিলেন কিন্তু পরে ৺বিশ্বনাথের আদেশে মত পরিবর্তন করিয়া স্থানীয় ভাষায় লেখেন যাহাতে সহজে সকলের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয়।

একদা অযোধ্যার জনৈক প্রসিদ্ধ যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তুলসীদাসের রচনায় ভাব, ভাষা, চরিত্র অঙ্কনের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেই যুগের বাল্মীকি বলিয়া আখ্যা দেন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, হনুমন্ত নাটক, ভাগবত, রঘুবংশ উত্তররামচরিত প্রভৃতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করেন। আওধ এবং ব্রজভাষার সংমিশ্রণে তাঁহার রচিত হিন্দিভাষা পরে হিন্দির আদর্শ এবং মানরূপে গৃহীত হয়। রামচরিত মানস এত জনপ্রিয় যে সাধারণ লোক তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রায় কোন না কোন দোঁহা উদ্ধৃত করিয়া থাকে। উহা হিন্দি-ভাষীদের নিত্য পাঠ্য গীতাস্বরূপ। ইহার ভাব হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং এত আনন্দ দেয় যে অন্য কোন গ্রন্থ তাহা করে না।

কবি, দার্শনিক, ভক্ত এবং যোগী হিসাবে তাঁহার সুনাম ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দূর দূর দেশ হইতে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। এই সুনাম আবার বিপদও ডাকিয়া আনিল। তুলসীদাসের সহজ ভাবোদ্দীপক রামায়ণ পাঠে অধিক শ্রোতা আকৃষ্ট হওয়াতে পেশাদারী রামায়ণ পাঠকদের আয়ের অঙ্ক কমিয়া গেল। বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা তুলসীদাসের রচিত রামায়ণ সহ ঘরের আসবাবপত্র চুরি করিবার গোপন

ষড়যন্ত্র করিল। তাহাদের নিযুক্ত সিঁদেল চোর তুলসীদাসের গৃহের চারিদিকে সারারাত ধনুকধারী পাহারাদার দেখিয়া ভয়ে ঢুকিতে পারিল না, অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া পরের দিন সবিস্তৃত ঘটনা তুলসীদাসের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। চুরি করিতে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছে বলিয়া তুলসীদাস চোরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার মুখে পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় শুনিয়া চোরের হৃদয় গলিয়া গেল। সৎসঙ্গে চোরও সাধু হয়। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়। ভক্তের আসবাবপত্র রক্ষার্থে ইষ্টকে রাত জাগিয়া পাহারা দিতে হয় এই চিন্তা তুলসীদাসকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সেইজন্য তিনি জিনিসপত্রাদি গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। অমূল্য গ্রন্থ রামায়ণের পাণ্ডুলিপিখানি কোন এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ বন্ধুর হেপাজতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আর একবাব কোন লোক ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি তান্ত্রিক অভিচার করিলেন, কিন্তু ইষ্টের কৃপায় আশ্চর্য উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

এই সময়ে তাঁহার কিছু কিছু বিভূতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাহাকে যাহা বলেন তাহা ফলিতে লাগিল। বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছড়াইল। একদিন ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে মণিকর্ণিকার ঘাটের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন—তখন হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর শোভিতা, শাড়ী পরিহিতা কোন সতী রমণী সদ্য মৃত স্বামীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া করুণভাবে ক্রন্দন করিতেছিলেন। করুণায় তাঁহার মন গলিয়া গেল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া এবং রমণী সন্তানহীনা ভাবিয়া তাঁহাকে পুত্রবতী হইবেন বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া তুলসী-দাস যথাবিধান করিবার জন্য ইষ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বিধবা সন্তান লাভ করিবে ইহা অচিন্তনীয়, একদিকে সতীর সতীত্ব বিপন্ন, অন্যদিকে তুলসীদাসের কথা মিথ্যা হইলে ভক্তের মান থাকে না। রাম, ভক্ত এবং সতী উভয়কে রক্ষা করিলেন। তুলসীদাসের বাক্য সফল হইল। সতী মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং যথাসময়ে এক সুন্দর পুত্র কোলে পাইলেন। ভগবৎ কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।

আর একবার কোন লোক প্রচণ্ড রাগের বশবর্তী হইয়া এক ব্রাহ্মণকে খুন করিল। রাগ শান্ত হইলে লোকটি ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট বিধান চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'ব্রহ্মহত্যা পাপের খণ্ডন নাই। একমাত্র উপায় অনুশোচনায় আত্মহত্যা'। আত্মহত্যাও মহাপাপ। পাপ দ্বারা পাপের খণ্ডন কি করিয়া হয় ইহা বুঝিতে না পারিয়া লোকটি তুলসীদাসের শরণাপন্ন হইল। তিনি তাহাকে আশ্রয় ত দিলেনই অধিকন্তু রামনামে দীক্ষিত

করিলেন। কারণ তিনি জানেন যে নামে বিশ্ব পবিত্র হয় সেই নামে ব্রহ্মহত্যাপাপ অবশ্যই খণ্ডন হইবে। অহেতুকী কৃপা দেখাইতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদের কোপে পড়িলেন। তাঁহারা রামনামের প্রত্যক্ষ মহিমা প্রমাণের জন্য আহ্বান করিলেন। বলিলেন, যদি নিকটস্থ শিব মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত পাথরের ষাঁড় জীবিত হইয়া ঘাস খায় তবে তাহা রামের মহিমা বলিয়া স্বীকার করিবেন নইলে রামনামের কোন মাহাত্ম্য নাই ইহাই প্রমাণিত হইবে। তুলসীদাসও তাহা মানিয়া নিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক হইল, ষাঁড় জীবন্ত হইয়া ঘাস খাইতেছে। রামের কৃপায় অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিল। সংশয় দূর হইল। আলোর সন্ধান মিলিল।

ভক্তের হৃদয় কোমল হয়। দরিদ্রের জন্য তাঁহার অন্তর সর্বদা খোলা ছিল। তাঁহার যোগশক্তির কথা শুনিয়া কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। তুলসীদাস গঙ্গার স্তব করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণেব কুটিরের নিকট নদীর চর পড়িয়া কিছু জমি হইল এবং ব্রাহ্মণের জীবিকার সংস্থান হইল। অন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুলসীদাস প্রদত্ত রামের মূর্তির নিয়মমত সেবাপূজা করিয়া কিছু দিনের মধ্যে বিস্তর সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তুলসীদাসের যোগশক্তির কথা দিল্লী সম্রাটের কানে উঠিল। তাঁহাকে রাজধানীতে আনা হইল। কিছু যোগবিভূতির খেলা দেখাইবার জন্য বাদশা তাঁহাকে হুকুম দিলে তিনি হুকুম অমান্য করিলেন, ফাল তাঁহাকে জেলে পুরিয়া রাখা হইল। তুলসীদাস সব বিষয়ে ইষ্টের উপর নির্ভর করিতেন। সবই তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে জানিয়া তিনি নির্বিকার রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল অসংখ্য বানরের দল দিল্লী আক্রমণ করিয়াছে, গাছগাছড়া ফুল ফল ছিঁড়িয়া সব তছনছ করিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্থানীয় অধিবাসীর সর্বপ্রকার বাধা দান ব্যর্থ হইতেছে। যত বাধা দেওয়া হয় আক্রমণ তত তীব্র হয়। অবশেষে তাহারা বাদশাকে বলিলেন, ভক্ত তুলসীদাসকে শাস্তি দেওয়াতে এরূপ বিপর্যয় ঘটিতেছে। অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া না হইলে রাজধানীর সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। অতর্কিতে বিপুল বানরসেনা কর্তৃক রাজধানী আক্রমণই তুলসীদাসের যোগশক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয়। ইহার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। বাদশা তাঁহার কারামুক্তির আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বানরের অত্যাচারও বন্ধ হইয়া গেল।

রামের মহিমা প্রচারে তাঁহার যাহা করণীয় তাহা শেষ হইয়াছে। এখন বয়স হইয়াছে। পারের ডাক আসিয়াছে। দেহে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। যতই রোগ-

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল ততই রামনামে মন ডুবিয়া গেল। রামই রোগ, রামই ঔষধ। রামনামে সকল কষ্টের অবসান হয়। রামনামে শান্তি, অমৃতত্ব। ১৭৩৭ সালে কুটীয়াতে নিজ আসনে বসিয়া ইষ্ট নাম করিতে করিতে তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। আত্মা অনন্তে মিশিয়া গেল। যে অমূল্য সম্পদ (রামচরিত মানস) তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

॥ বারো ॥

পুণ্যতীর্থ বারাণসী। মোক্ষধাম। ৺বিশ্বনাথ মুক্তিদাতা। মাতা অন্নপূর্ণা অকাতরে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিলাইতেছেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গা কলনাদে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রূপে বহিয়া যাইতেছে। 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে'—মন্ত্র পাঠ করিয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারী নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। 'নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্' স্তব পাঠ করেন। স্নান সারিয়া বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিয়া 'নম শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে, নিবেদয়ামি চ আত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর' মন্ত্রে প্রণাম করেন এবং অন্নপূর্ণা দর্শন ও পূজা করিয়া প্রার্থনা করেন 'অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে, জ্ঞান বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি'। এই ভাবে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভগবানের নিকট ভক্তের কাতর প্রার্থনা, বহু সাধক, মহাপুরুষদের কঠোর ত্যাগ-তপস্যা, অগণিত জ্ঞানীর জ্ঞান ভাণ্ডার জমাট বাঁধা হইয়া এই তীর্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে—মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে। মরণান্তে ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার কোলে স্থান পাইবার আশায় বহু দেশের বহু ভক্ত এইখানে আশ্রয় নিয়াছেন, এবং কষ্ট সহ্য করিতেছেন।

এই পুণ্যতীর্থের নিকটে এক নগণ্য গ্রাম। গ্রামের খবর অল্প লোকেই রাখে। কিন্তু এই নগণ্য গ্রাম এক মহাপুরুষের জন্মে গণ্য ও ধন্য হইয়াছে। তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা ও অধ্যাত্ম শক্তি প্রবল অধর্মের স্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, ধর্মের স্রোত আনিয়াছে, বিবদমান ধর্মের সম্মিলন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে মহাপুরুষ এত বড় পরিবর্তন আনিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। যায় জানা যায় তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য বলা কঠিন। তাঁহার জন্ম রহস্যজনক। কোন ব্রাহ্মণ বিধবা

একদা ভীষণ বিপদে পড়িয়া জনৈক সাধুর নিকট গিয়া আশীবাদ ভিক্ষা করেন। সাধুর নাম ধাম জানা যায় নাই। তবে তিনি যে আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন পুরুষ তাহার আভাস পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পুত্রকামী, মাতৃত্বের কাঙাল এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি ব্রাহ্মণীর বৈধব্যের কথা চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে পুত্র লাভ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এরূপ আশীর্বাদ বিধবা ব্রাহ্মণীর পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। শিরশ্ছেদ ইহার চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু সাধুর আশীর্বাদ বিফলে যাইবার নয়। একদিকে মাতৃত্ব, গর্ভজাত শিশু নষ্ট করা যায় না, স্নেহ বিসর্জন দেওয়া যায় না। অন্য দিকে সমাজ, ধর্ম, মান, ইজ্জতের ভয়। উভয় সঙ্কট। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিধবা স্নেহের বশবর্তী হইয়া নবজাত শিশুকে একটা হাঁড়িতে করিয়া দূরে এক পুকুরের ধারে গোপনে রাখিয়া আসিয়া আপাততঃ সঙ্কট মুক্ত হইলেন। নিকটে এক মুসলমান জোলা পরিবার ছিল। তাহারা অপুত্রক। শিশুর কান্না শুনিয়া নিকটে আসিয়া দিব্য ফুটফুটে একটি ছেলে দেখিয়া বুকে তুলিয়া লয়। এই ভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ে গর্ভজাত সন্তান স্বীয় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইল, অপুত্রক পুত্র পাইয়া শিশুকে মাতৃস্নেহে সিঞ্চিত করিয়া দিল, মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাইল। বৃদ্ধ মুসলমান জোলা শিশুটিকে লালন পালন করিল। নাম রাখিল কবীর। পালিত পুত্র পিতার তাঁত বোনার কাজ শিখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অন্য কোন রকম শিক্ষার সুযোগ পাইলেন না। যৌবনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এক পুত্র-সন্তানও জন্মিল। নাম রাখিলেন কামাল। পুত্রের জন্মও পিতার জন্মের ন্যায় রহস্যাবৃত, সঠিক বিবরণ জানা যায় না। একদা পথ চলিতে চলিতে কবীর এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া থামিয়া গেলেন। দেখিলেন রাস্তার পাশে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে। শব দেখিয়া শৃগালগুলি ছুটিয়া আসিল এবং মহৎ ভোজ্য উপস্থিত দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। শৃগালের কবল হইতে শবটিকে রক্ষা করিবার জন্য কবীর উহা নদীর ধারে লইয়া গেলেন। তখন সামনে বিরাট শিকার দেখিয়া জলের মাছগুলি আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। ডাঙায়, জলে কোথাও নিরাপত্তা নাই দেখিয়া কবীর শবটি বাড়ী লইয়া গেলেন। এবং তাঁহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া পুত্রের মত লালন পালন করিলেন। নাম রাখিলেন কামাল। ইহার পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত। আধুনিক কালে এরূপ প্রাণসঞ্চারের ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে উক্ত ব্যক্তি যদি সর্পাঘাতে ঐরূপ রাস্তার পাশে শবের মত পড়িয়া থাকে এবং কবীর যদি ঔষধ কিংবা মন্ত্র দ্বারা উক্ত বিষের প্রক্রিয়া নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তবে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

ঘটনা যাহাই হউক না কেন তাঁহার মধ্যে যে কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়।

কবীর পিতার ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁত বুনিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহা দ্বারা স্বীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিতেন, ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিতব্যের উপর ছাড়িয়া দিতেন। সুতরাং জমাইবার প্রয়োজন হইত না। তিনি শুভ সংস্কার নিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিতরের ধর্মপ্রবণ ভাব যতই বিকাশোন্মুখ হইল ততই সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ত্যাগী এবং আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন বলিয়া তখন রামানন্দ স্বামীর খুব খ্যাতি কিন্তু তাঁহার সংকল্প ছিল যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবেন না। এই অবস্থায় মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হইয়া কবীর তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে সহানুভূতি পাইবেন ইহা আশা করা যায় না। হইলও তাই। প্রত্যাখ্যাত হইলেন, তবুও কবীর একেবারে নিরাশ হইলেন না। 'বারে বারে ঠেলবে দুয়ার হয়ত দুয়ার খুলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।' তাঁহাকে গুরুকৃপা লাভ করিতেই হইবে, সহজ পথে প্রতিবন্ধক ঘটিলে কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কৌশল অবলম্বন দোষের নয়। তিনি জানিতেন রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ শেষ রাত্রে গঙ্গা স্নান করিতে যান। একদিন অন্ধকার রাত্রে যে ঘাটে রামানন্দ স্বামী নিত্য গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন সেখানে একটা সিঁড়ির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। কে কখন কোন্ মতলব কিভাবে হাসিল করিবে তাহা বুঝা যায় না, রামানন্দ স্বামী কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেই ঘন অন্ধকার রাত্রে গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় মানুষের শরীরের উপর পা পড়াতে 'রাম রাম' বলিয়া উঠিলেন। কবীরের পক্ষে এরূপ গুরুর পদস্পর্শ এবং মুখে 'রাম' নামই যথেষ্ট। ইহাই তাঁহার গুরুদীক্ষা বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গুরু রামানন্দকে প্রণাম করিলেন। কবীর গৃহে ফিরিয়া মাথা মুড়াইলেন। গলায় তুলসী মালা ধারণা করিয়া বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিলেন। কোন পিতা, মাতা, পুত্র, পরিবার আপন জনের এইরূপ উদাসীন ভাব সহ্য করিতে পারে না। কবীরের পিতা পূর্বেই মারা গিয়াছেন, মাতা, স্ত্রী এরূপ বেশ পরিবর্তন পছন্দ করিলেন না, উহা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার সামিল। মুসলমান হইয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা মহাপাপ। তাঁহারা মুসলমান কাজীর নিকট নালিশ করিলেন। কবীর নিজেকে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে কেহই তাঁহাকে জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছায় বেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। কাজী সন্তুষ্ট

হইতে পারিলেন না। ধর্মান্তরিত করাইবার প্রমাণ পাইলে তিনি হয়ত দোষীকে শূলে চড়াইবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সে সুবিধা হইল না। তবুও ব্যাপার বহুদূর গড়াইল। দিল্লীর দরবারে নালিশ গেল। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য দিল্লীতে কবীরের ডাক পড়িল। বৈষ্ণব বেশেই তিনি সম্রাটের দরবারে গেলেন কিন্তু বাদশাকে সম্মান করিয়া সেলাম পর্যন্ত করিলেন না, ইহাতে কুপিত হইয়া বাদশা কৈফিয়ৎ তলব করিলে কবীর স্পষ্টভাবে জবাব দিলেন, তিনি স্বীয় ইষ্ট রাম ব্যতীত কাহাকেও প্রণাম করেন না। বাদশা আরও চটিয়া গেলেন, তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিবার জন্য হুকুম দিলেন। কবীরের মন রামময় হইয়া গিয়াছে। ইষ্টের জন্য সব রকম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত। করিলেনও তাহাই, ধর্মপ্রীতি ও ইষ্টনিষ্ঠা অবশেষে জয়ী হইল। কবীরের ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে মুক্তি দিবার হুকুম দিলেন এবং ইচ্ছা মত ধর্ম পালন এবং প্রচার করিবার অনুমতি দিলেন। কবীরের বিপদ কাটিয়া গেল।

মুসলমান শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শিষ্য এবং ভক্তদের প্রবল আপত্তির কথা রামানন্দ স্বামীর কানে পৌছিলে তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য কবীরকে ডাকাইলেন। কবীর সেই শেষ রাত্রে ঘন অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটের দীক্ষার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, তাহার পর হইতে নিজেকে রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হিসাবে পরিচয় দিয়া থাকেন। কবীরের ভক্তিতে প্রীত হইয়া রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য কবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যখন কোন গভীর বিষয় সমাধানের প্রয়োজন হইত তখন কবীর গুরুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছিতেন। তবে কোন কোন বিষয়ে তিনি গুরুর সঙ্গে এক মত হইতে পারিতেন না। জাতি বিচার সম্বন্ধে গুরুর সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য ঘটিল। গুরু কিংবা শিষ্য কেহই আপন সিদ্ধান্ত ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। ফলে শিষ্য পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন, উহা কবীরপন্থী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বারাণসী, কটক, পুরী, বোম্বেতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মঠ আছে। তন্মধ্যে বারাণসীর মঠই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

কবীর শুধু ধর্মগুরু নন। সমাজনেতা হিসাবেও তিনি সম্মানের যোগ্য। সামাজিক অন্যায় দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের মত তখনও সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার অভাব ছিল, নীচ বর্ণের অনেকে নানা প্রকার অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিত। সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে বিরত, জ্ঞান

তাঁহাদের মধ্যে লোপ পাইতেছে। শূদ্রগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। প্রবঞ্চক স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে। সৎ লোকের ঘরে অন্ন নাই। সতীর পরনে বস্ত্র জোটে না। বেশ্যার এত কাপড় যে পচিয়া নষ্ট হইলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। বিদ্বানের সম্মান নাই। ভণ্ড সমাজনেতা, জুয়াচোর জাতির নেতা। গরুর দুধ বিক্রয় করিতে গোয়ালাকে গলিতে গলিতে ছুটিতে হয়। অথচ ঘরে বসিয়াই মদ বিক্রয় হয়। যে সমাজে এরূপ দুরবস্থা সে সমাজে আধ্যাত্মিক উন্নতি কি কখনও সম্ভব হয়?

সৎ পথে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার জন্ত কবীর উৎসাহ দিয়া বলিতেন যে জীবনটা যুদ্ধক্ষেত্র বিশেষ, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা উচিত নয়। উহা কাপুরুষের কাজ, কাম ক্রোধাদি প্রবল শত্রু। তাহাদের প্রতি কখনও দয়া প্রকাশ করা উচিত নয়। ভদ্র আচরণ, সত্যনিষ্ঠা দ্বারা শত্রুকে বশে আনিতে হয়। সাহস অবলম্বন পূর্বক জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলে সব দুর্বলতা দূর হয়। ভয়ের কোন কারণ থাকে না। ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেশ্য। তপস্যালব্ধ অনুভূতির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিলেন, 'অনন্তের গান আমার কানে বাজে। উহা যে কি মধুর এবং প্রাণস্পর্শী তাহা অবর্ণনীয়। স্বামী-স্ত্রী মিলনে যে আনন্দ ইহা তাহার মত, বরং অনেক বেশী। অনন্তে মিলিয়া দাস প্রভু এক হইয়া যায়। আমি রামের কুকুর। আমার গলায় রামনামের বগলস্। তিনি মালিক। যেদিকে বগলস্ টানিবেন আমাকে সেদিকে যাইতে হইবে। তিনি অন্ন যোগান, তাহাতেই আমি বাঁচিয়া থাকি।'

তাঁহার প্রসিদ্ধ দোঁহাতে ইষ্টনিষ্ঠা এবং রামের মহিমা স্বন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁহার ধর্মমত আলোচনা রামানন্দকী গোষ্ঠী এবং গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কবীর দরদী মরমিয়া। ধর্মতত্ত্ব, ভগবৎ প্রেম তাঁহার দোঁহার মাধ্যমে স্বন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন, 'এই দেহ ভস্ম করিয়া কালি তৈয়ার করিব। দেহের হাড় লিখিবার কলম্ হইবে। ঐ কলম কালিতে ডুবাইয়া আমি রামনাম লিখিব। জীবন আলো দিয়া রামের মুখ দেখিব। হে জীবন দেব, আমি আর তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না। হয় দর্শন দিয়া প্রাণ শীতল কর, নতুবা মৃত্যু দিয়া আমার সকল জালার অবসান কর।' তিনি একাধারে সাধক, কবি, সমাজ-সংস্কারক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু দোঁহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া জগতের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন। কবীর বলেন, 'আমরা যদি বলি তিনি শুধু অন্তরে আছেন তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব লজ্জিত হয়,

যদি বলি তিনি শুধু বাহিরে আছেন তাহা হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি অন্তরে, বাহিরে তিনি সর্বব্যাপী, তিনি পূর্ণ।'

গোরক্ষপুরের নিকটে মাগর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু এবং মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে গুরুর দেহ লইয়া যেমন বিবাদ হয়, কবীরের মৃত্যুর পরও সেইরূপ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। অলৌকিক উপায়ে ইহার মীমাংসা হয়। তাঁহার শবের উপর ঢাকা আবরণ সরাইলে দেখা গেল কতকগুলি সুন্দর-গন্ধ ফুল পড়িয়া আছে। উভয় সম্প্রদায়ই ঐ ফুল সমান ভাগে নিয়া নিজ নিজ ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী গুরুর স্মৃতি রক্ষা করিলেন।

॥ তেরো ॥

দাদু

মহত্ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। উদারতা, প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য যদি মহত্ত্বের মাপকাঠি হয় তবে ঐ সকল দুর্লভ শক্তি সাধারণের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কখন কখন কোন ভাগ্যবানের হয়ত হইতে পারে। মহত্ত্ব কাহারও জাতিগত কিংবা সমাজগত সম্পত্তি নয়। ভগবৎ কৃপায় যে কোন জাতির কিংবা সমাজের ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উহা প্রকাশ পাইতে পারে। উচ্চবর্ণে অনুকূল পরিবেশে উক্ত গুণপ্রকাশের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিলেও নীচবর্ণে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে উহার প্রকাশ একেবারে অসম্ভব তাহা বলা চলে না। জঙ্গলে বিনা চেষ্টায় সুগন্ধ পুষ্প, গোবরের গাদায় পদ্ম, অশুচি স্থানে তুলসী, আস্তা-কুঁড়ে কাবুলি ছোলা জন্মিতে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় পরিবেশ মুখ্য নয়, গৌণ। জন্মগত শুভ সংস্কার মুখ্য। মুখ্য গৌণকে অতিক্রম করিতে পারে। উহা বিকাশের সম্ভাবনা পরিবেশ ছাড়াও হইতে পারে। স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিত্ব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিকাশ হইতে দেখা যায়। এখানে আমরা এমন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি যিনি এই বিষয়ে সাক্ষী প্রদান করিতে পারেন।

১৫৪৪ সাল। সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাস। শুক্লা অষ্টমী তিথি। বৃহস্পতিবার। পুণ্যদিন। মহাপুরুষ দাদু এই শুভ দিনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম লোদী এবং মাতার নাম বসিবাই। দরিদ্র পরিবার। ভগবৎ নির্ভরশীল। ধর্মপরায়ণ,

কখনও কাহারও অনিষ্ট করে না। আর্থিক দুরবস্থা। নীচবর্ণের অতি সাধারণ লোক। জাতিতে মুচি। সমাজে ঘৃণিত। নীচ বলিয়া কেহ দরদ দেখায় না। সমাজে সাধারণত দেখা যায় 'শ্রীমস্তকো কণ্টক ফুঁকে দরদ পুছে সব কোই, দুখিয়া পাহাড়সে গিরে বাদ না পুছে কোই।' শিক্ষা, সংস্কৃতির দরজা তাহাদের জন্য বন্ধ। উচ্চবর্ণের লোকেরা মনে করেন উহা তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। নীচবর্ণের লোকদের ভাগ দেওয়া চলে না। তাঁহাদের এই সংকীর্ণতা সমাজকে কলুষিত করিয়াছে, কত যে স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিত্ব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ফলে সমাজ বহু মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সামান্য মুচির ঘরে জন্ম নিয়াছেন বলিয়া দাদূ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায় নাই। তাঁহাকে পৈত্রিক পেশা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। মুচির কাজ অন্যের নিকট হীন হইলেও তাঁহার নিকট উহা জাতীয় পেশা। জাতীয় পেশা কখনও হীন হইতে পারে না। তিনি আপন পেশাই যত্নপূর্বক শিখিয়া তাহাতে বিশেষজ্ঞ হইলেন। এই পেশা দ্বারা যাহা উপার্জন করিতেন তাহা সামান্য হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং তাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। যৌবনে হাওয়া নামক স্বজাতীয় কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া সংসারী হইলেন। হাওয়া তাঁহাকে যথাকালে চারিটি সন্তান উপহার দিলেন। দাদূর বাল্য জীবনের ঘটনা বিশেষ জানা না গেলেও সামান্য আয়ে যে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং তীব্র কঠোরতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দারিদ্র্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব এবং সুপ্ত গুণরাজির বিকাশে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও হয়। স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিত্ব এবং জন্মগত শুভ সংস্কার খুব প্রবল হইলে ভগবৎ কৃপায় পর্বতপ্রমাণ বাধাও অপসারিত হয় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় ফুলফলরাজিতে শোভিত হইয়া চারিদিকে সুবাস ছড়াইয়া আপনাকে প্রকাশ করে।

একদিন কুটিরে বসিয়া দাদূ খুব মনযোগের সহিত আপন কাজ করিতেছেন। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে এক শক্তিশালী পুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটিল। তিনি আর কেহ নন প্রসিদ্ধ সাধক কবীরের পুত্র কামাল। কবীর হইতে কবীর পন্থীর উদ্ভব। পিতৃধারায় বর্ধিত কামালও ধার্মিক এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণ-সম্পন্ন পুরুষ। কোন কারণবশতঃ দাদূর কুটিরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন।

তখন বর্ষাকাল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া কামাল কুটির দ্বারে থামিলেন। হঠাৎ অতিথি দেখিয়া দাদূ তাঁহাকে ভিতরে আসিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু কামাল ভিতরে ঢুকিলেন না। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও অতিথি ঘরে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া দাদূ ভাবিলেন হয়ত নীচ জাতীয় সামান্য মুচি বলিয়া অশুচি হইবার ভয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেছেন না। অন্ত্যজ বলিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। দাদূ ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। তবুও কামাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার মনে অন্য ভাব। অশুচি হইবার ভয় তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র ছিল না। দাদূ দুঃখিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কামাল সরল ভাবে বলিলেন, 'দাদূ, আপনি আপন মনে কাজ করিতেছেন। সামান্য অর্থ উপার্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে আপনি কাজ বন্ধ করিয়া আমার অভ্যর্থনায় মন দিবেন। কথাবার্তায় আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হইবে, আয়ের মাত্রা কমিয়া যাইবে, আপনাকে কষ্টে পড়িতে হইবে। অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া আপনাকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া ঘরে প্রবেশ করি নাই। আশা করি আপনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না।' কামালের কথা শুনিয়া দাদূর অভিমান দূর হইল। সাহস পাইয়া ভিতরে আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। অবশেষে কামাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার জন্য সামান্য এক টুকরা চামড়া ব্যতীত অন্য আসন নাই। দাদূ তাহাই দিলেন। দাদূর অভ্যর্থনার মধ্যে যে সরলতা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কামালের মনে গভীর রেখাপাত করিল। সামান্য টুকরা চামড়ার আসন গ্রহণ মাত্রেই তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। মুগ্ধ নেত্রে দাদূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চোখ দিয়া অনর্গল প্রেমধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ গভীর ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকার পর কামালের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরের জগতে ফিরিয়া আসিলেন। ভাবান্তরের কারণ কি—দাদূর এই প্রশ্নের উত্তরে কামাল জবাব দিলেন যে দাদূ যেমন সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া কর্মে রত থাকেন তিনি নিজে সে রকম সমস্ত মান প্রাণ দিয়া ভগবৎ ধ্যানে ও সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন না, এইজন্যই তাঁহার ক্ষোভ হইয়াছে এবং চোখ দিয়া ধারা বহিতেছে। কামাল আরও বলিলেন, 'ভগবান সকলেরই। কোন ব্যক্তিবিশেষ, সমাজবিশেষ কিংবা জাতিবিশেষের নয়। তিনি প্রেমময়। ভক্তকে আকর্ষণ করেন। ভক্তের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, খেলিবার জন্য তিনি সব সময়ে

আগ্রহান্বিত। তিনি ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। উহা তাঁহার বৈঠকখানা। যাঁহার হৃদয় পবিত্র, যিনি সরল অন্তঃকরণে তাঁহাকে কাতর প্রার্থনা জানান, শরণাগত হইয়া তাঁহার দুয়ারে পড়িয়া থাকেন তিনি ভগবানের পদপ্রান্তে স্থান পান। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ভক্তের মধ্য দিয়া তাঁহার লীলা এবং মহত্ত্ব প্রকট হয়।'

ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ বপন সফল হয়। অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া সময়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। কামালের কথাগুলি দাদূর হৃদয়ে নূতন আলোড়ন আনিল। উহা যেন অনন্তের ডাক 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ'। ভগবান যেন গুরুরূপে তাঁহার মুখ দিয়া ইষ্টের কথা শুনাইলেন। দাদূর পক্ষে শুভ মুহূর্ত উপস্থিত। সদ্‌গুরুর কৃপাই সাধকের মুক্তির দ্বার। কামালের মধুর বচনে দাদূর অন্তরস্থ সুপ্ত প্রেমের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইল, জগৎ অনিত্য বোধ হইল। অন্তরের ডাক তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল, মহান্ আত্মার সংস্পর্শে অন্তরের সুপ্ত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইল। আধ্যাত্মিকতার দ্বার খুলিয়া গেল। সংসার বাসনা পুড়িয়া ছাই হইল। দাদূ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া বারাণসীতে আসিয়া ⱽবিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ এবং অনেক মন্দির দর্শন করিলেন, বহু সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা বিশেষত নাথ সম্প্রদায়ের যোগ সাধনার প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন।

কঠোর সাধনায় অনেক দিন কাটাইলেন; ভগবৎ কৃপায় তপস্যার ফল ফলিল। সিদ্ধপুরুষ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইল। নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া খুব সম্মান দেখাইতেন। তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়া তিনি বহু দেশ ঘুরিয়াছেন। বাংলা দেশের যোগী সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাধনা তাঁহাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তীর্থ পরিক্রমা শেষ হয় নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি রাজপুতানার নিকট সম্বর নামক স্থানে আসিয়া গভীর তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। তিনি কখনও অন্যের উপর নির্ভর করিতেন না। নিজ শারীরিক শ্রমে উপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ করিতেন। সদা ভগবৎ বিশ্বাসী ভক্ত। সবই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিতেন। তিনি বলিতেন, 'রামনাম আবার নিত্য খাদ্য, পেশা, জীবন ধারণের উপকরণ, তাঁহার কৃপাতেই আমি সব করি, বাঁচি, খাই। তিনি আমার সব।'

দাদূ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। হিন্দুর মন্দির এবং মুসলমানের মসজিদ উভয়ই তাঁহার

সম্মানের পাত্র। হিন্দুর মন্দিরে যে ভগবানের পূজা হয় মুসলমানের মসজিদে সেই ভগবানেরই পৃথক্ নামে প্রার্থনা হয়। ভগবান ও আল্লা পৃথক নন। দাদূর মতে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, জল সকলেই তাঁহাকে সেবা করে। তিনি প্রতি জীবেই বর্তমান। জীবের মধ্য দিয়াই তাঁহার সেবা হয়। সকলেই তাঁহার সেবক। সেবা কোন বিশিষ্ট জাতের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। সকলের সেবার অধিকার আছে। তীর্থভ্রমণকালে গুজরাট অঞ্চলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভজনের জন্য বিশেষ রকমের বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া তিনি আকৃষ্ট হন। ভজনের সময় ঐ রকম বাদ্যযন্ত্র তিনি নিজের মণ্ডলীতে ব্যবহার করিতেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভজন বেশ জমিত। একদিন এক উৎসব উপলক্ষে ঐ যন্ত্র-সহায়ে ভজন গাহিবার সময় বিখ্যাত গায়ক বকনা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ভক্তি-প্রেমে মুগ্ধ হন। যতই দাদূর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইল ততই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বকনা প্রধান ভক্ত রূপে পরিগণিত হইলেন।

কঠোর তপস্যার ফলে অনেক অলৌকিক শক্তি আসে। দাদূর মধ্যেও ঐ রকম শক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছে। রাজস্থানে থাকিবার কালে একবার অনাবৃষ্টি হয়। ফসল জন্মিতে পারে নাই। অনাহারে লোকের ভীষণ কষ্ট আরম্ভ হইল। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, স্থানীয় লোকেরা দাদূকে ধরিল যে তিনি যেন সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি ভগবৎ-ভক্ত, মহাপুরুষ, ভগবান তাঁহার প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনিবেন। ভগবানের কৃপায় প্রবল বৃষ্টি হইবে, ভাল ফসল হইবে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া হইতে লোকে রক্ষা পাইবে। দাদূর দয়ার শরীর। তাঁহার প্রার্থনায় ফল ফলিল। লোকের কষ্ট দূর হইল। অন্য এক সময়ে এক বিরাট্ উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক সমাগম হইয়াছে। খাদ্যের টানাটানি পড়িবার সম্ভাবনা। সমবেত লোকদের প্রসাদ দিতে না পারিলে অত্যন্ত দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে দাদূকে ধরিয়া বসিল যে তিনি যেন এই বিপদ হইতে রক্ষা করেন। যাহা রান্না হইয়াছিল দাদূর ইষ্টকে নিবেদন করা হইল। পরে দেখা গেল নিবেদিত অন্ন এত প্রচুর হইয়াছে যে সমবেত লোকদের খাওয়াইয়াও অবশিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। সাধারণ প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করিয়া তিনি বলিতেন যে ভগবান সূচ, তাঁহার ধ্যান সূতা। মানব দেহ সেলাই করিবার জন্য জীর্ণ বস্ত্র বিশেষ। যোগীরা জন্মে জন্মে ঐ সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন।

রাজস্থানে অম্বর নামক স্থানে থাকিবার কালে তাঁহার সুনাম এবং অলৌকিক

শক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিল্লীর বাদশা আকবরের কানে পৌছিলে তিনি মহাপুরুষকে দিল্লীতে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। আমন্ত্রণে জানাইলেন যে তিনি (দাদু) রাজধানীতে দয়া করিয়া আসিলে তিনি (সম্রাট আকবর) অতিশয় সুখী হইবেন। দূত মারফৎ তিনি (দাদু) জানাইলেন যে তাঁহার নিজে দিল্লী যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। গেলেও হয়ত বাদশা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। সুতরাং না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। অবশেষে স্থির হইল দিল্লীর বাদশা আকবর দাদুকে দেখিবার জন্য ফতেপুর সিক্রি আসিবেন এবং দাদুও রাজস্থান হইতে ফতেপুর সিক্রি যাইবেন। নির্দিষ্ট দিনে উভয়ের মিলন হইল। ধর্মবিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যে চল্লিশ দিন যাবৎ আলোচনা চলিল। আলোচনায় অতিশয় প্রীত হইয়া বাদশা তাঁহাকে মূল্যবান জিনিস উপহার দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দাদু ত্যাগী। কোন জিনিসে তাঁহার প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার উপহার গ্রহণ করিতে তিনি রাজী হইলেন না। দাদু জয়পুরে (অম্বরে) থাকিতেন বটে কিন্তু জয়পুর মহারাজের সঙ্গে তাঁহার কখনও দেখা হয় নাই। অম্বর, মারাবার, বিকানীর প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন কাটাইয়া তিনি নারায়ণপুর চলিয়া আসেন।

দাদুর শিষ্যবর্গের মধ্যে সন্ন্যাসী, নাগা, গৃহস্থ ছিল। হিন্দু শিষ্যগণ তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা জনকল্যাণে প্রচার করিবার জন্য সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। জনৈক মুসলমান শিষ্যও অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া মুসলমান সমাজে প্রচার করিলেন। তাঁহার শিক্ষার মূল বিষয় ছিল ভগবৎ প্রেম এবং ভক্ত হইতে প্রেমাস্পদের বিরহ। যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার মন ততই বিষয়বিমুখ হইয়া ভগবৎমুখী হইল। মনকে অধিকাংশ সময় ভগবৎ-ধ্যানে নিযুক্ত রাখিতেন। দেহ প্রয়াণের পর তাঁহার দোঁহাবলী লোক-সমাজে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। ১৬০৬ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি বহু দেশ হইতে সমাগত শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং প্রেমের গভীরতা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহা মনকে আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, 'এ দেহই শাস্ত্র এখানেই প্রেমময় ভগবান আমার জন্য তাঁহার বাণী রাখিয়াছেন। ঐ বাণী গভীর অর্থপূর্ণ।' 'যখন বুদ্ধির প্রখরতা থাকে তখন বাক্যের ছটা খুব বাড়ে কিন্তু যখন ভগবৎ সত্তা অনুভব হয় তখন প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে গান গাওয়া হয় এবং ঐ গানের আসর বেশ ভাল জমে।' 'যখনই সৃষ্টির সৌন্দর্যের দিকে তাকাই তখনই তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য দেখি, যখনই তাঁহাকে প্রাণ স্বরূপে অনুভব করি তখন সবই প্রাণময় বোধ হয় কিন্তু যখন তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করি তখন প্রকাশের ভাষা পাই না।'

দাদুর বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়। যখন তাঁহাকে সম্বন্ধ-যুক্ত ভাবি তখন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেখি যে সব গোল পাকিয়া যায়। যখন নিজ আত্মার দিকে তাকাই তখন সব পরমাত্মার সৌন্দর্যে ডুবিয়া যায়। তখন আমার চক্ষু ব্রহ্মার চক্ষুতে মিশিয়া যায়। পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করি। তখনই সত্য উদ্ভাসিত হয়। তিনি মৃত্যু নন, জীবনও নন, বাহিরে যান না, ভিতরেও যান না। ভিতর বাহির এক হইয়া যায়। তিনি জাগ্রত হন না, নিদ্রাও যান না, তাঁহার কোন অভাব নাই, ভাবও নাই। তিনি দুঃখী নন সুখীও নন। তুমি আমি কোনটাই তিনি নন, তিনি একাও নন দুইও নন। কখন কখন মনে করি আমরা এক আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমরা দুই। আবার কখন কখন মনে করি আমরা দুই আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমরা এক। সুতরাং হে দাদু তাঁহার মহত্ত্ব ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাক। তিনি সদা অন্তরে বিদ্যমান। বৃথা চিন্তা এবং বাক্য ব্যয় করিয়া লাভ নাই।'

॥ চৌদ্দ ॥

রামানন্দ

মহাপুরুষের হৃদয় ভক্তির মন্দাকিনী। দেশ-দেশান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী যেমন উভয় কূলে নূতন পলিমাটি ছড়াইয়া জমি উর্বর করে এবং প্রচুর শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাঁহাদের ত্যাগ-তপস্যা, ভাব-ভক্তিও সেরূপ মানুষকে পবিত্র করে, মনে ধর্মের প্রেরণা জাগায়, হৃদয় উন্নত করে, প্রাণে শক্তি আনে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী দেয়। দক্ষিণ ভারতের নায়নার, আলোয়ার, রামানুজ, মাধ্বাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ যে ভক্তির বন্যা বহাইয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভক্ত উহাতে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উহার প্রবল বেগ দক্ষিণ দেশ ছাপাইয়া ক্রমশঃ উত্তরাখণ্ডেও ছড়াইয়াছিল। যিনি লোককল্যাণ মানসে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় ঐ স্রোত উত্তর ভারতে আনিয়াছিলেন তিনি যে শক্তিশালী মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। একটা শক্তিশালী ধর্মসঙ্ঘ গঠনে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের প্রবল ভক্তি-বন্যার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া তিনি উত্তর ভারতের সমাজের প্রতি স্তরে উহার উর্বর পলিমাটি ছড়াইয়া জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁহার উদার মনোভাব সমাজে গভীর রেখাপাত করিয়া

ধর্মজগতে নূতন জাগরণ আনিয়াছে। যিনি এই মহৎ কাজ করিয়াছেন তাঁহার নাম স্বামী রামানন্দ। তিনি রামানন্দী সম্প্রদায়ের স্রষ্টিকর্তা। মধ্যযুগের বহু উত্তর-সাধক তাঁহার চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া মহাপুরুষ হিসাবে পূজা সম্মান পাইয়াছেন। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের স্রষ্টা মহামতি কবীর তাঁহার প্রধান শিষ্য। রামচরিত মানস গ্রন্থ রচয়িতা তুলসীদাস, শিখধর্ম প্রবর্তক গুরু নানক, দরদী মরমিয়া দাদু, বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় উত্তর ভারতের প্রায় সকলের মধ্যে তাহার প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। কেহ এড়াইতে পারেন নাই।

বহুকাল হইতে প্রয়াগ হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ইহা গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী (গুপ্ত)র সঙ্গম স্থান, এখানে ১২ বৎসর অন্তর পূর্ণ-কুম্ভ, ছয় বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ এবং প্রতি বৎসর শীতকালে মাঘমেলা হয়। পূর্ণ-কুম্ভের সময় লক্ষ লক্ষ সাধু, ভক্ত গৃহস্থ, অর্ধকুম্ভের সময় হাজার হাজার লোক সঙ্গমে স্নান করিয়া ধন্য হন। অনেক ভক্ত 'মাঘে প্রয়াগে' শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া কল্পবাস করেন এবং কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। সুতরাং তীর্থস্থান হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। ইহারই নিকটে মালকোট নামক স্থান এককালে শৈব সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে উহার অধিকাংশ লোক রামানুজ প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করাতে উহা বৈষ্ণব শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। প্রবন্ধোক্ত রামানন্দ স্বামী উক্ত মালকোটে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পুণ্যসদন ধার্মিক, শাস্ত্রবিদ্, মাতা সুশীলাও স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী। শুভলগ্নে বালকের জন্ম। পিতামাতা আদর করিয়া নাম দিয়াছেন রামদত্ত। ব্রাহ্মণ সন্তান। দশবিধ সংস্কারের অন্যতম উপনয়ন সংস্কার যথাসময়ে হইয়া গেলে বালককে স্থানীয় সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে বিদ্যার্জনের জন্য পাঠান হইল। তাহার অসাধারণ মেধাশক্তি প্রতিভা সতীর্থ, অধ্যাপক এবং প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অনেক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়ের ধারণা হইল বালক দৈবী-শক্তিসম্পন্ন। তাঁহারা পুণ্যসদনকে পরামর্শ দিলেন যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রধান কেন্দ্র বারাণসীতে পাঠাইলে বালক কালে মহান্ হইবে সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুক্কায়িত। সুপ্ত শক্তির স্ফুরণ হইলে সে পিতা, মাতা, বংশ গ্রাম এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। পুত্রের কৃতিত্বে পিতামাতার কৃতিত্ব পিতা পুণ্যসদন এবং মাতা সুশীলাও যে কৃতি সন্তানের সাফল্য গৌরব অনুভব করিবেন ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। কিন্তু কোমলমতি পুত্রের বয়স বিবেচনা করিয়া তাহাকে দূরদেশে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বিশেষত মায়ের

স্নেহনীড় হইতে পুত্রকে দূরে রাখিলে অযত্নে বালকের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটিতে পারে এবং মায়ের মনে ভীষণ আঘাত লাগিতে পারে এ আশঙ্কাও ছিল। এ আশঙ্কা অমূলক নয়, তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে পিতাকে মত পরিবর্তন করিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্য নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে প্রতিভাদীপ্ত বালক যখন শাস্ত্রের বহু কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিল তখন তাহাকে শুধু স্নেহের খাতিরে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা তাহার প্রতি শত্রুতা করারই সামিল। তাহার স্ফুরণোন্মুখ বিপুল শক্তিকে রোধ করিয়া পিতা, মাতা, প্রতিবেশী, দেশ এবং সমাজের মুখে ছাই দেওয়া হইবে। কর্তব্যের খাতিরে পিতা পুণ্যসদন সব চিন্তা দূর করিয়া পুত্র রামদত্তকে উচ্চশিক্ষার্থে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে পাঠাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মায়ের স্নেহনীড় ছাড়িয়া বালক রামদত্ত বারাণসী আসিল। সংস্কৃত টোলে অভিজ্ঞ আচার্যের নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করিল। বালকের অপূর্ব মেধা, ভগবৎ ভক্তি, চাল-চলন, অমায়িক ব্যবহার, আচার্যের প্রতি নিরলস অকুণ্ঠ সেবা দেখিয়া আচার্য অতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসূচী, যথা, প্রাতে গঙ্গাস্নান, ভগবৎ ধ্যান, স্তব পাঠ, শাস্ত্রাধ্যায়ন, বিগ্রহ সেবার জন্য বাগান হইতে পুষ্পচয়ন ইত্যাদি উচ্চ বৃত্তি দেখিয়া আচার্য বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। এমন একটা ঘটনা এই সময়ে ঘটিল যাহা তাহার জীবনে পরিবর্তন আনিল। রামদত্ত যেখানে থাকিয়া আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিত তাহার নিকটে একটা বৈষ্ণব আখড়া ছিল, সেখানে একটা চমৎকার ফুলের বাগান ছিল। রামদত্ত সেই বাগানে নিত্য পূজার ফুল তুলিতে যাইত। খুব ভোরে যাইত বলিয়া অনেকে তাহাকে দেখিতে পাইত না। ঠাকুর সেবার জন্য ফুল সংগ্রহ করা তাহার কর্তব্য। সে তাহার কর্তব্য পালন করিত। অন্যের বাগান হইতে এই ভাবে ফুল সংগ্রহ করা যে দোষের ইহা তাহার মনে হইত না। একদিন ফুল তুলিতে গিয়া রামদত্ত ধরা পড়িল। ফুল চুরি করিতেছে বলিয়া আখড়ার লোক অভিযোগ করিলে নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য বালক সাহসের সহিত বলিল যে ঠাকুর সেবার জন্য ফুল তোলা দোষের নয়, এমন কি মালিকের অনুমতি না নিলেও দোষের হয় না। বালক উক্ত লোকের সহিত তর্ক করিতেছে এমন সময় বাগানের মালিক স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন, দেওয়াল টপকাইয়া পলাইয়া যাইবে সে উপায় নাই। তখন বালক মালিকের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। মালিক আর কেহ নন, স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ।

তিনি মঠের অধ্যক্ষ, পণ্ডিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্‌, দূরদর্শী আচার্য। তিনি বালকের অপরাধ নেন নাই, ক্ষমা করিয়াছেন। তাহার মুখ, চোখ, নাক, কপাল দেখিয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন যে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাহার দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বালককে অভয় দিলেন। সে কোথায় থাকে, কি পড়াশুনা করে, কোন্‌ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করে ইত্যাদি সব খবর নিলেন। বালকের কপালের একটা চিহ্ন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বুঝিলেন বালক অল্পজীবী, তাহার মঙ্গল কামনায় বলিলেন, 'তুমি স্মৃতিশাস্ত্র এবং টীকাদিসহ অন্যান্য শাস্ত্র পড়িতেছ ভাল কথা কিন্তু এই বিদ্যা তোমার কোন কাজে লাগিবে না। তোমার প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে। ভগবানকে ডাক, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর। তাঁহার জন্য জীবন সঁপিয়া দেওয়া, তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক। তাহা হইলে হয়ত রক্ষা পাইতে পার, তিনি দয়াময়।' বালককে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভগবৎ নির্দেশেই যেন তাহাকে বলিতেছেন, 'তোমার অধ্যাপককে শীঘ্রই আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।' অধ্যাপক জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বালক রামদত্ত যে স্বল্পায়ু তিনি জানিতেন, তাহার জীবন রক্ষার কোন উপায় করিতে পারিলে ভাল হয় বুঝিতেন কিন্তু তিনি নিরুপায়। কোন প্রকার প্রতিকার তাঁহার জানা নাই। স্বামী রাঘবানন্দকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'বালকটি যাহাতে বাঁচে তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি বালকের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া যোগশক্তি প্রভাবে তাহার জীবন রক্ষা করুন।'

ইহার পর স্বামী রাঘবানন্দ রামদত্তের ভার লইলেন। তাহাকে দীক্ষা দিলেন এবং নূতন নাম দিলেন স্বামী রামানন্দ। রামদত্ত রামানন্দ স্বামী হইলেন। দীক্ষার পর তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। বিপদও কাটিয়া গেল। যোগশক্তি প্রভাবেই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক অল্পায়ু রামদত্ত মৃত্যুযোগ এড়াইয়া স্বামী রামানন্দ হিসাবে দীর্ঘায়ু হইয়া সমাজ ও ধর্মের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ প্রবর্তিত ভক্তিভাব জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈয়ার করিতে হইলে রামানুজ দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা দরকার। সেইজন্য রাঘবানন্দ স্বামী শিষ্যকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কয়েক বৎসর ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা দিলেন। রামানন্দ স্বামীও উহার মূল তত্ত্ব ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, তাহাদের সম্বন্ধ, জগতে ধর্মের স্থান, বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় খুব আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিলেন। অতিশয় মেধাবী বলিয়া উহা

আয়ত্ত করিতে তাঁহার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই। শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্যান, জপ, পূজাদিতেও আপনাকে নিবিষ্ট রাখিতেন।

শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতা পরীক্ষার জন্য একদিন গুরু রাঘবানন্দজী শিষ্যকে আরও কঠোর জীবন যাপন করিতে বলিলেন। উপদেশ-ছলে বলিলেন, পরিব্রাজকের জীবন কঠোর। পরিব্রাজক হইয়া তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। যতই ভ্রমণ করা যায় ততই ইহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ ভ্রমণ দ্বারা সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, আত্মবিশ্বাস জন্মে, ভগবৎ নির্ভরতা বাড়ে, সাধু জীবন উন্নত হয়, জ্ঞান ভক্তি সাহস বাড়ে, প্রচার কার্য প্রসার লাভ করে। কয়েক বৎসরের সাধনায় রামানন্দ ধুরন্ধর পণ্ডিত হইয়াছেন। পাণ্ডিত্য, ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য খুব জনপ্রিয় হইয়াছেন। এখন গুরুর আদেশে সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিলেন। উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে গুজরাট এবং পূর্বে সাগর সঙ্গম তীর্থ দর্শন করিলেন। আধুনিক কালের মত তখন রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথের কষ্ট থাকিলেও ভ্রমণের আনন্দ ছিল। এখন ভ্রমণের আরাম আছে, তীর্থযাত্রার তৃপ্তি নাই। নানা কারণে তীর্থের তীর্থত্ব মনে বেখাপাত করে না। পরিব্রাজক রূপে তীর্থভ্রমণকালে তিনি খুব কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বদরীনাথে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্থানমাহাত্ম্যে মন গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলে মনে নূতন নূতন অনুভূতি আসিল। সাগর তীর্থেও অনুরূপ অনুভূতি হইল। এখানে ভগবৎ চিন্তায় মন এত বিভোর ছিল যে তিনি ভাবাবস্থায় কপিল মুনির সাধন পীঠ আবিষ্কার করিলেন। অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেখানে অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশে মন্দির নির্মাণ করিয়া বিগ্রহের সেবা পূজার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত স্থান এখন প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। পৌষ সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত পুণ্যার্থী যাত্রী সমুদ্রে স্নান করিয়া ধন্য হয়।

কয়েক বৎসর কঠোর তপস্যা এবং তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া রামানন্দ স্বামী গুরুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। গুরু রাঘবানন্দ স্বামী বহুদিন পরে প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। স্নেহের বশেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে উপযুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার উপর আশ্রমের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন বলিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু মানুষের সংকল্প সব সময় কাজে ফলে না। বিকল্প হইয়া যায়। মানুষ এক ভাবে আর হয়। নিয়তিই সব চালান। নিয়তির উপর কাহারও হাত নাই। ক্ষমতার লোভে মত্ত হইয়া কয়েকজন গুরুভাই রামানন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে

লাগিলেন। গুরু রাঘবানন্দের সঙ্কল্প বানচাল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। ক্ষমতার লড়াই যে শুধু সাধারণ লোকের মধ্যে বর্তমান তাহা নয়। যাঁহারা অসাধারণ হইবার উদ্দেশ্যে সাধারণের গণ্ডী পার হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন তাঁহারাও ইহার হাত এড়াইতে পারেন না। গৃহস্থদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দোষের নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আত্মরক্ষার্থ উহা কখন কখন সমর্থন করা চলে। কিন্তু যাঁহারা জগৎ অনিত্য বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমতার লড়াই শুধু দোষের নয়, ভয়ানক মারাত্মক। সাদা কাপড়ে কালির দাগ অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। ইহাতে ত্যাগের মহিমা খর্ব হয়। ত্যাগের চেয়ে ভোগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়। ফলে শুধু নিজের নয় সমাজেরও অনিষ্ট হয়। বৈষ্ণব মতে খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে সব সময়ে আশ্রয় দোষ, নিমিত্ত দোষ এবং স্পর্শ দোষ পরিহার করিয়া চলিতে হয়। রামানন্দের গুরুভাইদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি (রামানন্দ স্বামী) বৈষ্ণব রীতিনীতি সঠিক পালন করেন নাই। এইজন্য বৈষ্ণব সমাজে তিনি সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। আশ্রমের অধ্যক্ষ হইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। সেজন্য তিনি মোহান্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ঈর্ষার মূল কারণ অক্ষমতা, সঙ্কীর্ণতা, উদারতার অভাব। অন্যদিকে রামানন্দ স্বামী ছিলেন উদার, পুরাতন একদেশীভাব, গোঁড়ামি পরিহার করিয়া বৈষ্ণব সমাজে যুগোপযোগী নূতন ভাব প্রবর্তনের পক্ষপাতী। জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু জগতে উদারতার আহ্বান নাই। সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেওয়া আছে। সঙ্কীর্ণ মনোভাবের জন্য পুরস্কার মিলে আর উদার মনোভাব পোষণের জন্য মিলে কঠোর শাস্তি। স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত দুঃখে বলিয়াছিলেন, 'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়'। রামানন্দ স্বামীরও তাহাই হইল। তিনি আশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইলেন। সংগঠন শক্তি, উদারতা, আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠার জন্য গুরু রাঘবানন্দ তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিলেও তিনি একটা বিষয়ে খুব সর্তক ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের চির আচরিত ধারা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। রামানন্দ গদিতে বসিলে উহা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া তিনি অনন্যোপায় হইয় তাঁহাকে আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উদার সম্প্রদায় গঠন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

গুরুর আশীর্বাদ সফল হইয়াছে। আশ্রম ত্যাগ করিবার পর কিছুদিনের মধ্যে রামানন্দ স্বামী স্বীয় উদার মত প্রচার করিয়া, নূতন সম্প্রদায় গঠন করিলেন।

উহা রামানন্দী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইল। অল্পদিনের মধ্যে উহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। তিনি ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ভক্তির উপর খুব জোর দিতেন। শাস্ত্রাদি খুব ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া নিজ মতবাদের অনুকূলে শাস্ত্রের যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে সহজে নিরস্ত করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট তাঁহারা টিকিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিতেন। রামানন্দ স্বামীর অভিমত ছিল, 'ভগবানের নিকট জাতিভেদ নাই। যিনি তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় নেন, নিরন্তর ভগবৎ ধ্যানে এবং সেবায় নিযুক্ত থাকেন আশ্রিতবৎসল ভগবান তাঁহাকে আশ্রয় দিবেনই। যিনি এই উদারভাব পোষণ করেন তিনি এই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন। এখানে ছোট বড় ভেদ নাই।' তিনি খাদ্য, পানীয় সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নিয়ম তুলিয়া দিলেন। পূর্বাচার্যগণের জাতিভেদ প্রথা রহিত করিলেন। সকলের জন্য সম্প্রদায়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেন। ইহার ফল ভালই হইল, পূর্বে যাহারা নির্যাতিত হইয়া মনে করিত ভগবানের দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ তাহারা এখন নূতন আলোর সন্ধান পাইল। রামানন্দ স্বামীর প্রচারের ফলে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হইল, তাহারাও ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট, তাহাদেরও ধ্যান, পূজা, সেবার অধিকার আছে; চাঁদা মামা সকলের মামা। তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, এতকাল না জানিয়া সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। এখন আর থাকিতে প্রস্তুত নয়। দলে দলে লোক তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল।

শ্রীরামচন্দ্রই তাঁহার উপাস্য। তিনি নামজপের উপর খুব জোর দিতেন। ভগবানের নামে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ তাঁহার কৃপায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। তাঁহার মেধা, ব্যক্তিত্ব মানুষকে মুগ্ধ করিত। অবিশ্বাসী, নাস্তিকের মুখ বন্ধ হইত। তিনি কথ্য ভাষায় প্রচার করেন। তাঁহার প্রভাব শিষ্য সুখানন্দ এবং কবীর প্রভৃতির কার্যে প্রকাশ পায়। সমাজের নানা স্তরের লোক তাঁহার সঙ্ঘে যোগদান করিতে লাগিল। কবীর মুসলমান জোলা পরিবার হইতে, ধনানন্দ জাট পরিবার হইতে, রুইদাস মুচি পরিবার হইতে, সেনানন্দ নাপিত কুল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা এক একজন মহারথী, গুরুর উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। রাজপুতানার অন্তর্গত এক স্থানীয় রাজা পিপাজী বিলাসে গা ডুবাইয়া বিপথে চলিতেছিলেন। স্বপ্নে কুলদেবতার আদেশ পাইয়া রামানন্দ স্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। শিষ্যের গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি পিপাজীকে নিকটস্থ কুয়ায় ঝাঁপ দিতে আদেশ করিলে পিপাজী ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন এমন সময় রামানন্দ স্বামীর ইঙ্গিতে অন্যেরা

তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিলেন। সন্তুষ্ট হইয় তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। নাম দিলেন পিপানন্দ।

গুরু রাঘবানন্দের আশীর্বাদে রামানন্দ স্বামী নূতন বৈষ্ণব সমাজের নায়ক হইলেন। ১৪১০ সালে ১১১ বৎসর বয়সে তিনি অসংখ্য ভক্ত, শিষ্যদের কাঁদাইয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার তিরোধানে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল।

॥ পনেরো ॥

রামানুজ

স্বপ্ন সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখে, চিন্তা করে তাহাই স্বপ্নে দেখে। আবার জাগ্রত হইয়া দেখে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং স্বপ্ন মিথ্যা। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বপ্ন যে সব সময় মিথ্যা হইবে তাহা বলা চলে না। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় বাস্তবে ঘটিতে দেখা যায়। যে স্বপ্ন জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আনে তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ দেবস্বপ্ন মিথ্যা হয় না। সুতরাং স্বপ্নও সত্য। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাদ্রাজ হইতে কাঞ্চিপুরম্ যাইতে পথে শ্রীপেরমবুদুর পড়ে। দূরত্ব ৩৩।৩৪ মাইল হইবে। উহা মহাপুরুষের জন্মে ধন্য হইয়াছে। আসুরী কেশবাচারী এই স্থানের অধিবাসী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধর্মপরায়ণ। কিন্তু অপুত্রক। কালি মাতীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে অনেকদিন গত হইয়াছে, এখনও পুত্রমুখ দেখেন নাই। গৃহস্থের পক্ষে অপুত্রক থাকা কত দুঃখজনক তাহা তিনিই বুঝেন। এমন কি দরিদ্র পিতামাতাও পুত্র কামনা করেন। পুত্রই পিণ্ড দান করিয়া পুৎ নামক নরক হইতে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করে। পিণ্ডের আশায় দুর্বিনীত পুত্রকেও পিতামাতা স্নেহধারায় সিঞ্চন করেন। একদা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে উক্ত আসুরী কেশবাচারী পবিত্র তীর্থ কৈরাবিনি নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। স্নানান্তে নিকটস্থ পার্থসারথির মন্দিরে পূজা দিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি দয়া করিয়া অন্তত একটা সৎ পুত্র দান করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করেন। ভক্তের কাতরতায় দেবতা প্রীত হইয়া স্বপ্ন দিলেন, তাঁহার (আসুরী

কেশবাচারীর) এক পুত্র-সন্তান জন্মিবে। আরও আশার বাণী শুনাইলেন যে পুত্র অত্যন্ত ধার্মিক এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইবে, ধর্মজগতে নূতন আলোড়ন আনিবে। ভক্তির প্লাবনে দেশ ভাসাইবে।

দৈব স্বপ্ন সত্য হইল। এক বৎসরের মধ্যেই ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ভক্ত আসুরী কেশবাচারী পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। নবজাত শিশু পিতামাতার আনন্দ বর্ধন করিল। এই শিশুই কালে রামানুজাচার্য নামে বিখ্যাত হইলেন। ধর্মজগতে নূতন আলো আনিলেন। তাঁহার প্রভাব দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তরাখণ্ডেও বিস্তার লাভ করিল। বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির যে বন্যা তিনি বহাইলেন তাহার প্রভাব পরবর্তীকালে নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এড়াইতে পারেন নাই। ধর্মের দুইটি চিন্তাধারা তাঁহার মধ্যে সমভাবে প্রবাহিত। প্রথমটি জ্ঞান কর্মের, দ্বিতীয়টি ভক্তির ধারা। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রথমটি পিতার নিকট হইতে এবং দ্বিতীয়টি মাতার নিকট হইতে পান। মাতার ভক্তি এবং উদারতা তাঁহার রক্তে মিশিয়া তাঁহাকে নূতন প্রেরণা দিয়াছে।

কাঞ্চিপুরম্ দক্ষিণ দেশের বারাণসী। এখানে বহু মন্দির। শিবকাঞ্চিতে শিব এবং কামাক্ষী দেবী ও বিষ্ণুকাঞ্চিতে বরদরাজনের মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। বরদরাজন বিষ্ণুমন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা, পুন্নামেলির কাঞ্চিপূর্ণ (অপর নাম তিরুকাচি নাম্বি) বরদরাজনের বিশেষ ভক্ত। জাতিতে শূদ্র কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস এবং চরিত্রের মাধুর্যে তিনি লোকের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতিভাদীপ্ত রামনুজ ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন। প্রীতির সম্বন্ধ সমাজ-বাধা মানে না। ভক্তির বন্যায় সব ভাসিয়া যায়, জাতি বিচার শিথিল হয়। ভক্তেরও জাত নাই। অন্ত্যজ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলে যে ভক্তিলাভের অধিকারী হইবে না এমন কোন আইন নাই। ভক্তিই মানুষকে দেবতা করে। বিষ্ণুভক্ত তিরুপ্পন আলোয়ার নীচ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াও মহাপুরুষ হিসাবে উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণদের পূজা পাইয়া থাকেন। জন্ম ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ভক্তিই মহত্বের মাপকাঠি, জন্ম নয়। এই অন্ত্যজ ভক্ত কাঞ্চিপূর্ণকে সেবা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন রামানুজ তাঁহাকে নিজ বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। রামানুজের সরলতা, ভক্তি এবং প্রতিভা কাঞ্চিপূর্ণকে এমন আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে রামানুজ সামান্য বালক নয়, ছাইচাপা আগুন। কালে ইহার স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইবে। রামানুজ অল্পবয়সে বিবাহ করেন। ভাগ্যে তখন

সর্দা আইনের প্রচলন হয় নাই তাই ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করিবার সময় কোন প্রকার গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু গোলযোগ এক দিক হইতে না হইলেও অন্য দিক হইতে আসিয়াছে। বিবাহের অনতিকাল পরে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে বিপর্যয় ঘটিল। সংসারের আনন্দ ভাসিয়া গেল।

যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবেদান্তের খ্যাতনামা পণ্ডিত রামানুজ তাঁহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ছাত্রের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, প্রতিভা এবং ভগবৎ ভক্তি অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু ক্রমশঃ অধ্যাপক-ছাত্রের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ শিথিল হইল। একদা স্থানীয় রাজার কন্যার ভূতাবেশ হয়। মন্ত্র উপচারাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও আমন্ত্রিত অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ অকৃতকার্য হন, কিন্তু একই সভায় উপস্থিত ছাত্র রামানুজ নিজ চরণ ভূতাবিষ্ট কন্যার মাথায় স্থাপন করিবামাত্র কন্যা সুস্থ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত সাফল্যের জন্য একদিকে রামানুজের দৈব শক্তির খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, অন্যদিকে যাদবপ্রকাশের সুপ্ত প্রতিহিংসা ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই উভয়ের মধ্যে মতান্তর মনান্তরে দাঁড়াইল। বিপদের সূচনা দেখা দিল। অধ্যাপকের বিদ্যা পুঁথিগত, ছাত্রের বিদ্যা ভক্তি ও অনুভবপ্রসূত। অধিকন্তু সে দৈবী-শক্তিসম্পন্ন। একদিন অধ্যাপনার সময় ছান্দোগ্য উপনিষদের 'কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষম্' কথার ব্যাখ্যা নিয়া উভয়ের মতভেদ ভীষণ আকার ধারণ করিল। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাদবপ্রকাশ রামানুজকে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ফলে মনের শান্তি নষ্ট হইল। আপন দুর্বলতা প্রকাশ হইবার ভয়ে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া রামানুজকে আবার ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু মনে নূতন আশঙ্কা জাগিল। রামানুজ প্রতিভাবলে বিশিষ্টাদ্বৈত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলে অদ্বৈত তত্ত্বের ভিত্তি হাল্কা হইবে। সময়ে ইহার প্রতিকার না করিলে বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিলেন। রামানুজসহ সকলে তীর্থে যাইবেন। পথে বিন্ধ্যপর্বতের গভীর জঙ্গলে তাহাকে হত্যা করা হইবে ঠিক হইল। কিন্তু ভগবান্ যাঁহার সহায় এবং যিনি তাঁহার বিশেষ মহিমা প্রচারের জন্য সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহাকে হত্যা করা সহজ নয়। ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া গেল। রামানুজের জ্ঞাতিভাই গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া তিনি রামানুজকে তীর্থভ্রমণকালে রাস্তা হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন।

রামানুজ পলাইয়া প্রাণে বাঁচিলেন। কিন্তু গভীর অরণ্যে পথ চলিতে চলিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলেন এক ব্যাধ দম্পতি তাঁহার সেবা করিতেছে। ব্যাধ জায়া তৃষ্ণার্ত হইলে তিনি নিকটস্থ কূয়া হইতে জল আনিয়া দেখেন চোখের নিমেষে ব্যাধ দম্পতি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন, কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে তিনি কাঞ্চিপুরমে বরদরাজনের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তখন আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ভগবৎ কৃপায় মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শরণাগত ভক্তের নিরাপত্তা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। এদিকে তীর্থযাত্রীর দলে রামানুজকে না দেখিয়া যাদবপ্রকাশ ভাবিলেন তাঁহাকে হয়ত বন্য জানোয়ার মারিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতের কাঁটা দূর হইয়াছে। কিন্তু তীর্থভ্রমণের শেষে যখন গৃহে ফিরিয়া জানিলেন যে রামানুজ তাঁহার পূর্বেই নিরাপদে বাড়ীতে পৌছিয়াছে তখন বুঝিলেন তাঁহার ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। তবু এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে রামানুজ হয়ত তাঁহার ষড়যন্ত্রের কথা টের পায় নাই। নিজের দুষ্কৃতির জন্য মনে মনে দুঃখিত হইলেও বাহিরে তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন এবং আবার বেদান্ত পড়িবার জন্য আসিতে বলিলেন। রামানুজ উদার। ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়াও অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের প্রতি বিরূপ না হইয়া আবার পূর্বের ন্যায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বরদরাজনের কৃপায় মনের স্থৈর্য বজায় রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিষ্ঠা আরও দৃঢ় হইল এবং বিগ্রহের অভিষেকের জন্য জল আনিয়া ইষ্ট সেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন।

যমুনাচার্য ধুরন্ধর পণ্ডিত, অকৃত্রিম ভক্ত, বৈষ্ণব সমাজের নেতা, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষ, রঙ্গনাথের প্রধান উপাসক। নিকটেই থাকেন, একবার কোন কার্য উপলক্ষে কাঞ্চিপুরমে আসিয়া যাদবপ্রকাশের টোলে রামানুজকে দেখিয় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। যুবকের ভবিষ্যৎ উজ্জল। সুপ্ত মহত্ব প্রকটিত হইলে ধর্মজগতে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিবে জানিয়া দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যমুনাচার্য রামানুজাক শ্রীরঙ্গমে যাইয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গমে পৌছিয়া যমুনাচার্য ভাবী নেতাকে কাঞ্চিপুরম্ হইতে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আসিবার জন্য প্রিয় শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসিয় যখন দেখিলেন যে তাঁহার পৌছিবার পূর্বেই গুরুতুল্য যমুনাচার্য দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। তিনটি অপূর্ণ বাসনার জন্য মৃত্যুর

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি, পবিত্রতায় বহু ভক্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইহার পর তিনি কাঞ্চিপুরম্ মঠের মোহান্ত হইলেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, বিদ্যার খ্যাতি দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সাধারণ-অসাধারণ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত, উচ্চ-নীচ, অনেকেই আকৃষ্ট হইলেন। বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত দাশরথি এবং ধনী অথচ পণ্ডিত কুরেশ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। যিনি রামানুজকে ছাত্রাবস্থায় দুর্ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণ বিনাশের জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন সেই অধ্যাপক যাদবপ্রকাশও পরে একদিন স্বপ্নাদেশ পাইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে রামানুজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল গোবিন্দদাস। অদ্বৈতবেদান্তী অধ্যাপক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শিষ্যের দার্শনিক তত্ত্ব স্বীকার করিলেন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ যতিধর্মসমুচ্চয় রচনা করিলেন।

যাদবপ্রকাশের ন্যায় বিখ্যাত বেদান্তীকে স্বমতে আনার পর রামানুজের নাম যশ বিস্তার লাভ করিল। তাঁহার জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণব মঠের অধ্যক্ষ যমুনাচার্য মৃত্যুর পূর্বে রামানুজকে নেতা নির্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকদিন হইয়া গেল তাহা এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। রামানুজের গৃহ হইতে তাঁহার স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সস্ত্রীক মহাপূর্ণ অনন্যোপায় হইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আদৌ আসিবেন কি না এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবেন কি না। কিন্তু বিতাড়িত গুরুই শিষ্যকে আনিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইলেন। বরদা রাজের অনুমতি নিয়া তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে আনিতে বররঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ গায়ককে পাঠাইলেন। বররঙ্গের দৌত্য সফল হইল। তিনি কৃতকার্য হইলেন। রামানুজ সশিষ্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি পাইল। এই সময় ভগবৎ কৃপায় তাঁহার মধ্যে দুটি অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইল। প্রথমটির দ্বারা অন্যের দুঃখ দূর করা এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা ভক্তদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হইল। ভক্তির যে বন্যা ছুটিল তাহা ভক্তেরা সহজে বুঝিলেন। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে জ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বহু জিনিস জানিবার থাকে। বিদ্যার্জনের শেষ নাই। যতই অর্জন করা যায় ততই মনে হয় আরও অনেক শিখিবার বাকি আছে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

রামানুজ তাঁহার গুরু মহাপূর্ণের নিকট গীতার্থ সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাস সূত্র প্রভৃতি বহু বিষয় অধ্যয়ন করিলেন।

ইহার পরও গুরু মহাপূর্ণের ইচ্ছানুযায়ী রামানুজ যমুনাচার্যের অন্যতম শিষ্য গোষ্ঠপূর্ণের নিকট শিষ্য হিসাবে উপস্থিত হইলেন কিন্তু গোষ্ঠপূর্ণ তাঁহাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। হয়ত শিষ্যের মনোবল পরীক্ষা করিতেছিলেন। রামানুজকে আঠারো বার প্রত্যাখ্যান করিলেন। বার বার প্রত্যাখ্যানে রামানুজের মনে হতাশা আসিল। অবশেষে জনৈক বয়ঃপ্রাপ্ত বৈষ্ণবের অনুরোধে গোষ্ঠপূর্ণ একটি মাত্র শর্তে রামানুজকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। শর্তানুযায়ী রামানুজ একাই দণ্ড কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তিনি দাশরথি এবং শ্রীবৎস নামক দুইজন শিষ্যকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। শর্ত ভঙ্গের অপরাধে গুরু শিষ্যকে দোষী সাব্যস্ত করিলে রামানুজ আপন পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন যে দাশরথি এবং শ্রীবৎস দুইজনই তাঁহার দণ্ড আর কমণ্ডলু বিশেষ। দণ্ড এবং কমণ্ডলু ব্যতীত যেমন সাধুর চলে না তেমনি দণ্ড কমণ্ডলু সদৃশ শিষ্যদ্বয় ব্যতীতও তাঁহার চলে না।

শিষ্যের প্রতি গভীর স্নেহ দেখিয়া গোষ্ঠপূর্ণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং একটি বিশেষ শর্তে তাঁহাকে অতি শক্তিশালী মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শর্ত অনুযায়ী তিনি কাহাকেও ঐ মন্ত্র দান করিতে পারিবেন না। দীক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল যিনি উহার রহস্য জানিবেন তিনি বিষ্ণুলোকে যাইবেন। তিনি (গুরু) বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী। রামানুজ উদার, হৃদয়বান্, দীক্ষার পরেই গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। ভগবৎ ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই সকলের নিকট উচ্চৈঃস্বরে গুরুদত্ত বীজ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যিনি ঐ মন্ত্র লাভ করিবেন তিনি অবশ্য বৈকুণ্ঠ লাভ করিবেন। তাছাড়া মুক্তির স্বাদ তিনি একা গ্রহণ করিতে রাজী নন। অন্যকেও ঐ আনন্দের অংশ দিয়া নিজেই আনন্দ পাইবেন। শর্ত ভঙ্গের খবর গুরু গোষ্ঠপূর্ণের কোন পৌছিতে দেরি হইল না। রামানুজের হৃদয় অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি অকপটে গুরুর নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার মত সামান্য ব্যক্তির নরকবাসে যদি বহু লোকের বৈকুণ্ঠ লাভ হয় তবে তাহাই বাঞ্ছনীয়। এত লোকের লাভের তুলনায় তাঁহার ক্ষতি অতি তুচ্ছ। বহু লোককে বৈকুণ্ঠে যাইবার সুযোগ দিয়া তিনি যদি অনন্ত নরকেও যান তবে তাহার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ হইবে না। এরূপ অনন্ত নরকও স্বর্গতুল্য। হৃদয় হৃদয়কে

আকর্ষণ করে। উদারতা স্বার্থপরতার প্রতিষেধক। ত্যাগ প্রেমের পথপ্রদর্শক। শর্ত ভঙ্গ এবং ঐশী শক্তির অপব্যবহারে গোষ্ঠপূর্ণ শিষ্য রামানুজের প্রতি বিরক্ত হইলেও পরে তাঁহার উদারতা এবং নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিলেন। পূর্বে মহাপূর্ণ গুরু হইয়া নিজের ছেলেকে রামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এবং গোষ্ঠপূর্ণও তাঁহার ছেলেকে রামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া মহাপূর্ণের পথ অনুসরণ করিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ শিষ্যদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে এখন হইতে রামানুজের দার্শনিক তত্ত্ব বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বে এমন সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথই বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ।

যমুনাচার্যের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠপূর্ণ, মালাধর এবং বররঙ্গ। প্রথম তিনজনের নিকট হইতে বৈষ্ণব তত্ত্ব জানিয়া রামানুজ অন্য দুইজন শিষ্যের নিকটও বৈষ্ণবতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পাঁচজন শক্তিমান গুরুর আধ্যাত্মিকতা একজন উপযুক্ত শিষ্যের মধ্যে মিশিয়া প্রবল আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করিল। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার ধর্মমত বিশেষ রূপ নিল। তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বৈষ্ণব সমাজের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাইলেন।

গতি সকল সময়ে সমভাবে চলে না। মাত্রা বাড়ে, কমে, রামানুজের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিপর্যয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, অনেকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। ইহাতে রঙ্গনাথের মূল পূজারীর সম্মান পূর্বের ন্যায় রহিল না। অনেক ক্ষুন্ন হইল। নিজের প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হউক ইহা কেহ চায় না। পূজারীও মানুষ। তাঁহার পক্ষে এত বড় ক্ষতি সহসা স্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রতিদ্বন্দী রামানুজের উপর বিদ্বেষ বহ্নি পতিত হইল। নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পথের কণ্টক দূর করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাইবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। আত্মীয়তা দেখাইয়া রামানুজকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া বিষ মিশ্রিত খাদ্য পরিবেশন করিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে নেতৃত্ব দিয়াছেন তাঁহাকে সব সময়ে অদৃশ্য ভাবে রক্ষা করেন। প্রধান পুরোহিতের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহার স্ত্রী ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন। রঙ্গনাথের কৃপায় তাঁহার বিবেক জাগ্রত হইল। তিনি সবই প্রকাশ করিয়া দিলেন। ভক্ত রামানুজের জীবন রক্ষা পাইল। প্রথমবার অকৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া প্রধান পুরোহিত দমিলেন না বরং নূতন রকমের

ষড়যন্ত্র করিলেন। এবার রামানুজের ভগবৎ ভক্তির সুযোগ নিলেন। দেবতার প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিবেনই এই ধারণায় তাঁহাকে আবার আমন্ত্রণ করিয়া দেবতার প্রসাদী শরবতে বিষ মিশাইয়া পান করিতে দিলেন। অন্তর্নিহিত ভক্তির সংস্পর্শে ভগবৎ কৃপায় বিষের তীব্রতা কমিয়া গেল। বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া রামানুজ অর্ধ উন্মিলিত অবস্থায় ভগবৎ আনন্দে উল্লাস নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ দিয়া জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিতে এত আপ্লুত হইলেন যে মনে হইল তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই। মন্দিরাধিষ্ঠাতৃ দেবতা রঙ্গনাথের সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন। ভগবৎ মহিমা এবং প্রসাদের শক্তি ঘোষিত হইল। ষড়যন্ত্র বিফলে গেল। প্রধান পুরোহিত প্রতি মুহূর্তে রামানুজের মৃত্যু সংবাদ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার আশা পূরণ করিলেন না। বার বার অকৃতকার্যের জন্য হতাশ হইলেন। দুষ্কৃতির জন্য তাঁহার মনে ধিক্কার জন্মিল। ভগবৎ কৃপা থাকিলে দুষ্কৃতকারীরও সদ্গতি হয়। পুরোহিত রামানুজের পায়ে পড়িয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আততায়ীকে দেখিবামাত্র হত্যা করিলে দোষ হয় না, ইহা শাস্ত্রসম্মত। উদারভাবাপন্ন রামানুজ এত বড় দুষ্কৃতিকারীকেও ক্ষমা করিলেন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের অপরাধ গ্রহণ করেন না। প্রেম, ভক্তি দুষ্কৃতি-চারীকেও কোল দেয়, চোরকে সাধু করে। রামানুজ প্রধান পুরোহিতকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি যেন প্রাণ দিয়া ভগবৎ সেবা করেন এবং মানবের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করেন।

এই সময়ে যজ্ঞমূর্তি নামক জনৈক অদ্বৈত বেদান্তের পণ্ডিত ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অন্যান্য দর্শন খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত বেদান্তের মহিমা প্রচার করা। দক্ষিণ দেশে বহু ধুরন্ধর পণ্ডিতকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ক্রমাগত ১৭ দিন যাবৎ রামানুজের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিলেন। এইবার রামানুজ মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কেহ গ্রহণ করিবে না। তাঁহার মান থাকিবে না। হয়ত বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইবে। অনন্যোপায় হইয়া আপন মান রক্ষার্থে তিনি রঙ্গনাথের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান ভক্তের মান রক্ষা করিলেন। যজ্ঞমূর্তির মনের গতি পরিবর্তন করিয়া দিলেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে যজ্ঞমূর্তির মন পরিবর্তনের দ্বারা ইহা বুঝায় না যে অনুভব এবং তত্ত্বের দিক্ দিয়া অদ্বৈতবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বরং শাস্ত্র এবং অনুভব ইহার বিপরীত। অদ্বৈতবাদ শেষ কথা। তবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সাধারণের পক্ষে উপযোগী এবং এই মতের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনীয়তা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়। যজ্ঞমূর্তির মন পরিবর্তনে একটা বিষয় বুঝা যায় যে রামানুজ শুধু পণ্ডিত নন, ভক্তি, প্রেম, আধ্য তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। যজ্ঞমূর্তির মনে ভক্তির প্রবাহ ছুটিল। রামানুজের শিষ্যত্ব স্বীকার করার পর দক্ষিণ দেশে তিনি দেবরাজ মুনি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। জ্ঞানসার এবং প্রমেয়সার নামক দুইটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

রামানুজ চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শিষ্যদের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। শিষ্যেরা ভক্তি, ত্যাগ, বিনয় দ্বারা ভূষিত হইয়া ভগবৎ কৃপায় যাহাতে আদর্শ জীবন যাপন করেন এই বিষয়ে তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন। বিদ্যার অহঙ্কার আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিকূল। তাহ'তে না ভুলিয়া শিষ্যরা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাতে সর্বদা সচেতন থাকেন সেইজন্য তাঁহাদের জন্য স্থান কাল পাত্রানুযায়ী নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার শিষ্য দাশরথি অতিশয় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান। বৈষ্ণব তত্ত্ব, গীতার মর্ম ভাল ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। তবুও বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান আশঙ্কা করিয়া গুরু তাঁহার মারাত্মক রোগ অহমিকা বিনাশ করিবার জন্য নূতন রকমের ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। গুরু মহাপূর্ণের কন্যার সম্প্রতি দূর গ্রামে বিবাহ হইয়াছে। দাশরথিকে ঐ কন্যার বাড়ীতে পাচকের কাজ করিবার জন্য পাঠাইলেন। গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া দাশরথির মন পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে বুঝিয়া রামানুজ শিষ্যকে বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। দীনতার পরীক্ষায় পাস করিয়া দাশরথি গুরু প্রদর্শিত পথের সঠিক হদিস পাইলেন। একবার সশিষ্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে রামানু অষ্টসহস্রগ্রামে বিশ্রাম করিলেন। ঐ গ্রামে যজ্ঞেশ এবং বরদাচারী নামে দুইজ ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত শিষ্য ধনী এবং অপর শিষ্য দরিদ্র। রাম প্রথমোক্ত শিষ্যের বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন যে তিনি সশিষ্য তাঁহার বাড়ীতে আতি গ্রহণ করিবেন। গুরুর আগমনের খবর শুনিয়া যজ্ঞেশ আনন্দে এত অভি হইলেন যে গুরুর প্রেরিত ব্যক্তিকে মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। হয়ত যথোচি সম্মান দেখাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিংবা তাঁহার আদর যত্ন করিবার প্রয়ে বোধ করেন নাই। গুরুপুত্র কিংবা শিষ্যকে গুরুর মত সম্মান দেখাইতে হয় তাঁহাকে অবহেলা করা গুরুকে অবহেলার সামিল। যজ্ঞেশ এই অপরাধে অপরাধী এই অপরাধের দণ্ড তাঁহাকে নিতে হইল। গুরুসেবার অধিকারে বঞ্চিত হইলেন

ামানুজ তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি দরিদ্র শিষ্য বরদাচারীর
়হে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষাতেই বরদাচারীর দিন চলে। তিনি ভিক্ষায়
াহির হইয়াছেন, গুরুর আগমন সংবাদ জানিতেন না। হঠাৎ সশিষ্য গুরুর আগমনে
রদাচারীর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গুরুসেবার মত কোন
জনিস ঘরে নাই। অথচ গুরুসেবা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। স্বামীও গৃহে নাই আর
াকিলেও বা কি হইবে। তিনি স্বামীর দারিদ্র্যের কথা ভালভাবে জানেন।
ঠাৎ গুরুসেবার একটা উপায় তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি অশেষ রূপবতী
হলেন। নিকটস্থ এক ধনী প্রতিবেশী তাঁহার রূপমুগ্ধ। লালসা চরিতার্থ করিবার
হু চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। লক্ষ্মী দেবী সতী স্ত্রী। দারিদ্র্যের
িনিময়ে কখনও দেহ বিক্রয়ে রাজী হন নাই। সুতরাং প্রতিবেশীর বাসনা
পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। এখন লক্ষ্মী দেবীর গুরুসেবার সুযোগ আসিয়াছে। এরূপ
যোগ জীবনে হয়ত আসিবে না। এই সুযোগ নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নয়। অনন্যোপায়
ইয়া তিনি ধনী প্রতিবেশীর নিকট গিয়া দেহ বিক্রয়ে রাজী হইলেন। শর্ত ছিল
রুসেবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তিনি দিবেন এবং গুরুসেবা শেষ হইলে
াসাদ গ্রহণান্তর আসিয়া তাঁহার রসনা চরিতার্থ করিবেন। ধনী প্রতিবেশীও
নেক দিনের অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করিবার আশায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ
রিলেন। নির্বিঘ্নে সশিষ্য গুরুসেবা হইয়া গেল। লক্ষ্মী দেবী গুরুসেবা করিয়া
ষ্ট হইলেন। রামানুজ তাঁহাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিলেন। ইহার পর পূর্ব কথা
ত কিছু প্রসাদ নিয়া লক্ষ্মী দেবী ধনী প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে
কা ঘুরিয়া গেল; ধনী প্রতিবেশীর মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। বাসনা চরিতার্থ
রিবার প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। তিনি সতীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত অথচ সতী
রুসেবার জন্য নিজ দেহ বিক্রয়েও কুণ্ঠিত নন। সতীর গুরুভক্তির নিকট ধনীর
াশব বৃত্তি হার মানিল। তাঁহার মনে ভীষণ অনুশোচনা আসিল। অবিলম্বে তিনি
ক্ষ্মী দেবীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাহাকে
নুরোধ করিলেন, তিনি তাঁহাকে (ধনী প্রতিবেশীকে) তাঁহার গুরু রামানুজের
কট লইয়া যান। তাঁহার (ধনী প্রতিবেশীর) ধারণা হইল রামানুজ মহাপুরুষ। এই
হাপুরুষের কৃপাতেই তাঁহার অন্তরের পাশব বৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে এবং
ষ্ণব ধর্মে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সৎ সংসর্গে আসিয়া দানব দেবতা হইলেন।
স্পর্শমণির সংস্পর্শে লোহা সোনা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে গোবিন্দ রামানুজের আত্মীয়। যাদবপ্রকাশের নিকট

বেদান্ত পড়িবার সময় কি ভাবে বিন্ধ্যপর্বতের জঙ্গলের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়া রামানুজের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর একদিন একটা বিষধর সর্পকে গলায় কাঁটা বিদ্ধ হইয়া ছটফট্ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ জীবন বিপদাপন্ন করিয়া আঙুল ঢুকাইয়া কাঁটা বাহির করিয়া সর্পটিকে বাঁচাইলেন। পূর্ব হইতে তাঁহার ভাব যদিও জানিতেন তথাপি মাতুল শৈলপূর্ণের গৃহে অবস্থানকালে রামানুজ গোবিন্দের সেবায় আরও মুগ্ধ হন। এখন তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আসিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। নূতন নাম দিলেন মন্মথ বা এমার। পরবর্তী কালে এই এমার নাম হইতে পুরীতে বৈষ্ণবদের বিখ্যাত এমার মঠ স্থাপিত হইয়াছে। প্রচুর ভূসম্পত্তি, বৈষ্ণবদের আশ্রয়স্থল। জা, পাঠ, ধ্যান, বৈষ্ণব সেবা, অতিথি সেবা এখানকার প্রধান কাজ।

দাশরথি, কুরেশ, সুন্দরবাহু, যজ্ঞমূর্তি, গোবিন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যদের লইয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে বাস করেন। তাঁহাদিগকে প্রবন্ধম্ (তামিল বেদ) শিক্ষা দেন। এই সময়ে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলেন। গীতা, উপনিষদ্ এবং ব্রহ্ম-সূত্রাদি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখিলেন। তাঁহার ভাষ্য শ্রীভাষ্য নামে পরিচিত। ভাষ্য রচনা কালে তিনি বোধায়ন বৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। একমাত্র কাশ্মীরের অন্তর্গত সারদা নামক স্থানে ইহা পাওয়া যাইত। অন্য কোথাও উহা পাওয়া যাইত না বলিয়া কাশ্মীরের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। সারদায় গুরুর সঙ্গে অবস্থান কালে কুরেশ গ্রন্থখানি মুখস্থ করিয়াছিলেন। শিষ্যের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্য লইয়া রামানুজ ভাষ্যখানির মর্মার্থ উদ্ধার করিলেন। এবং তাঁহার মতের অনুকূলে ভাষ্য লিখিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। যশ প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই নূতন বিপদ দেখা দিল। কাঞ্চির পল্লব বংশীয় রাজা কৃমিকণ্ঠ শৈব, বৈষ্ণব বিদ্বেষী। দুরভিসন্ধি নিয়া তিনি রামানুজকে সর্বসমক্ষে আপন মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইলে তবে উহা স্বীকৃত হইবে, নইলে প্রতিফল পাইতে হইবে। রাজার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া কুরেশ গুরুর অমূল্য জীবন রক্ষার্থে গুরুর ছদ্মবেশে পল্লবরাজ সকাশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলেন না, অকৃতকার্যতার ফল তাঁহাকে পাইতে হইল। অত্যাচারের ফলে তিনি অন্ধ হইলেন, তথাপি রাজাকে অভিশাপ দিলেন না। বরং অন্ধত্বের বিনিময়ে গুরুর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া

নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলেন। ইহার পর কুরেশ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। ভগবৎকৃপা, ভক্তি এবং গুরুর আশীর্বাদে তিনি সারিয়া উঠিলেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

কাঞ্চিতে শৈব, বৈষ্ণব দুই-ই ছিলেন। শিব কাঞ্চিতে শৈবদের প্রভাব বেশী। কাঞ্চি অনেক কাল তাঁহার (রামানুজের) কর্মস্থল থাকিলেও তাঁহার প্রভাব বেশী বিস্তার লাভ করে নাই। বরং বলা যায় তিনি 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' ছিলেন। কিন্তু অন্যত্র যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহাতে ক্ষতিটা অনেকাংশে পূরণ হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বেলুড়ের রাজা বিট্টিদেব রায় প্রথমে জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুবর্ধন নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মহিষী শান্তলা দেবী জৈনই রহিয়া গেলেন। স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। ইহার পর রামানুজ মহীশূরের ত্রিশ মাইল দূরে তিরুভারয়নপুরম্ নামক স্থানে পৌছিয়া উহার বিষ্ণুমন্দিরটি সংস্কার করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু মূল বিগ্রহ থাকিলেও উৎসব বিগ্রহটি বিধর্মীরা লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিল। যোগশক্তি বলে জানিতে পারিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া রামানুজ উহা উদ্ধার করিলেন এবং উহা পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করিলেন। উক্ত বিগ্রহ পুনরায় লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হইলে স্থানীয় নিম্ন বর্ণের লোকেরা বিগ্রহটি লুকাইয়া রাখিতে ব্রাহ্মণদের সাহায্য করিয়াছিল। এইজন্য ঐ মন্দিরে বিশেষ বিশেষ দিনে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

রামানুজ একাধারে ভক্ত, কর্মবীর, ধর্মবীর, সমাজনেতা। তিনি ১২০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। গুরু যমুনাচার্যের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্মে নূতন আলোড়ন আনিয়াছেন। এমন এক দল বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা ত্যাগ, তপস্যা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মকে এখনও সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে বহু ভক্তের অনুরোধে তিনি আপন মূর্তি তৈয়ার করিবার অনুমতি দিলেন এবং পরে উহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখনও ভক্তেরা ঐ মূর্তির সেবা কার্য চালাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহার মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় ভগবান সত্য, নিত্য, জীব ভগবানের অংশ এবং অধীন। ভগবান অন্তর্যামী, জীব জগৎ তাঁহার শরীর। ভক্তিলাভই শাস্ত্রের মর্মার্থ, ভক্তিতেই মুক্তি। কর্ম, পুনর্জন্ম শাস্ত্রসম্মত। জ্ঞান সত্য কিন্তু অপূর্ণ আত্মার বিশেষণ। কিন্তু অংশ নয়, ভগবান অশেষ গুণের আধার।

সীমিত মন দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। ভক্তের প্রতি করুণার বশবর্তী হইয়া তিনি অন্তর্যামী অর্চা (মূর্তি) ব্যূহ বিভব (অবতারাদিরূপ) ধারণ করিয়া মানুষের দুঃখ দূর করেন। বাসুদেব, সকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন তাঁহার প্রধান ব্যূহ। ভগবানের অশেষ মহিমা। বিরজ (রজগুণ রহিত) বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত অমরত্ব) বিশোক (দুঃখ, ভয়, শোকরহিত, সদা আনন্দময়) বিজিগিষা (ক্ষুধা, তৃষ্ণারহিত, সদাসন্তুষ্ট) সত্যকাম, সত্য সংকল্প—এই সব তাঁহার প্রধান গুণ। অভিগমন (মন্দির মার্জনা, প্রবেশ পথ পরিষ্কার রাখা) ইজ্যা (বিগ্রহের পূজা) উপাদান (পুষ্পচয়ন এবং উপকরণাদি সংগ্রহ) স্বাধ্যায় (বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ, প্রার্থনা, রামানুজভাষ্য ও অন্যান্য ভক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ, মর্মগ্রহণ পূর্বক ভগবানের নাম জপ) এবং যোগ (অন্তর এবং বহিরিন্দ্রিয় সংযমপূর্বক ভগবানের ধ্যান অভ্যাস)—এই সব বৈষ্ণবের অবশ্য কর্তব্য। ভক্তিসহকারে ভগবৎ ধ্যানের ফল বৈকুণ্ঠধামে গতি। সেখানে বিষ্ণু সর্বদা বিরাজমান। ভক্ত নিত্য ধামে আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন। লক্ষ্মী, নারায়ণ, রাম, সীতা, কৃষ্ণ, রুক্মিণী, তাঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। তামিল, তেলেগু, রাজপুতানা, মারাবার, গুজরাট্ প্রভৃতি অঞ্চলে বৈষ্ণবদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। দক্ষিণ দেশে লক্ষ্মী, পদ্মনাভ, বরদরাজ, বালাজী, রঙ্গনাথ প্রভৃতির মন্দির, উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দির, হিমালয়ে বদরীনাথের মন্দির এবং দ্বারকায় রণছোড়জীর বিষ্ণু মন্দির বিখ্যাত এবং তীর্থস্থান। রামানুজ ভাষ্য দ্রামিরাচার্যের গ্রন্থ, ন্যায়সিদ্ধি সিদ্ধিত্রয়, ভাষ্যবিবরণ, প্রজ্ঞান পরিত্রাণ, প্রমেয় সংগ্রহ, ন্যায় কুলীন, ন্যায় সুদর্শন, ন্যায়সর, তত্ত্বদীপ, তত্ত্বনির্ণয়, বেদান্ত বিজয়, পরাশরীয় বিজয়, গীতাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য।

॥ ষোল ॥

সাঁইবাবা

ফকিরের বয়স অল্প। মাথায় ছেঁড়া কাপড় জড়ান আর এক টুকরা নেকড়া কোমরে বাঁধা। এলোমেলো ভাব, কোন বিষয়ে আঁট নাই। দেখিলে মনে হয় একটা বদ্ধ পাগল। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ান। হয়ত উদ্দেশ্যহীন হইয়াই ঘুরেন। কিন্তু চেহারায় একটা বিশেষত্ব ছিল। চোখ ভাসা-ভাসা, উজ্জ্বল, যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা যেন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। এবং যাহার দিকে তাকান

তাহাকে যেন আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আপন করিয়া নেন। কখনও দেখা যাইত চক্ষু অর্ধ উন্মিলিত অবস্থায় তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। ইন্দ্রিয়াদির এলাকা ছাড়াইয়া কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাসস্থান একটা বড় নিম গাছের কোটর। জীবন ধারণ আরও অদ্ভুত। কেহ কখন দয়া করিয়া কিছু খাইতে দিলে খাইতেন। খাওয়া না মিলিলে ভ্রূক্ষেপ নাই। সমাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার ত্যাগের জীবন বলিলে ভুল হয় না। ফকির আর কেহ নন। বিখ্যাত সাঁইবাবাই এই ফকির।

তিনি একটা গ্রামে থাকেন। গ্রামের নাম সিরিডি। আমেদাবাদ জেলার নগণ্য গ্রাম। বহু বৎসর এই ভাবে পাগলের মত জীবন ধারণের পর লোকের ক্রমশঃ ধারণা হইল যে ফকিরের মধ্যে অসাধারণ শক্তি আছে। ঐ লুকান অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইতেন তাঁহারা এই ফকিরের পূর্ব পরিচয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কে, কোন্ দেশ, কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেন আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, তাঁহার এইভাবে থাকার উদ্দেশ্য কি কিছুই জানিতে পারেন নাই। শুধু এই মাত্র জানেন তিনি গাছের একটা কোটরে বাস করেন। বহুদিন এইভাবে কাটাইবার পর হঠাৎ তিনি স্থান পরিবর্তন করিলেন। একটা ভাঙা মসজিদের একখানি ঘরে আশ্রয় নিলেন। নিকটে সর্বদা একটা ধুনি এবং প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান বুঝা কঠিন। মসজিদে মুসলমান ফকিরের মত থাকা এবং হিন্দু নাগাসন্ন্যাসীর মত সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া রাখার তাৎপর্য কিছুই বুঝা যায় না। বহু লোক তাঁহার নিকট আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কখন কখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করিয়া পরে গৃহে ফিরিতেন। সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে গাঁজা, ভাং নেশা করিতেন। তিনি তাঁহাদের কখনও অবহেলার চক্ষে দেখিতেন না। একদিন সমাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধকের অলৌকিক শক্তির কথা বলিতে বলিতে এমন তন্ময় হইয়া গেলেন যে সময় কি ভাবে বহিয়া গেল কিছুই টের পান নাই। শ্রোতৃমণ্ডলীও তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাড়ী ফিরিবার কথা মনে উঠিল না। ফকিরের কথা ফুরায় না। শ্রোতাদেরও কথা ছাড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যায় না। এই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে লক্ষ্য করিলেন যে যতবার তৈলের অভাবে প্রদীপ নিভিবার উপক্রম হইয়াছে, ততবার ফকির তাঁহার জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া

দেন এবং প্রদীপ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। জলে প্রদীপ জ্বলে তাহারা কখনও দেখেন নাই। এখন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

ফকিরের অলৌকিক শক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, নগণ্য গ্রাম সিরিডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। আমেদাবাদ এবং অন্যান্য স্থানের বহুলোক তাঁহার কথা জানিতে পারিলেন। ফলে দর্শকের ভিড় হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে বিভিন্ন স্তরের লোক, তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান, শিক্ষাবিদ, গভর্নমেণ্ট অফিসার এবং অন্যান্য উচ্চপদবী বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁহার সামনে পদস্থ ব্যক্তিও পদমর্যাদা ভুলিয়া যাইতেন, কারণ তাঁহার সংস্পর্শে শ্রোতার চিন্তাধারা নূতন আকার ধারণ করিত, মনে অব্যক্ত শান্তি বিরাজ করিত। যতই বিশিষ্ট ব্যক্তি হউক না কেন ফকিরের আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হইতেন। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোথাও যায় না। দর্শনার্থীরা কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়াই আসিত। কাহারও মনে হয়ত মানসিক অশান্তি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্মালাপ করিয়া উহার নিবৃত্তি হইয়াছে। শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত শারীরিক ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, রোগমুক্তির আশায় তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ফকির কাহাকেও বিমুখ করেন না। সাধ্যমত সেবা করিবার চেষ্টা করেন। তবে কাহাকেও কোন ঔষধ-পত্র দেন না। ধুনির ছাই দেন। ছাইয়ের কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা বুঝা কঠিন। তবে ছাই মাখিয়া বহুলোক রোগমুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গায়কেরা যেমন গান গাহিবার সময় যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় স্বরের মূর্ছনা তুলিয়া শ্রোতার মনে আনন্দের ঢেউ তুলেন তিনিও সেই রকম মানুষের সুখ, দুঃখগুলিকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের পর্দায় পর্দায় সহানুভূতির মূর্ছনা দিয়া আলোড়ন তুলিতেন। তবে তাঁহার মূর্ছনা দেওয়ার ধরন ছিল অন্য রকমের। প্রাণভরা ভালবাসা, হৃদয়ের শুভেচ্ছা এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি—এই সব ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল। অন্য সম্বল ছিল না। তাঁহার সেবায় উচ্চ, নীচ, ধনী-নির্ধনের প্রশ্ন ছিল না। বর্ষার ধারার ন্যায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর তাঁহার কৃপা সমানভাবে বর্ষিত হইত।

এইভাবে কিছুদিন চলিল, তার পর ফকিরের জীবন নাট্যে পট পরিবর্তন দেখা গেল। জীর্ণ বস্ত্র নাই, এখন মূল্যবান্ রাজবেশে সজ্জিত। নিম গাছের কোটরস্থ বাসস্থান নাই। দরবারে বসেন। রাজা যেমন প্রজার উপহার গ্রহণ করেন তিনিও

সেরূপ দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ভক্তমণ্ডলীর উপহার গ্রহণ করেন। ধনী, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অনেকেই তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্গত। তবে অশিক্ষিত, মূর্খ অতি সাধারাণ ব্যক্তিরও তাঁহার দরবারে স্থান ছিল। সকলের জন্য দরজা খোলা ছিল। কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না। তাঁহার দিন ফিরিয়াছে। তিনি বহুলোকের আশ্রয়দাতা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে রূপার পাল্কীতে চড়াইয়া, মণিরত্ন খচিত সোনার ছাতা মাথায় ধরিয়া রূপার সোটা হাতে নিয়া প্রদক্ষিণ করাইতেন। শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বহুলোকের ভিড় হইত।

তাঁহার ঘরে সুন্দর মূল্যবান কার্পেট পাতা থাকিত। নির্দিষ্ট সজ্জিত আসনে তিনি যখন দরবারে বসিতেন, ধীরে ধীরে দর্শনার্থী লোকজন জমা হইত। যত বেলা হইত তত ভিড় বাড়িত। প্রায় সকলেই কিছু কিছু উপহার লইয়া আসিত, বেলা শেষে দেখা যাইত স্তরে স্তরে নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য এবং উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে। হাজার হাজার টাকা, মোহর, সোনার গহনা কার্পেটের উপর জমা পড়িয়াছে। এত রকমারি খাদ্য এবং উপহার আসা সত্ত্বেও তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সমস্তই দরিদ্রের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। বৈকাল হইলে মসজিদের সীমানার বাহিরে গিয়া কোন গৃহস্থ বাড়ী যাইয়া সামান্য খাবার ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। দু'তিনখানা মোটা রুটি এবং সামান্য তরকারিতে তাঁহার চলিয়া যাইত। এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য এত মহৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন এইভাবে চলিত। ত্যাগ জীবনের মূলমন্ত্র হইলে এরূপ সম্ভব হয়।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দোরকার নিষ্ঠাবান্, ধার্মিক মারাঠী ব্রাহ্মণ। তিনি নানাসাহেব নামে পরিচিত। গভর্নমেণ্ট অর্থদপ্তরের এক উচ্চপদবী বিশিষ্ট অফিসার একবার অফিসের কার্যোপলক্ষে কোন পাহাড়ে গিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, চারিদিক মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। নিতান্ত পথশ্রান্ত হইয়া এক পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সাথীর অবস্থাও তাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। নিকটে কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। উভয়ে এত ক্লান্ত যে নড়িবার ক্ষমতাও নাই, কি করিবেন বসিয়া ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ এক পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহাকে নিকটে কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। যে পাথরের উপর নানাসাহের বসিয়া আছেন তাহা দেখাইয়া পাহাড়ী লোকটি বলিল যে পাথরটি সরাইয়া নিলে সুমিষ্ট

পানীয় জল পাওয়া যাইবে। ঐখানে বর্ষার জল ধরিয়া রাখার জন্য একটা গর্ত আছে, উহা পান করিলে তৃষ্ণা মিটিবে। নানাসাহেব এবং তাঁহার সঙ্গী প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য যখন পাহাড়ী লোক-টির দিকে তাকাইলেন তখন লোকটি চোখের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে খোঁজ করিয়াও তাহার কোন হদিস পাইলেন না। তাহার হঠাৎ আসা এবং চলিয়া যাওয়ার কোন রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদিন নানাসহেব সিরিডির সাধুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই পাহাড়ে পাথরের নীচে পানীয় জল কেমন ছিল। কথা শুনিয়া উক্ত বিশেষ ঘটনাটি সাধু কি করিয়া জানিলেন ভাবিয়া নানাসাহেব আশ্চর্যান্বিত লইলেন। অলৌকিক শক্তি না থাকিলে দূর দেশের অজ্ঞাত ঘটনা জানা যায় না।

ফকির সাঁইবাবার আশীর্বাদে অনেক ভক্তের কপাল ফিরিয়া গেল। অনেক নিঃসন্তান জনক জননী সন্তান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শান্তারাম বলবন্ত ধার্মিক কিন্তু অপুত্রক, সাধুর আশীর্বাদে এক ভক্তিমান পুত্র লাভ করিলেন। পুত্র দিনরাত কৃষ্ণ উপাসনায় ডুবিয়া থাকিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পবয়সে একদিন জ্ঞানেশ্বরী শুনিতে শুনিতে সাঁইবাবার ফটোর দিকে তাকাইয়া তাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াই দেহ রক্ষা করিল, সাধুর আশীর্বাদে তাহার আত্মার উর্ধ্বগতি হইল।

বহু দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত লোক সাঁইবাবার নিকট আসিয়া আপনার দুঃখ ভুলিয়া যাইত। ঐরূপ লোক আসিলে তিনি প্রথমে খুব বকিতেন কিন্তু পরে দয়ার বশীভূত হইয়া ধুনির ছাই দিতেন। ছাইয়ের কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা জানা যায় না কিন্তু যে রোগী ছাই মাখিয়া সুস্থ হইত সে সাধুর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইত। এবং তাঁহাকে দুঃখহারী বলিয়া দেবতার মত সম্মান করিত। পুণা জিলার জুনার গ্রামের ভীমাজী পাটেল নামে একজন যক্ষ্মারোগী তাঁহার শরণাপন্ন হইল। রোগ অসাধ্য বলিয়া ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়াছেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আত্মীয়গণ জীবনের শেষ মুহূর্তে তাহাকে পাল্কী করিয়া সাঁইবাবার নিকট লইয়া আসিলে তিসি ভীষণ রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু রোগীর ছট্‌ফটানি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধুনি হইতে কিছু ছাই নিয়া রোগীর কপালে ঘষিয়া দিলেন। সাধুর দয়ায় রোগী আসন্ন মৃত্যুর কবল হইত রক্ষা পাইল। আর একবার জি এস কপার্ডে নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র বিল্বন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইল। তখন চারিদিকে ঐ দুরন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুত্রের নিরাপত্তার জন্য তাহাকে

অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য মাতা সাঁইবাবার অনুমতি চাহিলে তিনি আশ্বাস দিলেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই। ছেলে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবে। আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ভীষণ ঝড় উঠিবার আশঙ্কা জাগে কিন্তু বৃষ্টি হইয়া গেলে ঝড় থামিয়া যায় এবং মেঘও কাটিয়া যায়। কিন্তু ঐ বৃষ্টির জল শস্যের পক্ষে অতি হিতকারী। কাপার্ডের পুত্রের বেলায়ও তাহাই হইল। অল্পদিনের মধ্যে বিল্বন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল। সাধুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে বিট্টরাও দেশপাণ্ডে তাঁহার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে নিয়া সাঁইবাবার নিকট উপস্থিত হইলেন। বার্ধক্য বশতঃ অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, কিছুই দেখিতে পান না। ডাক্তারদের সব রকম চিকিৎসা বিফল হইয়াছে। শেষ রক্ষার জন্য বিট্টরাও সাঁইবাবাকে ধরিয়া বসিলেন। তিনি বৃদ্ধের চোখে ধুনির ছাই রগড়াইয়া আশ্বাস দিলেন যে ভগবৎ কৃপায় রোগী শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। কিছুদিনের মধ্যে সাধুর কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। বৃদ্ধ নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

বেশীর ভাগ লোকই ঐহিক উন্নতি কামনায় সাঁইবাবার নিকট আসিত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ কেহ আসিত না বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। দেখিয়া শুনিয়া কষ্ট পাইয়াও লোকের চৈতন্য হয় না। তবুও ঐহিক উন্নতি চায়, ইহা মানুষের দুর্বলতা। এই দুর্বলতার কথা তিনি জানিতেন বলিয়াই লোকের প্রার্থনা পূরণে তৎপর হইতেন। সময়ে সময়ে ভক্তদের শিক্ষাও দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী অদ্ভুত ছিল। একদিন মিসেস্ মাঙ্গারস্ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা তাঁহার ধুনির নিকটে বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন কদাকার কুষ্ঠরোগী কোমরে অত্যন্ত নোংরা কাপড় জড়াইয়া হাতে খাবার জিনিস নিয়া সাঁইবাবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কুষ্ঠরোগী দেখিয়া মিসেস্ মাঙ্গারস্ শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার ঘায়ের পচা দুর্গন্ধ এবং নোংরা কাপড়ের বোঁটকা দুর্গন্ধে ভদ্রমহিলার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল অথচ সাঁইবাবার নিকটে কিছু বলিতেও পারেন না। লোকটা এখনই বিদায় নিলে বাঁচেন। তাঁহার মানসিক অস্বস্তিভাব সাঁইবাবার দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য সাঁইবাবা কুষ্ঠরোগীর থলি হইতে কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলেন এবং মিসেস্ মাঙ্গারস্কেও দিলেন। সাধুর হাতে দেওয়া খাদ্য নোংরা হইলেও ভদ্রমহিলা তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারেন না। চোখের খাতিরে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত মুখে দিলেন। খাদ্য খাইয়া তাঁহার ভীষণ অসুখ হইবে ভয় হইয়াছিল। কিন্তু সাঁইবাবার দয়াতেই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক তাঁহার কোন প্রকার অসুখ হয় নাই। সাধুর অলৌকিক শক্তিতেই ইহা সম্ভব

হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সাঁইবাবার শিক্ষা হইল, বাহিরের আকৃতি দেখিয়া মানুষকে কখনও ঘৃণা করিতে নাই। মানুষ মানুষই। তাহার অন্তরাত্মা চিরকালই পবিত্র, মিসেস্ মাঙ্গারস্-এর মানসিক দুর্বলতা কাটিয়া গেল, তিনি নূতন আলো পাইলেন।

অনেক ভক্ত বাড়ীতে উৎসবাদিতে সাঁইবাবাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। একবার বি, ভি, দেব নামক জনৈক ভক্তের আমন্ত্রণে তিনি উৎসবের দিনে উপস্থিত থাকিবেন কথা দিয়াছিলেন। সাঁইবাবা আসিলেন তবে সাধারণ ভাবে নয়। দুইজন বন্ধুসহ সাধুর বেশে আসিলেন। ছদ্মবেশ এমন নিখুঁত হইয়াছিল যে আমন্ত্রণকারী বি, ভি, দেব তাঁহাকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না, যথেষ্ট সংবর্ধনাও করিলেন না। পরে ছদ্মবেশের কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত ভক্তকে শিক্ষা দিলেন যে ভক্ত সকলকে সমানভাবে আদর যত্ন করিবে, কখনও ইতর বিশেষ করিবে না। করিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। সাধারণত দেখা যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ধনীদের সম্মান দেখাইতে গিয়া সাধারণ লোকদের ঘৃণা করা হয়। সাঁইবাবার শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের স্থান ধনী মানীর স্থানের অনেক উর্ধ্বে। তিনি এই ভাবটির প্রতি বিশেষ জোর দিতেন। নানাসাহেব এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঐ নিয়মটি বিশেষভাবে প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু কার্যকালে উহার ব্যতিক্রম হইতে দেখিয়া তিনি অতিশয় মর্মাহত হইলেন এবং নানাসাহেবকে বার বার সাবধান করিয়া দিলেন। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং গুরুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা—এই দুটি বিষয়ের প্রতিও তিনি খুব জোর দিতেন। ভক্তেরা তাঁহার শিক্ষা ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতেছেন কিনা দেখিবার জন্য তিনি অনেক সময়ে তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে সমাজের প্রতি স্তরে সাঁইবাবার বহু অনুগত ভক্ত ছিল। হিন্দু, মুসলমান এমন কি সমাজে যাহাদের অতি নীচ স্তরের লোক বলিয়া অবহেলা করা হয় তাহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার ভক্ত ছিল। উচ্চ বা ধনী বলিয়া কাহাকেও অধিক ভালবাসিতেন কিংবা নীচ বলিয়া কম ভালবাসিতেন তা নয়। তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা সকলের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। বি, ভি, নরসিংহ স্বামী তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে একবার সিরিডিতে রামনবমী উৎসব হইতেছে। লোকে লোকারণ্য। ঐ সময় এক বৃদ্ধা বহু দূর হইতে তাঁহার দর্শন মানসে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিতে

পারিলেন না বলিয়া নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তরের টান প্রবল টান। বৃদ্ধার চোখের জল বৃথা যায় নাই। সাঁইবাবার প্রাণে আঘাত লাগিল। উক্ত বৃদ্ধাকে নিকটে লইয়া আসিবার জন্য এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করিলেন। যখন বৃদ্ধাকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং তাঁহার আনীত কদাকার রুটি খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধার সন্তোষ সম্পাদন করিলেন।

একবার এক চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। চোরটি অতিশয় চালাক। আত্মরক্ষার জন্য সাঁইবাবাকে জড়াইল। শাস্তিভয়ের আশঙ্কায় পুলিস সাঁইবাবাকে ধরিল না। তদন্ত কমিশন বসিল। কমিশনের প্রতি উপরওয়ালার আদেশ ছিল যেন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। তদন্ত রিপোর্টে সাঁইবাবা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। অনেক সময় দোষী নির্দোষ ঠিক করা কঠিন। নির্দোষ শাস্তি পায়, দোষী বাঁচিয়া যায়। কেন যে এরূপ হয় বলা কঠিন। তবে মায়ার রাজত্বে সবই হয়। হাঁ না হয়, না হাঁ হয়। তবে এই ক্ষেত্রে তদন্তের ফল তাঁহার অনুকূলে হইল। তাঁহার সুনাম রক্ষিত হইল। বিশেষত ভক্ত মহলে। তাঁহার খুব দূরদৃষ্টি ছিল। পূর্ব হইতেই বিপদের ইঙ্গিত পাইয়া সাঁইবাবা অনেক সময় ভক্তদের সাবধান করিয়া দিতেন। একবার ঐরূপ আভাস পাইয়া তিনি এক হিন্দু ভক্তকে মসজিদে প্রবেশ না করিবার জন্য নিষেধ করিয়া দিলেন। নাসিকের মুলুশাস্ত্রী, বামন মঠের শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁহার খ্যাতনামা ভক্তদের অন্যতম। সাঁইবাবা হিন্দু ছিলেন কি মুসলমান ছিলেন তাহা শেষ দিন পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। যে মসজিদে থাকিতেন তাহাকে দ্বারকামাই বলিতেন। সামনে ধুনি, প্রদীপ এবং বেদীর পাশেই তুলসী গাছ রাখিতেন। হিন্দুদের মধ্যে যে কর্মফলের কথা আছে তাহা খুব বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন জীবনের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাহা শুধু যে মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য তা নয়। ইতর প্রাণীর মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। মাংসাশী জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কোন জানোয়ার খুব ভাল খাইতে পায়, খুব আদর যত্নে প্রতিপালিত হয়, রাজপ্রাসাদে বাস করিবার সুযোগ পায়; আবার অন্য জানোয়ার এক টুকরা মাংসের জন্য কামড়াকামড়ি করিয়া মরে। ইহাতে মনে হয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দুইই আছে, সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত। অনাবিল সুখ নাই, দুঃখও নাই। কর্মফলই ইহার কারণ।

সাঁইবাবা বহুদিন মানুষের সমাজে বাস করিয়াছেন। এখন বিদায়ের পালা আসিয়াছে। তিনি পূর্ব হইতে টের পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। দুই সপ্তাহ পর্যন্ত

অসুস্থ হইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া হিন্দুশাস্ত্র পাঠ এবং প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দিন ফুরাইল, ১৯১৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে সাঁইবাবা অগণিত ভক্তদের কাঁদাইয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

।। সতেরো ।।

রামদাস স্বামী

গোদাবরী নদী মহারাষ্ট্র দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ নদীর উত্তর কূলে বীর পরগণার অন্তর্গত জম্বুগ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম সূর্যজীপন্থ। তিনি উদার, নিষ্ঠাবান, সদাচারী, ভক্তিপরায়ণ এবং পরোপকারী। শাস্ত্র অধ্যয়ন, সন্ধ্যাবন্দনা, বিগ্রহ সেবা, অতিথি সেবা এবং অন্যান্য সৎকর্মে তিনি লিপ্ত থাকেন। তাঁহার স্ত্রী রমাবাইও স্বামীর মত ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধিমতী। ১৬০৯ সালে রত্নগর্ভা রমাবাই স্বামীকে এক পুত্র উপহার দেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক বলিয়া ছেলের নাম রামদাস রাখেন। বালক দিন দিন বাড়িতে থাকে। সাত বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন দীক্ষা হয়। পিতা নিজে শাস্ত্রানুরাগী, পুত্রকে যথাবিধি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুত্র শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রতিভাবলে শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সদ্‌গৃহস্থ হইয়া ধর্ম জীবন যাপন করিবে এই আশায় পিতামাতা যৌবনের প্রারম্ভে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহ স্থির হইয়াছে। কন্যা সুলক্ষণা, সদ্‌বংশজাতা। পিতা সূর্যজীপন্থ পুত্র রামদাস এবং অন্যান্য বরযাত্রীদের সঙ্গে বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। বিবাহ মণ্ডপ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। সৎপাত্রে গৌরী দান করিয়া পুণ্য লাভের আশায় কন্যার পিতা বহু আয়োজন করিয়াছেন। খাট, পালঙ্ক, শয্যা, বাসনাদি যথাযথ সাজান হইয়াছে। উৎসব-বাজনা বাজিতেছে। বরযাত্রী, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এবং অভ্যাগতদের ভোজন সব ভালভাবেই চলিতেছে। কোন দিকে কোন রকম অব্যবস্থা নাই। সবই ঠিক মত চলিতেছে। পুরোহিত বিবাহ মণ্ডপে যথাসময়ে উপস্থিত আছেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যজমানের মঙ্গলকামী। শুভলগ্নে যেন শুভবিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় সেইজন্য কন্যাকে অলঙ্কারে সাজাইয়া শীঘ্রই বিবাহ

মণ্ডপে উপস্থিত করিবার জন্ত বার বার তাগাদা দিয়া বলিলেন, 'সাবধান, শীঘ্রই শুভ কার্য সম্পন্ন কর, শুভ মুহূর্ত চলিয়া যাইতেছে'।

শব্দশক্তি অমোঘ, ঐ শক্তি কখন কাহার মধ্যে কি ভাবে কাজ করিবে তাহা বুঝা যায় না। বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত রামদাস পুরোহিতের সাবধান বাণীর মধ্যে একটা নূতনত্ব আবিষ্কার করিলেন। শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি একটু ঘষা লাগিলেই দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে। পুরোহিতের বাণীতেই রামদাসের জন্মার্জিত শুভ সংস্কার জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল ভগবানই যেন তাঁহাকে পুরোহিতের মুখ দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। জীবন চলিয়া যাইতেছে। বৃথা সময় নষ্ট করা চলে না। সংসারে একবার আবদ্ধ হইলে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। তাঁহার আরও মনে হইল মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি ভগবান লাভ না হইল তবে সে জীবন বৃথা, সাধারণ জীবের ন্যায় সংসারে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার জন্যই ভগবান জন্ম পরিগ্রহ করাইয়াছেন। যিনি সর্বাপেক্ষা আপন, তাঁহাকে ছাড়িয়া মনের শান্তি নষ্ট করা, ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নয়।

যদিও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ আশ্রম শেষ করিয়া চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা শাস্ত্রের সাধারণ বিধি তথাপি তাহার ব্যতিক্রম বিধিও দেখা যায়। যখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। ঐ ব্যতিক্রম বিধির কালাকাল বিচার নাই। বিবেক জাগিলে দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। জাগ্রত বিবেকই বৈরাগ্য। বিবেক জাগিলে গৃহ অগ্নিকুণ্ড এবং আত্মীয়দের কালসাপ মনে হয়। ভগবৎ কৃপায় রামদাসের বিবেক জাগিয়াছে। অবিলম্বে তিনি বিবাহ মণ্ডপ হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পিতা, আত্মীয়স্বজন, ভাবী পত্নীর কি হইবে ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। বিবাহ উৎসব মাটি হইয়া গেল। মণ্ডপে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। 'বরকে শীঘ্র ধরিয়া আন' রব উঠিল। রামদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। শত শত লোকের চোখে ধূলা দিয়া একজন যুবকের পক্ষে পলায়ন করা সহজ নয়। তাঁহাকে বলপূর্বক আবার বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত করা হইল। রামদাস কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। আত্মীয়স্বজন, কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ অনেক বুঝাইলেন। পিতা সূর্যজীপন্থও পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু রামদাসের সংকল্প অটুট। ফলে পিতা কন্যাপক্ষের নিকট ভীষণ ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। তাহাতেও পুত্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি বলিলেন যে তিনি জানিয়া শুনিয়া বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিতে রাজী নহেন। সংসার অনিত্য ইহা স্থির জানিয়াও যিনি ইহাতে আবদ্ধ হন

তিনি জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিয়া আত্মঘাতী হন। বিবাহিত জীবন প্রথমে স্বপ্নের ন্যায় সুখের বলিয়া মনে হয়, পরে বহু দুঃখ পাইয়া স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যায়। আপাত সুখ আছে সত্য কিন্তু বাস্তব দুঃখের বোঝা সুখের চেয়ে অনেক বেশী। রামদাস বহু অনুনয় বিনয় করিয়া পিতাকে বলিলেন যে তিনি যেন তাঁহাকে (পুত্রকে) আর এই বিষয়ে অনুরোধ না করেন এবং হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করেন যাহাতে পুত্র তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে স্থান লাভ করেন। পুত্রের অটুট্ সংকল্প ও তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা সূর্যজীপন্থ বিবাহ মণ্ডপে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বহু লাঞ্ছনা সত্ত্বেও পুত্রকে পীড়াপীড়ি করিলেন না। জীয়ন্তে পুত্রহারা হইয়া বিষণ্ন চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। তবে মনে মনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন যে তিনি নিজে ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতে পারেন নাই বটে, অন্ততঃ পুত্র এই আদর্শ পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হইবে। ইহাতে বুঝা যায় পিতা মাতা কত ভক্তিপরায়ণ ছিল্লেন। মাতা পুত্রের জন্য অন্তরে দুঃখিত হইলেন কিন্তু তাহার ধর্মপথের কণ্টক হইলেন না।

এই ঘটনার পর রামদাস নির্জন স্থানে থাকিয়া বহুদিন তপস্যায় কাটাইলেন। তপস্যায় শারীরিক কষ্ট আছে। কখনও আহার জোটে, কখনও জোটে না, উপবাসে কাটাইতে হয়। আবার কখন অপমান লাঞ্ছনাও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কষ্টের মধ্য দিয়াই ভগবৎ নির্ভরতা আসে, মানসিক আনন্দ মিলে। রামদাস কষ্টকে কষ্টই মনে করিতেন না। তাঁহার তপস্যার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ জানা না গেলেও এইটুকু বুঝা যায় যে তিনি অত্যন্ত কঠোরী ছিলেন। প্রবল বৈরাগ্যের জোর ছিল, শারীরিক কষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ—এসব তাঁহার নিত্য কর্ম। এত কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁহার শরীর ভালই ছিল, তাঁহার মনের স্থৈর্য দেখিলে মনে হইত তিনি প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মন ভগবৎ ভক্তি রসে ডুবিয়া গেল। রাম তাঁহার সর্বস্ব, জীবন, মন, প্রাণ। ইষ্ট রাম ব্যতীত কিছুই জানেন না। ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। বৈরাগ্যের ফল ফলিল। জীবন রামময় হইয়া গেল। তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া তিনি পাণ্ডারপুর গেলেন। বিট্ঠলদেব মন্দিরের উপাস্য দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম বিট্ঠল। রামদাসের ইষ্টনিষ্ঠা প্রবল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা বিট্ঠলদেবের ধ্যান না করিয়া রামের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ভগবান ভক্তবৎসল, ভক্তের মন দেখেন। ভক্ত তাঁহাকে যে রূপে দেখিতে চান তিনি তাঁহাকে সেই রূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। একই অনন্ত

সত্তা নানারূপে বিদ্যমান। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শক্তি। পাণ্ডারপুর মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিট্ঠলদেব রামদাসকে রামরূপে দেখা দিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ইহার পর তিনি ভগবৎ ইচ্ছায় জনকল্যাণে ভগবৎ মহিমা প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। রামনাম কীর্তন দ্বারা রামের মহিমা প্রচারই তাঁহার কর্মসূচী হইল। তাঁহার সরলতা, উদারতা, প্রেম ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহাকে এই মহৎ কার্যে সাহায্য করিতে লাগিল।·········এইরূপে বহুতীর্থে রামনাম কীর্তন এবং প্রচার শেষ করিয়া তিনি মহাবালেশ্বরে আসিলেন। এবং রামের মন্দির নির্মাণ, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

প্রসিদ্ধ ভক্ত ও প্রেমিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইলে দলে দলে লোক আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। তিনি স্বভাবতঃ নির্জনপ্রিয় ছিলেন। ভিড় এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে নিকটবর্তী পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় লইতেন। এই সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ছত্রপতি শিবাজী তাঁহাদের অন্যতম। শিবাজী হিন্দু ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। মাওলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সামরিক শিক্ষা দিয়া তাহাদের সাহায্যে একটা শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিলেন। অত্যাচারী বিধর্মীদের হাত হইতে উৎপীড়িতদের আশ্রয় দান এবং তাহাদের স্বধর্ম পালনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে দিল্লীর সম্রাট্ কুপিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আফজল খাঁর অধীনে শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠাইলেন কিন্তু আফজল খাঁ পরাস্ত ও বিধবস্ত হইলেন। ইহার পর শিবাজী দেশের পর দেশ দখল করিতে লাগিলেন। তিনি স্বাধীন রাজার মত রাজকার্য চালাইতেন। সাধুভক্তি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। তখনকার দিনে মহারাষ্ট্রের প্রধান সাধু তুকারামের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়াছে। তরস্ত দুর্গ দখল করিবার পর শিবাজীর আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন যাহাতে নিপীড়িত হিন্দুরা নির্বিঘ্নে ধর্মজীবন যাপন করিয়া সুখে বাস করিতে পারে। শিবাজী এই বিষয়ে সাহায্য, পরামর্শ এবং আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় মহাত্মা তুকারামের নিকট আসিলেন। তুকারাম তখন পাণ্ডারপুরে থাকেন। তিনি শিবাজীকে পথের সন্ধান দিলেন এবং রামদাস স্বামীর শরণাপন্ন হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কেননা রামদাস অতি উন্নত ধরনের সাধু অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। শিবাজীকে মহৎ কর্মে সাহায্য করিবার শক্তি তাঁহার আছে।

রামদাস প্রায়ই তপস্যায় নিরত থাকিতেন। মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শনে যাইতেন। সেই সময়ে তিনি দৈবানুগ্রহে পাণ্ডারপুর আসিয়াছিলেন। বিটোবার মন্দিরে তিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায় মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের মূলে এই তিন শক্তিশালী পুরুষের অবদান অপরিমেয়। সাধু তুকারামের শুভেচ্ছা, ভক্ত রামদাসের ধর্ম বিষয়ে পথ নির্দেশ, সঙ্ঘশক্তি সংগঠনে সক্রিয় সাহায্য এবং বীর শিবাজীর গুরুভক্তি, দেশপ্রেম, অদম্য কর্মশক্তি সব মিলিত হইয়া মারহাট্টা শক্তিকে ভারতের ইতিহাসে প্রাধান্য দিয়াছে। শিবাজী রামদাসের উদারতা, ভক্তি, প্রেম এবং নিষ্ঠায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন এবং রাজ্যও গুরুকে সমর্পণ করেন। রামদাস মহাপুরুষ, ত্যাগী, রাজ্যে তাঁহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু জনসাধারণ সৎ, উদার, ন্যায়পরায়ণ, এবং ভগবৎ বিশ্বাসী হউক ইহা তিনি চান। তিনি শিবাজীকে ন্যায়, ধর্ম, উদারতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য চালাইতে পরামর্শ দিলেন। গুরুশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী বীর শিবাজী রামদাসের আদেশ পালনে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া গুরুর খোঁজে শিবাজী রামমন্দিরে আসিলেন কিন্তু তাঁহাকে তথায় না পাইয়া চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। বহু চেষ্টার পর গোদাবরী তীরে তাঁহার সন্ধান মিলিল। শুভদিনে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শিবাজী তাঁহার নিকট দীক্ষা চাহিলেন। রামদাস দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ। শিবাজী সর্বস্ব ত্যাগ করিবার জন্যই গুরুর অনুমতির জন্য আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি জানিতেন শিষ্যের মধ্যে মহাশক্তির খেলা চলিতেছে। ঐ শক্তি তাঁহাকে বিশাল হিন্দুরাজ্য গঠনে সাহায্য করিবে। এমন উপযুক্ত আধার মিলে না। এই শক্তিশালী শিষ্যের দ্বারা দেশের দশের সমাজের, ধর্মের বিশেষত সনাতন হিন্দু ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই প্রবল বিধর্মীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে। শক্তিমান শিষ্যকে সৎকার্য সাধনে সর্বতোভাবে সাহায্য এবং উৎসাহ দান সদ্‌গুরুর প্রধান কর্তব্য। রামদাস শিবাজীর মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির মানসে বলিলেন যে তিনি শিষ্যকে এমন একটা জিনিসের সন্ধান দিবেন যাহার শক্তিতে শিবাজী অপরাজেয় হইবে। তাহা হইলে বিশাল আদর্শ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা রূপ মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। গুরুর শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ শিষ্যকে সব সময়ে রক্ষা কবচের মত আপদে বিপদে রক্ষা করিয়াছে। শিবাজী যখনই বিপদে পড়িতেন তখন সব কর্ম ত্যাগ করিয়া গুরুর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। গুরুভক্তি বিফলে যায় না, অলৌকিক শক্তিবলে শিবাজী বিপদমুক্ত হইতেন। গুরুর পরামর্শ এবং আশীর্বাদ নিয়া কাজ করিতেন বলিয়া সব

সময়ে কৃতকার্য হইতেন। তাহাতে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়িয়া যাইত। আর একবার দিল্লীর সম্রাট্ বিরাট সৈন্য নিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজত্ব যায়-যায়। প্রজাগণ উৎপীড়িত, ধর্ম বিপন্ন, শিবাজী সামান্য সৈন্য লইয়া গুরুর নাম স্মরণ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং গুরুর আশীর্বাদে বিপদমুক্ত হইলেন। শত্রু বহু অর্থ, সৈন্যক্ষয় স্বীকার করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। শিবাজী গুরুর মহিমা সম্যক্‌রূপে বুঝিলেন।

রামদাস কখনও কখনও জনকল্যাণের জন্য অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ করিতেন। একবার কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন বহু যাত্রী তৃষ্ণার্ত। তার মধ্যে বৃদ্ধ এবং শিশুও ছিল, তখন গ্রীষ্মকাল। জল ব্যতীত প্রাণ ধারণ অসম্ভব। অথচ নিকটে কোথাও জলাশয় নাই। রামদাস ঐ মরুভূমির মত স্থানে এক হাত গভীর স্থান খনন করিলেন। দেখা গেল অমৃতোপম স্বচ্ছ পানীয় জল ফোয়ারার মত বাহির হইয়াছে। স্বচ্ছ জল পান করিয়া যাত্রীগণ অতিশয় তৃপ্ত হইয়া সাধুর দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রামদাস একদিন যোগশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গৃহত্যাগের পর মার খবর পান নাই, এখন মাতার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'মা তোমার আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছি। তোমাকে হয়ত কাল দেখিতে পাইব না।' বহুদিন পরে হারান পুত্র পাইয়া মা রামদাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ইহার অনতিকাল পরে মায়ের শরীর গেলে রামদাস আশ্রমে ফিরিয়া আবার গভীর ইষ্টচিন্তায় মন দিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও রামদাসের অবদান যথেষ্ট। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাসবোধ গ্রন্থখানি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মানাচিশ্লোকে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'চন্দন যতই ঘষা যায় ততই তাহার সুবাস বাহির হয় এবং ঐ চন্দনই দেব সেবায় লাগে। অতএব হে মন, দেহ, মনকে তপস্যা ও ভক্তির চন্দনে সিক্ত করিয়া সর্বতোভাবে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োগ কর।' ভক্তিতত্ত্বের এমন সুন্দর উপমা অতি বিরল।

সংসার-বিদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য, সিঙ্গেল টিকেট পাওয়া যায় না। দেহী যখন টিকেট রিজার্ভেশন করেন তখন তাহাকে রিটার্ন টিকেটই কিনিতে হয়। রিটার্ন টিকেটে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফিরিতে হয়। রামদাসের টিকেটের মেয়াদ ফুরাইয়াছে, তাঁহাকে যাইতে হইবে। শরীর ক্রমশ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তিনি পূর্ব হইতে আভাস

পাইয়াছেন। রামদাস রামের শ্রীপাদপদ্মে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৬৮১ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য শিবাজী গুরুর শ্মশানে মন্দির নির্মাণ করিয়া আজুরায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সজ্জনগড়ে এখনও নিয়মিত ভাবে এই বিগ্রহের সেবা পূজা হইয়া থাকে। মহাপুরুষের তিরোধানে দেশের এবং হিন্দুধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

।। আঠারো ।।

তুকারাম

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হইয়া তীর্থের রূপ ধারণ করে। তাঁহাদের ত্যাগ, তপস্যা জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতার বেদীমূলে ভারতে বহু তীর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত পাণ্ডারপুর তাহাদের অন্যতম। পবিত্র ভীমা নদীর তীরে বিট্টলদেবের মন্দির। বিষ্ণুই বিট্টলদেব বা বিটোবা নামে পূজিত হন। মন্দিরটি প্রশস্ত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। কবে তৈয়ার হইয়াছে এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা কে তাহা সঠিক জানা কঠিন হইলেও উহা যে প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্দিরের পরিবেশ চমৎকার, পবিত্র আবহাওয়া, আনন্দদায়ক। ভক্তেরা নিত্য নদীতে স্নান করিয়া পবিত্র মনে মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া ধন্য হন। উৎসবের দিনে ফুল, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত উৎসব বিগ্রহের শোভাযাত্রা বাহির হয়। তখন বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, ভক্তেরা বাদ্যযন্ত্রাদি সহ ভজন গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। দর্শনার্থীরা সারি করিয়া রাস্তার উভয় পাশে দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। স্থানে স্থানে শোভাযাত্রা থামিলে ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ, মাল্য, ফল, মিষ্টি দ্বারা বিগ্রহের পূজা আরতি হয়। তখন চারিদিকে একটা সুন্দর পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্ট হয়। এই আনন্দদায়ক শোভাযাত্রা দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য যাত্রীর ভিড় হয়। তুকারাম তাহাদের অন্যতম। বিগ্রহ দর্শন করিতে তাঁহার এত ভাল লাগিত যে কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে সেদিকে তাঁহার ভ্রুক্ষেপ থাকিত না। কখন যে বিট্টলদেব তাঁহার হৃদয়ে চুপি চুপি আসন পাতিতেন, হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেন, বাঁশী

বাজাইয়া মন মুগ্ধ করিতেন তিনি নিজেই জানেন না। যে মন দিয়া জানিবেন সে মন নাই। চুরি গিয়াছে। চোর স্বয়ং বিট্‌ঠলদেব। সাধারণ চোর ধনরত্নাদি জাগতিক বিষয় চুরি করে। এবং তার জন্য কঠোর সাজা পায়। কিন্তু ভগবান অসাধারণ চোর ; চুরি করেন ভক্তের মন, প্রাণ। চুরি করিবার জন্য ত শাস্তি পানই না বরং ভক্তের পূজা সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে উল্টা শাস্তি দেন। তবে ভক্ত শাস্তিই চান। কারণ ও রকম শাস্তি পাওয়ার মধ্যে প্রেম, ভালবাসা আনন্দ আছে। তুকারাম যখন শোভাযাত্রা কিংবা মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতেন তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত, মন শান্ত হইত। আবার কখনও ইষ্টের বিরহে মন এত আকুল হইত যে তিনি কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিতেন না। ইষ্ট দর্শনের জন্য অধীর হইয়া পড়িতেন। একদিন এরূপ অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক প্রকাণ্ড গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। নিদ্রাদেবী তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন এক মনোরম স্বপ্ন দেখিলেন। কোন শুদ্ধ সত্ত্ব গুণসম্পন্ন বৈষ্ণব মহাপুরুষ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। ইষ্টের কৃপায় তাঁহার হৃদয় বিমল আনন্দে ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর উক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন ভঙ্গের পরও তুকারামের মনে সেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল।

ঐ মহাপুরুষ কে, কোথায় থাকেন তুকারাম কিছুই জানেন না। তাঁহার জীবনী লেখকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন চৈতন্যদেবের মতাবলম্বী উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণ-সম্পন্ন কোন বৈষ্ণব হয়ত তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও মতে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত মহাপুরুষ জ্ঞানদেবের শিষ্য সচ্চিদানন্দই তাঁহাকে এইভাবে কৃপা করিয়াছেন। কৃপা যিনিই করুন না কেন এইভাবে গুরুকৃপাতে তুকারামের অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। এ প্রকার অনুভূতি পূর্বে কখনও হয় নাই। ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন 'গুরু সর্বজ্ঞ। শিষ্যের পক্ষে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তাহা তিনিই বলতে পারেন।' ঐ অনুভূতি তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিল। ইহার পর হইতে ভগবৎ-তত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। বিটোবার কৃপায় ভবসাগর পার হইবার খেয়া মিলিল। দীক্ষাই খেয়ার মাস্তুল ; গুরু নিজেই শক্ত মাঝি, হাল ধরিয়া থাকেন। শক্ত মাঝির পাল্লায় পড়িলে খেয়া তরী ঠিক চলে, ডুবিবার ভয় থাকে না।

দেহু ক্ষুদ্র গ্রাম। পুণা শহর হইতে ৮ মাইল দূরে। প্রবন্ধোক্ত তুকারাম ১৫৯৮ সিরকায় এই নগণ্য গ্রামে বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বোহলবা এবং

মাতা কনকবতী উভয়েই ধর্মপরায়ণ, ভগবান পাণ্ডুরঙ্গের ভক্ত। পাণ্ডুরঙ্গ পাণ্ডারপুর মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সাহাজী তুকারামের বড় ভাই। তিনি সাংসারিক জীবনে বিশেষ তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। সেইজন্ত তুকারামের উপর সাংসারিক দায়িত্ব পড়িল। সংসারে ভাল মন্দ তুই-ই আছে। কোনটাকে এড়ান যায় না। তুকারামের তুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী রুকমাবাই মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার নাম জীজাবাই।

১৮ বৎসর যাবৎ তুকারামের জীবন ভাল ভাবে কাটিল। পিতা বোহলবা মারা গেলেন। তারপর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ঘটিল। সেই সময়ে সমস্ত মহারাষ্ট্রে ভীষণ তুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বিভীষিকার করাল ছায়ায় বিপর্যয়ের মাত্রা ভীষণ হইল। তুকারামের ব্যবসা ফেল পড়িল। মহাজনদের ধার শোধ হইল না। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জীজাবাই বড় ঘরের মেয়ে, স্বামীর তুঃখ দেখিতে পারিলেন না। পিতৃকুলের আত্মীয়দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বামীকে পুনরায় ব্যবসায়ে লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার আশা ছিল স্বামী বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া ধার শোধ দিবেন এবং নিজ পরিবারকেও সুখী করিবেন, কিন্তু জীজাবাইয়ের কপাল মন্দ, আশা পূর্ণ হয় নাই। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মিলে নাই। যে মনোবৃত্তি থাকিলে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা যায় তুকারামের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। অনেক খরিদ্দার তাঁহার নিকট হইতে ধারে জিনিস নিত, সময়ে ধার শোধ করিত না; আবার অনেকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে ঠকাইত। এভাবে মহাজনের টাকা যথা সময়ে শোধ দিতে না পারায় তাঁহার ব্যবসা ফেল পড়িল। ব্যবসাক্ষেত্রে দেনা-পাওনা পরিষ্কার রাখিতে হয়, পাওনা আদায় করিতে হইলে যে প্রকার কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন তাহা না থাকিলে ব্যবসা গুটাইতে হয়। যে কূটবুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। ব্যবসায়ে কোমল বৃত্তির স্থান নাই। সুতরাং ব্যবসাক্ষেত্রে মার খাইবেন ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। দৃঢ়তার অভাব থাকিলেও তিনি একবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিলেন। ব্যবসায়ে লাভ হইল। প্রচুর অর্থ নিয়া গৃহে ফিরিয়া পাওনাদারের ধার শোধ দিবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু ভবিতব্য সব বানচাল করিয়া দিলেম, গৃহে ফিরিবার পথে কোন পাওনাদার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে হাতকড়ি দিয়া টানিয়া নিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল, নিজের পাওনাদারের কথা ভুলিয়া গেলেন। টাকা দিয়া ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিলেন। কিন্তু আপন সংসারের প্রতি কর্তব্য অবহেলা করিলেন, কোমল বৃত্তির স্ফুরণে সংকীর্ণতা দানা বাঁধিতে পারে না। তুকারাম খালি হাতে বাড়ী

ফিরিলেন, স্ত্রী স্বামীকে ভীষণ তিরস্কার করিলেন। দেনা শোধ হইল না, সংসার-সুখ চুলোয় গেল। পাওনাদারেরা তাঁহাকে খুব অপমানিত করিলেন। নিজের মাথায় বোঝা নিয়া পরের জন্ম কাষ্ঠাহরণ করা যাহাদের স্বভাব তাদের পদে পদে দুর্দশা, বিপদ তাহাদের ছায়ার মত অনুসরণ করে, তথাপি স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমারের মত তুকারামেরও সেই দশা ঘটিল। কিন্তু এই বিপর্যয় তুকারাম শান্ত ভাবেই নিলেন। পাওনাদারের লাঞ্ছনা এবং স্ত্রীর গঞ্জনা উভয়ই তিনি 'যা করেন ভগবান' এই দৃষ্টিতে নিলেন। তিনি বুঝিয়াছেন দুই নৌকায় পা দেওয়ায় বিপদ আছে। ভগবান এবং শয়তানকে একসঙ্গে সেবা করা চলে না। তিনি নিকৃষ্টের সেবা ছাড়িয়া উৎকৃষ্টের পদানুসরণ বাছিয়া নিলেন। হয়ত ভগবান ভক্তির মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই ভক্তকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলিয়া গড়িয়া তুলিলেন। এইভাবে তুকারাম ধীরে ধীরে ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবৎ-ধ্যানে কাটাইয়া দিবেন মনস্থ করিয়া তুকারাম বম্বানাথ পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় লইলেন।

তুকারামের এক ভাই ছিল। তাহার নাম কানাইয়া। পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কিছু দলিল-পত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি তুকারামের নিকট লইয়া গেলেন। তখন তুকারামের মানসিক অবস্থা অন্য রকম। বিষয়সম্পত্তির কোন প্রয়োজন নাই বোধ করিয়া তিনি দলিলগুলো নদীতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। নদীর স্রোতে দলিলগুলি ভাসিয়া গেল, ছোট ভাই দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তুকারাম বম্বানাথ পাহাড়ের গুহায় থাকেন দেখিয়া স্থানীয় এক চাষীর মাথায় খেয়াল চাপিল যে পাহাড়ের জমিতে যে ফসল হয় সেগুলি পাখীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুকারামকে পাহারাদার রাখিলে সে লাভবান হইবে। কিন্তু তুকারামের মানসিক অবস্থা অন্য রকম, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন ভগবান প্রচুর শস্য দিয়াছেন, তাহা শুধু মানুষই ভোগ করিবে এবং অন্যেরা বঞ্চিত হইবে তাহা হইতে পারে না। ভগবান মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট সবই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকলের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ শুধু সুবিধা ভোগ করিবে এবং পাখীগুলি না খাইয়া মরিবে তাহা কখন ভগবৎ বিধান হইতে পারে না। তাঁহার উদার মনোভাবের ফলাফল কি হইল তাহা সহজে অনুমেয়। কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া চাষী তুকারামের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত কোর্টে নালিশ রুজু করিল। পাখীতে ফসল নষ্ট করিয়া চাষীর ক্ষতি করিয়াছে সুতরাং ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য তুকারামকে তলব করা হইল। বিচারের

ফলে তুকারাম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন। তার উপর শাস্তিও উপরি পাওনা হইল। জগতে বিচারের ধারা এই রকম।

তুকারাম এখন পাণ্ডারপুরে থাকেন। যখন মন্দিরে ভগবৎনাম কীর্তন, হরিকথা হইত তখন তিনি সকলের সামনে আসনে বসিতেন। ভক্তদের মন্দির দর্শনের সুবিধার জন্য তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখিতেন, রাস্তায় ইট পাথর দেখিলে সরাইয়া দিতেন। কীর্তনের সময় গায়ক, বাদক এবং শ্রোতাদের আরামের জন্য পাখা করিয়া তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিতেন। ভগবৎ সেবা, ভক্ত সেবা তাঁহার কাজ, অন্য দিকে মন নাই। বহু বৎসর এরূপ নিষ্ঠাপূর্বক সেবা করিয়া তাঁহার মন অন্তর্মুখীন হইল। জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ রচিত অভঙ্ (ভজন) গাইয়া বিটোবার গভীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন। নামদেব রচিত অভঙ্ তাঁহার সবচেয়ে ভাল লাগে। তাঁহার নিজেরও অভঙ্ রচনা করিবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু ভাষার উপর তাঁহার দখল ছিল না বলিয়া প্রথমে উহা করিতে সাহস করেন নাই। এক জ্যোৎস্না রাত্রে পাণ্ডারপুরে মন্দিরে যাইতে যাইতে তাঁহার ভাব হয়। ভাবের ঘোরে দেখিলেন বিটোবা তাঁহাকে অভঙ্ রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন। ইহার পর তিনি রচনার কাজে হাত দিলেন, অন্তরে লুপ্ত স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বহু অভঙ্ রচনা করিলেন।

এই ভাবে ক্রমশ তুকারামের সুনাম চারিদিকে ছড়াইলে বহু লোক এবং ভক্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় ধার্মিক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর পণ্ডিত, দানবীর বৈশ্য সন্তোজী তেলি প্রধান। তাঁহার ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া অনেকের হিংসাও হইল। মুম্বাজী গোঁসাই দেহুর প্রতিভাশালী ব্যক্তি, জাতিতে শূদ্র, তাঁহার এত দিনের প্রভাব কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি হিংসায় জ্বলিতেছিলেন। সর্বসমক্ষে প্রতিবাদীর দোষ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে জব্দ করিবার মতলবে তিনি তুকারামের নামকীর্তনে যোগ দিতেন, মন ভগবৎমুখী হইবে বলিয়া নয়। বিষয়াসক্ত মন। প্রতিহিংসা নেওয়ার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সুযোগও আসিয়া গেল। একদিন রাস্তা দিয়া যাইবার সময় তুকারামকে একা পাইয়া মুম্বাজী তাঁহাকে প্রহারে জর্জরিত করিলেন। তুকারাম কিছুকাল শরীরের ব্যথায় ভুগিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিলেন না। ভগবৎ চিন্তায় মন নিমগ্ন রাখিতেন বলিয়া প্রহারও ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সুস্থ হইয়া পরে কীর্তনের সময় মুম্বাজীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন যে প্রহারের জন্য তাঁহার (তুকারামের) কষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু মুম্বাজী

নামকীর্তনে যোগ দিতেছেন না বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। বরং মুম্বাজীর অনুপস্থিতি তাঁহাকে অনেক বেশী কষ্ট দিতেছে। নামকীর্তনে পূর্ব যেমন নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন এখন যদি দয়া করিয়া সেই রকম উপস্থিত থাকেন তবে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন। হিংসুক মুম্বাজীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মনে পরিবর্তন আসিল। তুকারামের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ভক্তের সংস্পর্শে মনের কালিমা মুছিয়া যায়।

একবার জনৈক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরঙ্গের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে তিনি যেন তাঁহার (ব্রাহ্মণের) হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া আলোর সন্ধান মিলাইয়া দেন। তখন ব্রাহ্মণ অন্তরের বাণী শুনিলেন যে তিনি যদি জ্ঞানদেবের সমাধিমূলে গিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

যথাস্থানে গিয়া প্রার্থনা করিবার পর ব্রাহ্মণ আবার পূর্বের ন্যায় বাণী শুনিলেন যে দেহুতে গিয়া ভক্ত তুকারামের উপদেশ অনুযায়ী চলিলে তাঁহার কল্যাণ হইবে। ব্রাহ্মণ তুকারামের নিকট আসিলেন। তুকারাম তাঁহাকে খুব অভ্যর্থনা করিলেন। উপদেশচ্ছলে কয়েকটা অভঙ্ রচনা করিয়া একটা নারিকেল সহ তাঁহাকে উপহার দিলেন। অভঙ্গুলি সংস্কৃত তথা দেবভাষায় রচিত হয় নাই, মারাঠী ভাষায় রচিত বলিয়া ব্রাহ্মণ অভঙ্ এবং উপহার গ্রহণ না করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। অভিমানের ফল বঞ্চনা, আর অদৃষ্টে না থাকিলে কিছু হইবার নয়। কোনণ্ডাবা নামে অন্য একজন ব্রাহ্মণ অভঙ্ এবং নারিকেল উপহার গ্রহণ করিলেন। নারিকেলের মধ্যে প্রচুর সোনা পাইয়া ব্রাহ্মণ নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। উক্ত নারিকেল উপহারটি কোন ধনী ভক্ত তুকারামকে দিয়াছিলেন। বার বার চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকার দান তুকারামকে গ্রহণ করাইতে সমর্থ না হইয়া কৌশলে নারিকেলটি উপহার দিয়াছিলেন। তুকারাম উদাসীন, বিষয়ে প্রয়োজন নাই, নারিকেল উপহারটিও দান করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ধর্মীয় প্রসঙ্গ সংস্কৃত ভাষাতেই আবদ্ধ ছিল। মারাঠী ভাষার কদর তখনও তেমন হয় নাই। তুকারাম মারাঠী ভাষায় অভঙ্ রচনা করেন। দেবভাষায় রচিত নয় বলিয়া উহা লোকের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করিতেছে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ দল বাঁধিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জোর করিলেন, 'অভঙ্গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।' অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তুকারাম তাঁহাদের কথায় অভঙের পাণ্ডুলিপিগুলি ইন্দ্রাণী নদীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বিবেচনা না করিয়া ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় এরূপ অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া পরে অতিশয় অনুতপ্ত

হইলেন কেননা উক্ত অভঙ্‌গুলি যদিও তিনি রচনা করিয়াছেন তথাপি তাঁহারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ঐগুলি বিটোবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তের দিন উপবাসে কাটাইলেন। ইষ্ট বিটোবার কৃপা হইল। তিনি দর্শন দিয়া বলিলেন 'অভঙ্‌গুলি নষ্ট হয় নাই। একটা নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত আছে, ঐখানে ডুব দিলে ঐগুলি উদ্ধার হইবে।' ঘটনাও তাই হইল। তুকারাম ইন্দ্রাণী নদীতে যথাস্থানে ডুব দিয়া পাণ্ডুলিপিগুলি পাইলেন। বহুদিন জলের নীচে থাকা সত্ত্বেও ঐগুলি নষ্ট হয় নাই, অক্ষত ছিল। ইষ্টের কৃপার কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

প্রেম ভক্তি ভালবাসা দ্বারা তুকারাম সমাজে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা অনেকে পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়া যায় তাঁহারা ইহা সহ্য করিতে পারেন না। বিদ্বেষের বীজ হাওয়াতে ছড়াইয়া থাকে, যে কোন সময় উহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। মুম্বাজীর রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহাকে গ্রাম ছাড়া করিবার জন্য স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ, তুকারামের অভঙ্ এবং নামকীর্তন সনাতন ধর্মের ভিত্তি নষ্ট করিতেছে। ঐগুলি নদীতে ফেলিয়া নষ্ট করিতে হইবে নইলে ধর্ম রসাতলে যাইবে। তুকারাম একবার ব্রাহ্মণদের কথায় অভঙের পাণ্ডুলিপি ইন্দ্রাণী নদীতে বিসর্জন দিয়া তাহার জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইষ্টের কৃপায় তাহা ফেরত পাইয়াছেন। দ্বিতীয়বার তিনি সেই ভুল করিতে প্রস্তুত নন। মুম্বাজীর দলের প্ররোচনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মুম্বাজীর দলের জিদ রহিল না বলিয়া তাঁহারা তুকারামকে অজস্র গালাগালি করিলেন। তুকারাম ভক্ত, কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া সব নীরবে সহ্য করিলেন। প্রত্যেক কাজের প্রতিক্রিয়া আছে। ইহার কিছুকাল পরে রামেশ্বর ভট্ট কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। অনেক রকমের চিকিৎসা হইল, রোগের উপশম দেখা দিল না। ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়াছেন। অবশেষে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তুকারামের শরণাপন্ন হইলেন। উদারস্বভাব ভক্ত তুকারামের মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব নাই। রামেশ্বর ভট্ট যে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছেন সেকথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন। তিনি রামেশ্বর ভট্টকে আলিঙ্গন করিলেন। রামেশ্বর ভট্টের শারীরিক রোগ ত দূর হইলই, মানসিক হিংসাবৃত্তি-রূপ রোগও সারিয়া গেল।

গোলাপে কাঁটা থাকে। কাঁটাশূন্য গোলাপ গাছ দেখা যায় না। ভগবৎ রচিত উদ্যানে তুকারাম গোলাপ স্বরূপ, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জীজাবাই কণ্টক স্বরূপ। স্বামীর উদাসীনতা তাঁহাকে মর্মে বিদ্ধ করিয়াছে, সংসার-সুখ মিলে নাই। সেজন্য স্বামীকে দোষারোপ করিতেন এবং কখনও কখনও অত্যাচারও করিতেন। মুখরা স্ত্রীর বাক্যবাণ ভীষণ। একদিন স্ত্রীর অত্যাচারের মাত্রা এত অধিক হইল যে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুকারাম জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন এবং ভগবৎধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। জীজাবাইয়ের ক্ষোভের প্রধান কারণ স্ত্রীর প্রতি এবং সংসারের প্রতি স্বামীর উদাসীনতা। বিরক্তির আরও কারণ ছিল; ছেলেপিলেদের লালনপালন, শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব স্ত্রীলোক হইয়া তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। সাংসারিক দৃষ্টিতে জীজাবাইয়ের যুক্তি প্রবল, খণ্ডন করিবার উপায় নাই। কিন্তু তুকারামের মন বিটোবার পায়ে সমর্পিত। ফিরাইয়া নিতে পারেন না, উদাসীন মনকে সংসারে লাগাইতে পারেন না। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার প্রতিকার করেন না এবং জীজাবাইয়ের কথার প্রতিবাদও করেন না। স্ত্রীলোক সাধারণত কোমল প্রকৃতির হয়। জীজাবাই মানুষ, হৃদয় আছে। স্বামী পরম দেবতা, তাঁহাকে দুর্ব্যবহার করার জন্য মনে অনুশোচনা হইল। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁহার ভগবৎ চিন্তার কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবেন না। ভগবৎ কৃপায় স্বামীর সংসার বন্ধন শিথিল হইয়াছে। ঐ বন্ধন আবার দৃঢ় করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। জীজাবাইয়ের প্রতিশ্রুতিতে তুকারাম গৃহে ফিরিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া স্ত্রী পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন এবং পূর্ববৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। একদিন কোন কারণবশতঃ ভীষণ রাগান্বিত হইয়া জীজাবাই একখানা আখ নিয়া স্বামীকে ভীষণ প্রহার করিলেন, আখখানা দুই খণ্ড হইয়া গেল। স্ত্রীর প্রহারে জর্জরিত হইয়াও তুকারাম ধৈর্য হারাইলেন না। মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আমাদের দুইখানা আখের প্রয়োজন সেজন্য আখখানাকে ভাঙিয়া দুইখানা করা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।' জীজাবাই যে একাই স্বামীর প্রতি বিরূপ ছিলেন তা নয়। অন্যান্য ভক্তের পরিবারবর্গও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কারণ তুকারামের প্রভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীও নিজ নিজ স্ত্রীর এবং সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা (পরিবারবর্গ) জীজাবাইয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তুকারামের প্রতি আক্রোশ মিটাইবার জন্য একদিন লোহ-গাওয়ের শিবকেশকারের পত্নী উক্ত পরিবারবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে জীজাবাইয়ের স্বামীর মাথায় ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইলেন। তুকারামের

মাথা পুড়িয়া গেল, শরীরে ফোস্কা পড়িয়া ঘা হইল, শরীরের উপর অনেক কষ্ট গেল। ঘা শুকাইতে অনেক দিন লাগিল। কিন্তু তুকারাম উক্ত মহিলার প্রতি কখনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন নাই, একটি অভিশাপ বাণী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই, বরং অন্যান্য ভক্তদের অনুরোধ করিলেন যে তাঁহারা যেন উক্ত মহিলার প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার না করেন। প্রকৃত ভক্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হন না। সুখ দুঃখ ভগবানের দান বলিয়া মাথা পাতিয়া নেন।

আর একদিন তুকারাম ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন আছেন, হঠাৎ লোহগাওয়ের একজন দরিদ্র স্ত্রীলোক একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তুকারামকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহার ছেলেকে বাঁচাইয়া দিতেই হইবে। শোকাতুরা রমণী অভিমানভরে বলিলেন যে যদি তাঁহার প্রাণের পুতলি বাঁচিয়া না উঠে তবে তিনি প্রকাশ্যে চারিদিকে প্রচার করিবেন যে তুকারাম মহা ভণ্ড, তাঁহার ধর্মে কোন সার পদার্থ নাই। মানুষের দুঃখে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিতে পারে না, যে ধর্ম মানুষের দুঃখ দূর করিতে পারে না সে ধর্মের কোন মাহাত্ম্য নাই। যে ভগবান মৃত্যুরূপ অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারেন না সে ভগবান শক্তিহীন আর যে ঐরূপ শক্তিহীন ভগবানের উপাসনা করে সে শুধু পাগল নয় সে সমাজের অভিশাপ। তাহার জীবনের কোন মূল্য নাই। প্রকৃত ভক্ত সব সহ্য করিতে পারেন, শারীরিক, মানসিক কোন কষ্টই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি স্পর্শকাতর। তিনি কখনও ইষ্টনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। সাপের লেজে পা দিলে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফণা তুলিয়া আত্মরক্ষায় সচেতন হয়। ভক্তও ইষ্টনিন্দায় তাহার প্রতিকারে ব্যস্ত হন। তাঁহার ইষ্ট বিটোবাজী শক্তিহীন এবং তাঁহার নামের কোন মাহাত্ম্য নাই এই অপবাদ তিনি কখনও স্বীকার করিতে পারেন না। লোকের মনে বিশেষত উক্ত শোকাতুরা রমণীর মনে এই ধারণা যাতে দানা বাঁধিতে না পারে তাহার জন্য তুকারাম বিটোবার নিকট কাতর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান ভক্তবৎসল। ভক্তির মহিমা বৃদ্ধি এবং ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি অসম্ভব সম্ভব করেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, ভক্ত তুকারামের কাতর প্রার্থনা বৃথা যায় নাই, বিটোবার কৃপায় পুত্রহীনা রমণী পুত্র ফেরত পাইলেন। মৃত সন্তান পুনর্জীবন লাভ করিয়া শোকাতুরা মাতার শোক নিবারণ করিল। মাতা বুকের ধন কোলে নিয়া ভক্ত তুকারাম এবং বিটোবার গুণকীর্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

এই ঘটনার পর তুকারামের সুনাম আরও ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার গুণে

মুগ্ধ হইয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হিন্দুধর্মের প্রধান স্তম্ভ, অত্যাচারী বিধর্মীদের কবল হইতে উৎপীড়িতদের আশ্রয় দান এবং তাঁহাদের স্বধর্ম পালনে সাহায্য দান তাঁহার ব্রত, এই ব্রত পালন করিতে হইলে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মাওলি সৈন্যদের সুশিক্ষিত করিয়া তরণ্ড দুর্গ অধিকার করিবার পর তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে গিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল। এবং তিনি আফজল খাঁর মত বীরকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধুভক্ত শিবাজী তুকারামের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তুকারাম শিবাজীকে সাধকশ্রেষ্ঠ রামদাস স্বামীর নিকট পাঠাইলেন। ভাগ্যক্রমে রামদাস স্বামী তখন পাণ্ডারপুরে ছিলেন। বিটোবার মন্দিরে তিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়া হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সনাতন ধর্ম স্থাপনের কর্মপদ্ধতি স্থির হইল। এই তিন শক্তিশালী পুরুষের চিন্তাধারা মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এক হিসাবে ধরিতে গেলে হিন্দুধর্ম ও সাম্রাজ্য স্থাপন পরিকল্পনায় তাঁহাদের অবদান অপরিমেয়। তুকারাম পৃষ্ঠপোষক, রামদাস স্বামী প্রেরণাদাতা সংগঠন কর্তা। এই দুই মহাপুরুষের শুভেচ্ছা, সংগঠনশক্তি এবং পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে শিবাজী বিধর্মীর প্রবল প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও টিকিয়া থাকিতে এবং শক্তিশালী হইয়া হিন্দু ধর্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন কিনা কে বলিতে পারে।

জীবননাট্যে তুকারামের যে ভূমিকায় অভিনয় করিবার কথা ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ তাহা হইয়াছে। এখন নূতন কিছু জানিবার বুঝিবার নাই। প্রিয়তমের নিকট হইতে যাইবার ডাক আসিয়াছে। সময় হইয়াছে, এখন যাইতে হইবে। ইষ্ট তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। তুকারাম প্রকৃতির স্তরে স্তরে প্রিয়তমের মধুর স্পর্শ অনুভব করিতেছেন। শীতের শেষে ঝরা পাতায়, বসন্তের আগমনে বৃক্ষের নব পল্লবোদ্গমে, শিশিরসিক্ত দূর্বাদলে, ফুলের সুবাসে, পাখীর সুমধুর কণ্ঠে ইন্দ্রাণী নদীর কলকল ধ্বনিতে—সর্বত্র প্রিয়তমের স্পর্শ তাঁহার প্রাণে বিমল আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়াছে। তুকারাম বলিতেন 'যে দিকে আঁখি ফিরাই দেখি সকলই তাঁহার মহিমা। প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। দেখি আমি তাঁহাতে এবং তিনি আমাতে বিদ্যমান। উভয়ের পৃথকত্ব ঘুচিয়া গেল। সবই অনন্তে মিলিয়া গেল। তরঙ্গের সত্তা সমুদ্রে মিলাইয়া গেল। দেখি সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, একমাত্র আত্মাই আছেন। আত্মা সূর্যে উদয় অস্ত নাই'।

এই অভঙের মধ্যে তুকারামের জীবন দর্শন বেশ ভাল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬৫০ সালে দেহুতে তাঁহার জীবনদীপ মহাকাশে মিলাইয়া গেল। অধ্যাত্ম জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। দেহুতে যে স্থানে তাঁহার দেহ সৎকার করা হইয়াছে তাহা ভক্তদের তীর্থস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ভক্ত তুকারাম অমর হইয়া রহিয়াছেন।

॥ উনিশ ॥

নামদেব

প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান কর্তব্য। তাহাদের মঙ্গলের জন্য রাজাকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যসেবী রাজাই প্রজার বিশ্বাসভাজন হন। চারিত্রিক আদর্শে তিনি জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুস্থ অবস্থিতি, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য সকলই তাঁহার উপর নির্ভর করে। তিনি পথ প্রদর্শক, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু আদর্শের মৃত্যু রাজ্যের প্রধান বিপদ। কোন না কোন কারণবশতঃ আদর্শচ্যুত হইলে তিনি প্রজার আনুগত্য দাবি করিতে পারেন না। কর্তব্যভ্রষ্ট রাজা প্রতিষ্ঠালাভে বঞ্চিত হন, লোকের শ্রদ্ধা হারান। তখন কোন প্রবল শত্রু আক্রমণ করিলে দিশেহারা হন।

রামদেব গিরি দেওগিরির রাজা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদ্‌শা বহু সৈন্য নিয়া দেওগিরি আক্রমণ করেন। মালিক কাফুর প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি। রামদেব গিরি প্রবল শত্রুসৈন্যের চাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজধানী দিল্লীতে নীত হইলেন। ছয়মাস পর দিল্লীর অধীনে সামন্ত রাজা হিসাবে দেশে ফিরিলেন। আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ২।৩ বৎসরের মধ্যে মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নির্ভীক চরিত্রবান্ পথ প্রদর্শকের অভাবে প্রজাগণ দিশেহারা হইল। সমাজ ও রাষ্ট্রে বহু জটিল সমস্যা দেখা দিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতা নৈরাশ্য। তখন প্রয়োজন ছিল আত্মপ্রত্যয়শীল, নির্ভীক, ন্যায় ও নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির, যিনি সকলের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিতেন, সমাজ, জাতি, দেশ ও আদর্শের জন্য

স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বিকৃত মানবতাকে পথ দেখাইতে পারিতেন। দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে নামদেব দেওগিরির অন্তর্গত নরসিংহপুর গ্রামে নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দামাসেট দরিদ্র, সামান্য দর্জির কাজ করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। আভিজাত্যের শিক্ষা, দীক্ষা, আবহাওয়ায় বর্ধিত হইবার সুযোগ না মিলিলেও ভগবৎ কৃপায় নামদেবের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ ব্যাহত হয় নাই। মহত্ত্ব উচ্চ বংশের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, জন্মগত শুভ সংস্কার থাকিলে নীচ কুলে জন্ম নিলেও উহার স্ফুরণ হইতে পারে। দামাসেট দরিদ্র হইলেও সৎ, পরিশ্রমী, সত্যসেবী, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ধর্মপরায়ণ, ভগবৎ কৃপা তাঁহার উপর আছে। দারিদ্র্যের বহু দোষ, মানুষের গুণরাশি নষ্ট করে, কিন্তু দামাসেটকে কোনদিন সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

দীর্ঘায়ু হইয়া পুত্র ধর্মজীবন যাপন করে ইহা প্রত্যেক পিতা মাতা কামনা করেন। নবজাত বালকের ভবিষ্যৎ কিরূপ জানিবার জন্য পিতা দামাসেট জ্যোতিষী ডাকিয়া তাহার জন্ম-পত্রিকা তৈয়ার করাইলেন। জ্যোতিষের গণনা অনুযায়ী পুত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইবে, তবে ঐহিক সম্পদ নয়, আধ্যাত্মিক সম্পদ, ঐ সম্পদ দ্বারা অগণিত লোকের দুঃখ মোচন করিবে এবং সত্য পথ হইতে কখনও চ্যুত হইবে না—ইত্যাদি বিষয় জানিয়া নির্লোভ পিতা দামাসেটের প্রাণে আনন্দ হইল।

মানুষ এক ভাবে আর হয়। যাহা আশা করে তাহা ফলে না। দুর্ভাগ্য-বশতঃ জ্যোতিষীর গণনা প্রথমে সত্য বলিয়া মনে হইল না। যৌবনের উন্মেষে পুত্রের সৎবৃত্তির স্ফুরণ হয় নাই। হইয়াছে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির এবং উহার প্রচণ্ডতা এত তীব্র যে কল্পনা করা কঠিন। পুত্র ডাকাতদলের সর্দার হইল এবং সকলের মহাভীতির কারণ হইল। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী কাজের মধ্যে গা ঢালিয়া দিল। সৎ গৃহস্থের ঘরে জন্ম নিয়া কেন যে এরূপ পেশা গ্রহণ করিল তাহার কারণ বুঝা যায় না। তবে ইহা সত্য যে অশুভ এবং শুভ সংস্কার নিয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যখন যে সংস্কার প্রবল হয় তখন সেই সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। তাহার প্রভাব কমিয়া গেলে অন্যটার দ্বারা চালিত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণে পুত্রের জীবনের প্রারম্ভে জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা ফলে নাই। এই সময়ে তাহার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহা দ্বারা তাহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল।

স্থান অম্বোধিয়া দেবীর মন্দির। গভীর অরণ্যবেষ্টিত এই দুর্গম স্থানে সাধারণ

দিনে লোকজন আসে না। পূজারী কোনমতে পূজা সারিয়া আসে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। রীতিমত মেলা বসে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দূর দূর দেশ হইতে বহু ভক্ত পূজা দিতে আসে। বিশেষ পূজা উপলক্ষে শুধু যে ভক্তের আগমন হয় তা নয়, দেবীর পূজা দর্শন, যাত্রীদের নিকট কিছু প্রাপ্তি এবং পূজাশেষে দেবীর প্রসাদের আশায় বহু গরীব দুঃখীও আসে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী, দেবীর বিশেষ পূজা। বহু দীন দুঃখী আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিশুপুত্র কোলে নিয়া এক মহিলাও আসিয়াছেন। দুই দিন আহার জোটে নাই। মাতৃস্তন্য ছাড়া শিশুর কপালেও কিছু জোটে নাই। দেবীর পূজা উপলক্ষে মন্দিরের কিছু প্রসাদী অন্ন ভিক্ষা মিলিলে শিশুর মুখে দিবে এবং নিজেও খাইবে এই আশায় দূর গ্রাম পদ্‌না হইতে কষ্ট করিয়া এই মহিলা আসিয়াছেন। মহিলা অভিজাত বংশের। এক সময়ে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্বামী দেওগিরি রাজ্যে সেনা বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আজ কপালদোষে তাঁহার এবং কোলের শিশুর চরম দুরবস্থা হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পথের ভিখারী হইয়াছেন। ৮৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া রাজকার্যে যাইবার পথে অম্বোধিয়ার গভীর জঙ্গলে তিনি দুর্দান্ত ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সদলে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলার দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়াছেন।

অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনা যে ভিক্ষা ব্যতীত নিজের এবং কোলের শিশুর জীবন ধারণের আর কোন পথ নাই। তাই আজ শিশু কোলে পূজামণ্ডপের নিকট প্রসাদের আশায় অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষুধার জ্বালায় শিশু চীৎকার করিতেছে, এমন সময়ে বীর বেশে সজ্জিত কোন আগন্তুক অশ্বারোহী দেবী মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে মন্দিরে আসিয়া দেবীর চরণে অর্ঘ দেন, তবে তিনি কে, কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি খবর জানিবার জন্য কাহারও কোন দিন আগ্রহ দেখা যায় নাই। পূজার সময় মাতৃকোলে শিশুর ক্রন্দনে বিরক্ত হইয়া মহিলাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'এটা বাড়ী নয়, দেবীর মন্দির, ভক্তগণ অনন্যমনে মায়ের পূজা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিরক্ত করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।' আভিজাত্যে ঘা পড়িলেও মহিলার কোন উপায় নাই। প্রাণের তাগিদে এই গভীর রাত্রে শিশুকোলে এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি ছলছল নেত্রে বলিলেন, 'আমিও এক সময় ধনীর গৃহিণী ছিলাম। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ পথের ভিখারী হইয়াছি'। মহিলার কথায় আগন্তুক অশ্বারোহীর হৃদয় করুণায়

গলিয়া গেল। ঐ আগন্তুকই যে তাঁহার স্বামীহন্তা তাহা মহিলা জানেন না। আপন দুঃখের বোঝা লাঘব করিবার জন্য মহিলা ক্রুদ্ধা হইয়া যখন স্বামীহন্তাকে অভিশাপ দিলেন তখন আগন্তুকের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল কারণ তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলার স্বামীহন্তা, ডাকাতদলের সর্দার। তিনিই লোভের বশে অম্বোধিয়ার জঙ্গলে ৮৪ জন অশ্বারোহীকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে বহু স্ত্রীর বৈধব্য ঘটিয়াছে, বহু বালক-বালিকা পিতৃহীন হইয়াছে। তাহারই জন্য বহু লোক গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। তাহাদের দুঃখের জন্য তিনিই দায়ী। আর এই মহিলা তাহাদের অন্যতম। তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, পাপ মোচনের জন্য অম্বোধিয়ার জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেবীর পূজা দেন কিন্তু আজ কৃষ্ণা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উক্ত নারীর কোলে অসহায় শিশুর করুণ ক্রন্দন, মাতার অশ্রু বিসর্জন এবং স্বামীহন্তার প্রতি বিধবার অভিশাপ তাঁহার (আগন্তুকের) জীবন অসহ্য করিয়া তুলিল। তাঁহার বোধ হইল যিনি এত লোকের সর্বনাশ করিয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার কোন অধিকার নাই! এ যে অসহ্য যাতনা, বৃশ্চিক দংশনের চেয়েও বেশী। ইহার হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে হয় তাঁহাকে শোধরাইতে হইবে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিতে হইবে, কিন্তু এখন শোধরাইবার কোন উপায় নাই। একমাত্র উপায় আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, এই পাপের খণ্ডন নাই এবং পাপের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয় না, এই সব তাঁহার ভাবিবার সময় নাই। আর কোন উপায় নাই দেখিয়া আগন্তুক ত্বরিত গতিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীর খড়্গ লইয়া নিজের গলায় বসাইয়া দিলেন। ফিন্‌কি দিয়া রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্ষতস্থানের রক্ত পূজার বেদী, দেবীর অঙ্গ কলুষিত করিল। মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতেরা তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। দেবীর সম্মুখে আগন্তুকের আত্মহত্যার চেষ্টা বিফল হইল। খড়্গাঘাতে মৃত্যু ঘটিল না। দেবীর কৃপায় প্রাণরক্ষা পাইল। হয়ত তাঁহার বাঁচিবার প্রয়োজন ফুরায় নাই। তাঁহার দ্বারা কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করাইবার জন্যই দেবী তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে শোধরাইয়া পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। যে আগন্তুককে নিয়া এইরকম লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিল তিনি আর কেহ নন্, তিনিই প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষ নামদেব।

উপরি-উক্ত ঘটনার পর তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্তন আসিল। অনুশোচনায় দিনরাত হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। চোখ দিয়া অনর্গল ধারা বহিতে লাগিল। আর অম্বোধিয়ায় থাকা চলে না। একটা আশ্রয় চাই, পাণ্ডারপুরে বিটোবার পাদপদ্মে

শরণ নিলেন। অসহায় বিধবার অশ্রুজল তাঁহার চোখের অন্ধকার পর্দা ভাসাইয়া নিয়া ভগবৎলীলার নূতন ক্ষেত্র তৈয়ার করিল, পাষাণ হৃদয়ে ভক্তির বন্যা ছুটাইল। এই ভাবে নরসিংহপুরের কুখ্যাত ডাকাতের জীবনে পরিবর্তন আসিল। পাণ্ডারপুর আসিবার পর তাঁহার দুর্দমনীয় হিংসাবৃত্তি শান্ত হইল। তিনি বৈষ্ণব হইলেন। নূতন নাম হইল নামদেব। তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। বিটোবার মহিমা ধ্যানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে জ্ঞানেশ্বরী প্রণেতা বিখ্যাত মহাপুরুষ জ্ঞানদেব পাণ্ডারপুর বিটোবার মন্দিরে থাকিয়া ভগবৎ নাম কীর্তন দ্বারা জনগণের মধ্যে জ্ঞান ভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। তিনি সাধকদের পথ প্রদর্শক, কীর্তনীয়া দলের অধিনায়ক। তাঁহার প্রেরণায় বহু ভক্ত ও সাধকের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। নামদেব পাণ্ডারপুর আসিয়া জ্ঞানদেবের মত মহাপুরুষের সঙ্গলাভ, এবং তাঁহার কীর্তন শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলেন। নামদেব ভগবৎ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, গুরুকরণ হয় নাই। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত পথের কণ্টক দূর হয় না, তিনি উন্নত ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন গুরুর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন।

একদিন সুযোগ বুঝিয়া নামদেব জ্ঞানদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহার চাল-চলন, ভাব-ভক্তি, ভগবৎ-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'ভয়ের কোন কারণ নাই। ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলে জীবন কখনও বিফলে যায় না। সময় হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। বরসিগ্রামের বিশোয়া খেচরা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ। খুব উন্নত প্রেমিক সাধক, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন তিনিই নির্দিষ্ট গুরু। তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিবেন।' জ্ঞানদেবের পরামর্শে নামদেব উক্ত অন্তরঙ্গ প্রেমিক সাধকের নিকট ছুটিলেন এবং তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলেন। বিশোয়া খেচরা দেখিলেন ক্ষেত্র প্রস্তুত, বীজ রোপণ করিলে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। তিনি নবাগত প্রার্থীকে দীক্ষিত করিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌছানো যায় ততদিন ভগবৎ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। নামদেবের জীবনে গুরুর আশীর্বাদ ফলিল। গুরুর আদেশে নামদেব বরসিগ্রামে থাকিয়া বহুকাল তপস্যা ও ভগবৎ ধ্যানে কাটাইলেন। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে গুরু প্রীত হইলেন। নামদেবের ভগবৎ মত্ততার অবস্থা বিশোয়া খেচরা তাঁহার অভঙে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বরসিগ্রাম হইতে ফিরিয়া নামদেব জ্ঞানদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ গোরা কুমহারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিলেন। তিনিও নামদেবকে নিরন্তর ভগবৎ ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন।

ইহার পর গোরা কুনহার, সম্বৎ, বিশোযা খেচরা এবং অন্যান্য ভক্তদের নিয়া জ্ঞানদেব কীর্তন সাহায্যে জ্ঞান ভক্তি প্রচারের জন্য সদলে বাহির হইয়া বহু তীর্থ পরিদর্শন করিলেন। নামদেবও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। তীর্থস্থান হইতে ফিরিয়া জ্ঞানদেব বেশী দিন বাঁচেন নাই, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আধ্যাত্মিক স্রোত ব্যাহত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার স্থান পূরণের জন্য নামদেবই একমাত্র উপযুক্ত লোক বলিয়া বিবেচিত হইল। নামদেব আরও অর্ধশতাব্দীকাল বাঁচিয়া ভগবৎ গুণ-কীর্তন দ্বারা মানবতার সেবা করিয়াছেন, ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞানদেব জ্ঞানভক্তির যে স্রোত বহাইয়াছেন, নামদেব স্বীয় ত্যাগ তপস্যা ও কীর্তন দ্বারা তাহা অব্যাহত রাখিয়াছেন। পরবর্তীকালে তুকারাম প্রেম ভক্তির দ্বারা তাহা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। নামদেবের ভক্তি প্রচার মহারাষ্ট্র ব্যতীত দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের লোকদের মধ্যে একটা নূতন আলোড়ন আনিয়াছে। তাঁহার ভক্তিবাদ জাতিনির্বিশেষে সকলের নিকট সমানভাবে সমাদর পাইয়াছে।

নামরসে তিনি গভীরভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, ক্রমশঃ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইল। তিনি মনুষ্য ব্যতীত ইতর প্রাণীর মধ্যেও ভগবৎ সত্তা অনুভব করিলেন। একদিন বিটোবার মন্দিরপ্রাঙ্গণে নামকীর্তন শেষ করিয়া আহারে বসিয়াছেন। আহার সামান্যই, দুখানা রুটি এবং সামান্য দই, এই অবসরে হঠাৎ কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া রুটিগুলি লইয়া গেল। নামদেব প্রতি জীবের মধ্যে ভগবৎ সত্তা অনুভব করেন। দইয়ের পাত্র লইয়া কুকুরের পশ্চাতে ছুটিলেন, এবং বহু অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। শুধু রুটি খাইবেন না, কষ্ট হইবে, দই দিয়া খান।' নামদেব অনুভব করিলেন তাঁহারই ইষ্ট কুকুররূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া রুটি লইয়া গিয়াছেন।

ভগবৎ নামের অমোঘ শক্তি, তপস্যায় ঐ শক্তির স্ফুরণ হয়। নামদেবের মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে। মুক্তাবাই বিখ্যাত মহাপুরুষ জ্ঞানদেবের ভগ্নী। তিনি বিদুষী, ভক্তিমতী। তিনি বহু অভঙ্ রচনা করিরাছেন। নামদেবের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে এক সময় দেশে ভীষণ বন্যা হইল, বহুদিন যাবৎ অজস্র বৃষ্টি হওয়াতে বন্যার প্রবল স্রোতে বিটোবার মন্দির ভাসাইয়া নেওয়ার উপক্রম হইল, ইহাও বিটোবার মহিমা বলিয়া নামদেব গান রচনা করিয়া খুব আবেগ

ভরে গাহিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে অন্যান্য স্থান বন্যায় ভাসিয়া গেলেও বিটোবার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে উহার বেগ শান্ত হইয়াছে, নামদেবের অলৌকিক শক্তির জন্যই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই ঘটনার পর তাঁহার নাম যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সংলি গ্রামের ছোকা অতি সাধারণ লোক। গরীব নীচবংশে জন্ম। রাজমিস্ত্রির কাজ করে, কিন্তু অতিশয় ধার্মিক। জ্ঞানদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, গরীব হইলে এবং নীচ বংশে জন্ম নিলে মানুষ ধার্মিক হইতে পারিবে না এমন কোন কথা নাই। একদিন কোন বাড়ীতে মিস্ত্রির কাজ করিবার সময় হঠাৎ দেওয়াল চাপা পড়িয়া ছোকা মারা যায় দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, মাথা দেহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, এই দৈব-দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক মারা যায়। ভক্তেরা ছোকার মৃত অস্থি পাণ্ডারপুর আনিয়া সৎকার করিতে চায়, কিন্তু মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে তাহার দেহ খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইল না। অনন্যোপায় হইয়া ভক্তেরা নামদেবের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন ঘটনাস্থলে যত হাড় পড়িয়া রহিয়াছে প্রত্যেকটি কানের কাছে ধরিবে, যে হাড়গুলির মধ্যে বিটোবার নাম এবং মহিমাসূচক ধ্বনি শুনা যাইবে তাহাই ছোকার দেহ বলিয়া সনাক্ত করিবে। তাঁহার পরামর্শমত ছোকার দেহাস্থি স্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া পাণ্ডারপুরে যথারীতি সৎকার করা হইল।

নামদেব বহু অভঙ্ রচনা করিয়াছেন। উহাতে অহেতুকী ভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার গুরুগম্ভীর ভাব চিত্তাকর্ষক। তাঁহার অভঙ্ মহারাষ্ট্র সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। একটা অভঙে তিনি বলিয়াছেন: 'ছেলেরা ঘুড়ি উড়াইবার সময় যেমন সুতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ঘুড়ির দিকে দৃষ্টি রাখে, মেয়েরা মাথায় জলভরা কলসী নিয়া চলিবার সময় যেমন কলসীর উপর দৃষ্টি রাখে, অসতী স্ত্রী যেমন যেখানে থাকুক না কেন সর্বদা উপপতির বিষয় চিন্তা করে, চোর যেমন কি করিয়া অন্যের সোনা চুরি করিবে তাহা চিন্তা করে, কৃপণ যেমন সর্বদা সঞ্চিত ধনের কথা ভাবে, ভক্তও সেইরূপ যে কাজই করুক না কেন নিত্য ভগবৎ ধ্যানে মনকে নিযুক্ত রাখিবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দুঃ ভোগ করিয়া থাকে। অম্ল ফলের বীজ হইতে কখন সুমিষ্ট ফল হয় না, পাথরে চূর্ণ হইতে কখন জলের ধারা প্রবাহিত হয় না।' তিনি অন্যত্র আর এক অভঙে বলিয়াছেন, 'নিজ কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে, কামের তাড়না ভস্মাসুর দগ্ধ হইয়াছে চন্দ্র যক্ষা রোগগ্রস্ত হইয়া ভুগিয়াছে, ইন্দ্রের দেহ সহস্র ছিদ্রযুক্

হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মানুষের পবিত্র জীবন যাপন করা উচিত। ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিবার সময় সাধুরা ধোপার মত পরিশ্রম করেন, চৈতন্যের সাবানে মনকে ধৌত করেন, ধৈর্যের কাঠে উহাকে আছড়ান, জ্ঞানের স্রোতে উহাকে ধুইয়া বিশুদ্ধ করেন। মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সোনা-মাটি, যাহার নিকট সমান বোধ হইয়াছে একমাত্র তিনিই প্রেমিক বলিয়া দাবি করিতে পারেন, অন্যে নয়। যিনি পারেন তিনি পবিত্র, যোগী, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভগবৎ অনুভূতির অসীম ক্ষমতা। তিনি কৃপাময়, তিনি দুর্বলকে শক্তি দেন, জঙ্গলে নবজাত বাছুরকে মাতৃস্তন্য পান করিবার জন্য চালিত করেন। নবজাত সাপের বাচ্চাকে আত্মরক্ষার জন্য কামড়াইতে প্ররোচনা যোগান। অম্ল ফলের গোড়ায় যতই দুধ, মধু ঢালা হউক না কেন তাহাতে অম্ল ফলই হইবে মিষ্ট ফল কখনও হইবে না, আখ যত ইচ্ছা ছোট টুকরা করিয়া চিবানো হউক না কেন উহা মিষ্ট লাগিবে।'

নামদেব বুঝিলেন দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে! প্রেমময়ের ডাক আসিয়াছে। তাঁহার কোলে মাথা গুঁজিতে হইবে। ১৩৫০ সালে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার তিরোধানে ভক্তদের সমূহ ক্ষতি হইল।

॥ কুড়ি ॥

জ্ঞানদেব

আদর্শ নির্ণয় কঠিন সমস্যা। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এই সমস্যা বিদ্যমান। জীবনের মূল সূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আদর্শ নির্বাচন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। জীবনের লক্ষ্য সত্য আবিষ্কার গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা। সত্য, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তি, সবই একার্থ বাচক। আদর্শ নির্ণয়ের মূল্য অপরিমেয়। ইহা দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে, প্রাণধর্মের বিস্তার হয়। জীবনের মূল সূত্র সম্বন্ধে অজ্ঞানই বিপর্যয় আনে। তখন আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সাম্য, উদারতা, পবিত্রতা, প্রেম, ভাব, ভক্তি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। মানুষ একটা আদর্শ চায় যাহা অবলম্বন করিয়া সে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে।

তখন যদি কোন শক্তিমান্ পুরুষ শাস্ত্রসম্মত সার্বজনীন আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারেন এবং আবিষ্কৃত সূত্রটি জনকল্যাণের জন্য নিয়োগ করেন তবে উহার অনুষ্ঠান দ্বারা আদর্শ রক্ষা পায়। যিনি এরূপ আদর্শ স্থাপন করেন তিনি যুগের প্রতিনিধি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সার্থকজন্মা এবং 'ধন্য নরকুলে লোক যারে নাহি ভুলে'। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যুগ-প্রয়োজন মূর্ত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবন প্রগাঢ়, পূর্ণাঙ্গ। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাঁহার চিন্তা এবং কর্মে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার ভাব, ভাষা সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রাণে স্পন্দন জাগায়, শূন্যতা দূর করে, মানুষকে সংগ্রামশীল করে, জীবনের মূল্যবোধ বাড়াইয়া দেয়। প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনায় আদর্শ সম্বন্ধে নূতন আলো মিলিবে, ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে এবং সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়।

পৈটনারের নিকটে আপেগাঁও একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গোদাবরী নদীর উত্তরকূলে। এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস। বিট্ঠলপন্থ এই গ্রামের কুলকরণী। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান, উদার এবং সত্যসেবী, সমাজে তাঁহার স্থান আছে, লোকে গনে মানে। আপদে বিপদে প্রতিবেশীরা যথেষ্ট সাহায্য পায়। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মনে শান্তি নাই। তিনি অপুত্রক। বৈরাগ্যহীন সন্ন্যাসী যেমন অশান্তির আগুনে ছট্‌ফট্‌ করে, পুত্রহীন গৃহস্থও সেরূপ কষ্ট পায়, তাঁহার দুঃখ অন্যেরা বুঝিতে পারে না। পুত্রই পিতামাতাকে ইহকালে আনন্দ দেয়, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়, পুং নামক নরক হইতে ত্রাণ করে। সুতরাং পুত্রের অভাবে বিট্ঠলপন্থ এবং তাঁহার স্ত্রী রুকমাবাই যে কত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছিলেন তাহা বলিবার নয়। রুকমাবাইয়ের পিতা সিধোপন্থ, আরন্ধি গ্রামের কুলকরণী (গ্রামণী)। তিনিও বিপুল সম্পত্তির মালিক, কিন্তু পুত্রসন্তান নাই। একমাত্র কন্যা রুকমাবাইয়ের বিবাহের পর পুত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন। বিট্ঠলপন্থের পিতৃবিয়োগ হইলে জামাই সিধোপন্থকে আরন্ধিতে আসিয়া বাস করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহা হইলে জামাইয়ের মধ্য দিয়া পুত্রের অভাব অনেক পরিমাণে মিটাইতে পারিবেন। বিট্ঠলপন্থ শ্বশুরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। আরন্ধিতে আসিয়া বাস করিলেন। ২।৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিল। সাধ্বী স্ত্রী রুকমাবাইয়ের অনুমতি নিয়া তিনি বারাণসী আসিলেন এবং প্রসিদ্ধ সাধু রামানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রুকমাবাই আরন্ধিতে পিতৃগৃহে মনের দুঃখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রামানন্দ স্বামী রামানুজ সম্প্রদায়ের উত্তরসাধক। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ত্যাগী বৈরাগ্যবান এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উঁচুদরের সাধু বলিয়া খ্যাতি আছে তিনি ভক্তিবাদের প্রধান সমর্থক এবং রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া গোদাবরী অঞ্চলে ঘুরিতে ঘুরিতে আরন্ধি গ্রামে আসিলেন একদিন সিধোপন্থের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। কন্যা রুকমাবাই গৃহাগত সন্ন্যাসীকে আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রণাম করিলেন। সাধারণত সধবা স্ত্রী পুত্র কামনা করেন এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে 'সৎ পুত্র লা করিয়া জীবনে সুখী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এরূপ শুভ আশীর্বাদে কোন গৃহিণী আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু রুকমাবাইয়ের কপাল মন্দ, সৎ পুত্রের মাতা হইয়া সুখী হইবেন সে আশা নাই। স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়াতে সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ছলছল নেত্রে আপন দুঃখের কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। রামানন্দ স্বামী বুঝিতে পারিলেন, কিছুদিন পূর্বে বিট্টলপন্থ নামক যে শিষ্যকে তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন তিনিই এই রুকমাবাইয়ের স্বামী অতঃপর আশীর্বাদপ্রার্থী কন্যা রুকমাবাইকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'আমার কথ অন্যথা হইবার নয়। অবিলম্বে বারাণসীতে ফিরিয়া বিট্টলপন্থকে আদেশ করি যেন সে শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং সংসারে থাকিয়া আরও কিছুকাল গৃহস্থের জীবন যাপন করে।'

রামানন্দ স্বামী কথা রাখিলেন। বারাণসী ফিরিয়া শিষ্য বিট্টলপন্থকে গৃহে ফিরিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং শিষ্যকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবে না। তোমার ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিলাম। গুরুর পীড়াপীড়িতে বিট্টলপন্থ গৃহে ফিরিয়া দেশে গৃহস্থজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এইবার শ্বশুরবাড়ী আরন্ধিতে রহিলেন না। নিজ গ্রাম আপেগাঁওতে স্ত্রী রুকমাবাইকে আনিয়া নূতন ভাবে সংসার পাতিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্বা ফলিল। যথাসময়ে রুকমাবাইয়ের মাতৃত্ববাসনা সফল হইল। তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যার জননী হইলেন। তাঁহাদের নাম নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব এব মুক্তাবাই। প্রবন্ধোক্ত জ্ঞানদেব বিট্টলপন্থের দ্বিতীয় পুত্র। ১২৭১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষী জন্মপত্রিকা বিচার করিয়া দেখিলেন যে অতি শুভ লগ্নে বালকের জন্ম। রাশি নক্ষত্র সবই অনুকূল, কালে বালক মহাপুরুষ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। জন্মার্জিত শুভ সংস্কারের বলে বালক অসাধারণ প্রতিভাশালী হইবে। জ্যোতিষীর গণনা অনেকের পক্ষে সত্য হয়। বালকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

প্রমাণ অল্পবয়সেই পাওয়া গেল। সংসারের দিকে মন নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সদালোচনা, ধর্মাচরণ, শাস্ত্রপাঠ, জপ, ধ্যান অভ্যাস করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে তাহার ভাল লাগিত।

নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব এবং মুক্তাবাই দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সন্তান, দশবিধ সংস্কারের অন্যতম উপনয়ন হওয়া দরকার। সময় হইলেও একটা সামাজিক বাধা উপস্থিত হওয়াতে দেশে উক্ত সংস্কার সাধন সম্ভব হইল না। বিট্ঠলপন্থ সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আবার গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করাতে নীতিবিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে। সেইজন্য তিনি সমাজে পতিত, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে একঘরে করিয়াছে। দেশে বালকদের উপনয়ন সংস্কারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়াতে প্রয়োজনের তাগিদে বিট্ঠলপন্থ সপরিবারে পুণ্যতীর্থ নাসিকে আসিলেন। নির্দিষ্ট শুভদিনে বালকদের উপনয়ন সংস্কার হইয়া গেল। ইহরে পর বিট্ঠলপন্থ সপরিবারে ব্রহ্মগিরি পাহাড় পরিক্রমায় বাহির হইলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। জঙ্গল হইতে হঠাৎ একটা বাঘ তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দিল। ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলাইল। পরিবারের লোকজন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বড় ভাই নিবৃত্তিনাথ দলভ্রষ্ট হইয়া আতঙ্কে পলাইয়া এক গুহায় আশ্রয় লইলেন। ঐ গুহায় গহিনীনাথ নামে একজন উঁচুদরের যোগী বাস করিতেন। যোগীর দয়া হইল, তিনি নিবৃত্তিনাথকে আশ্রয় দিলেন, উপযুক্ত আধার দেখিয়া যোগী নিবৃত্তিনাথের নিকট আধ্যাত্মিকতার কপাট খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে যোগধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এদিকে বহু অনুসন্ধান করিয়াও বড় ছেলে নিবৃত্তিনাথকে পাওয়া গেল না। সকলেই চিন্তিত, সপ্তাহখানেক পরে নিবৃত্তিনাথ পুনরায় পিতামাতা, ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এবং বাঘের আক্রমণে পলাইবার পর কিভাবে যোগীর গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং কিভাবে যোগী কৃপা করিয়া তাহাকে যোগ-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। এই ঘটনার পর বিট্ঠলপন্থ অধিকদিন বাঁচেন নাই। গুরু রামানন্দ স্বামীর আশীর্বাদ ফলিয়াছে। শিষ্যের সংসার-বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে। বিট্ঠলপন্থ শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

দিন যায়। ছোট ভাই জ্ঞানদেবের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা স্ফুরণের সময় আসিয়াছে। তিনি শুভ সংস্কার লইয়াই জন্ম নিয়াছেন। তথাপি গুরুকরণ প্রয়োজন, দীক্ষাই পাথেয়। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত এই পাথেয় মিলে না। গুরু গহিনীনাথের আদেশক্রমে নিবৃত্তিনাথ শুভদিনে ছোট ভাই জ্ঞানদেবকে যোগ-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। সার দেওয়া উর্বর জমিতে ভাল বীজ ছড়ানো হইলে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। শুভ

সংস্কারসম্পন্ন শিষ্যের মধ্যেও তেমনি শক্তিশালী গুরুমন্ত্ররূপী বীজ রোপণ করিলে অনুকূল আবহাওয়ায় সেগুলি ফুল ফলে শোভিত হইয়া জনসাধারণকে তাহার অংশ-ভাগী করে। জনসাধারণ উহাতে উপকৃত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে আবার বিপর্যয় ঘটিল। প্রতিবেশীদের সামাজিক বয়কট চরমে উঠিল। সংসারের দুশ্চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিল। বিশেষত মাতা রুকমাবাইয়ের দুশ্চিন্তা অত্যন্ত বেশী হইল। কারণ অপরূপ সুন্দরী কন্যা মুক্তাবাই বড় হইয়াছে। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যা ঘরে. রাখা যায় না। সমাজে দুর্নামের ভয় আছে। আবার চরম সামাজিক বয়কটের জন্য বর সংগ্রহ কঠিন। উভয় সঙ্কট। এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিবৃত্তিনাথ এবং জ্ঞানদেব হেমরপন্থ এবং বোপদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি আছে। সমাজে তাঁহাদের মতের মূল্য আছে। তাঁহারা প্রতিবেশীদের এরূপ অন্যায় সামাজিক বয়কটের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। দুই ভাইয়ের আপ্রাণ চেষ্টা সফল হইল। প্রতিবেশীর অত্যাচার বন্ধ হইল। বয়কট প্রত্যাহার করা হইল। আবার তাহাদের পরিবারে শান্তি ফিরিয়া আসিল। ইহার কিছুদিন পরে মাতা রুকমাবাই পরলোকে গমন করিলেন।

একবার আত্মীয়স্বজনদের লইয়া নিবৃত্তিনাথ এবং জ্ঞানদেব পৈটনার হইতে আরন্ধি যাইবার পথে নেভাস মঠে একরাত্রির জন্য আশ্রয় নিলেন। তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। মৃত্যুর পূর্বে মানুষের যেমন শ্বাসকষ্ট হয় তাঁহারও ঐরূপ কষ্ট আরম্ভ হইল। সাধুকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া জ্ঞানদেবের হৃদয় গলিয়া গেল। বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে করিতে হঠাৎ বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ রোগীর পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি রোগমুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। যোগশক্তির প্রয়োগে মুমূর্ষু বৃদ্ধ সুস্থ হইয়াছেন নিবৃত্তিনাথের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এইভাবে অকারণে যোগশক্তির অপব্যবহার না করিবার জন্য গুরু নিবৃত্তিনাথ ছোট ভাই এবং শিষ্য জ্ঞানদেবকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'যোগশক্তির অপব্যবহার করিলে ধর্মপথ হইতে সাধকের পতনের সম্ভাবনা থাকে। সর্বতোভাবে এরূপ সম্ভাবনা পরিহার করা কর্তব্য। উহা মুক্তির কণ্টক স্বরূপ। পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার পর ভগবানের আদেশক্রমে মুক্তি-কামীর অন্তরে ধর্মভাব জাগাইবার প্রয়োজনে মাত্র যোগশক্তি প্রয়োগ করা চলিতে পারে, অন্যথা নয়। জ্ঞানলাভ না করিয়া পরের উপকারের জন্য উহা করিতে গেলে

নিজের সর্বনাশ হয়।' নিবৃত্তিনাথ ছোট ভাইয়ের অসাধারণ প্রতিভার কথা জানেন ঐ প্রতিভা যাহাতে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয় তার জন্য তিনি জ্ঞানদেবকে গীতার ভাষ্য লিখিবার জন্য উৎসাহ দিলেন, তাহা হইলে সকলে তাহার প্রতিভার অংশভাগী হইবে।

প্রতিভা বিকাশের বহু উৎস থাকে। সাহিত্য তাহাদের অন্যতম। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জ্ঞানদেবের উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছে। গুরু ও বড়ভাই নিবৃত্তিনাথের প্ররোচনায় জ্ঞানদেব মহৎ কার্যে হাত দিয়াছেন। শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারবস্তুর সঙ্গে নিজ আধ্যাত্মিক গবেষণা মিলাইয়া তিনি অপূর্ব গীতা-ভাষ্য রচনা করিলেন। উহা জ্ঞানেশ্বরী টীকা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। এত অল্প বয়সে এত গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করা সহজ নয়। শঙ্করাচার্যের পর এরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখা যায় না। জ্ঞানেশ্বরী শুধু মহারাষ্ট্রের গৌরব নয়, উহা জ্ঞানের খনি, সমস্ত ভারতের গৌরব। ভাবের গভীরতা, সহজ সরল উপমা দ্বারা বিষয় ব্যক্ত করিবার কৌশল, টীকার প্রাঞ্জল ভাষা, তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা, অতি সূক্ষ্ম ভাবের অভাবনীয় পরিবেশন—সকলই তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভার পরিচায়ক। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মাত্র ১৯ বৎসর পার হইতে না হইতেই ১২৯০ সালে তিনি এই কাজ শেষ করিয়াছেন। তিনি যে শুধু গীতা-ভাষ্য রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন তাহা নয়। তাঁহার অসাধারণত্ব অন্যান্য লেখনীর মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রচিত 'অমৃতানুভব' শিবসূত্রের দার্শনিক তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, তাঁহার অভঙ্ ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তবে গীতা-ভাষ্যে তাঁহার দীপ্ত প্রতিভা যেমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করা হইয়াছে। এই একটিমাত্র গ্রন্থই তাঁহার জন্য দেশ-দেশান্তরের শ্রদ্ধা কুড়াইয়া আনিয়াছে। ইহা শুধু মহারাষ্ট্রের ভক্তিমূলক সাহিত্যের খনি নয়, ইহা পরবর্তী যুগের চিন্তাশীল সাধক সাহিত্যিকদের উপাদানমূলক গ্রন্থও বটে। তামিল সাহিত্যে আলোয়ারদের গান, নায়নারদের গীতি রচনা, কনাদ সাহিত্যে বাসবের উপদেশামৃত যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে মহারাষ্ট্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও সেরূপ জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। ইহা অমূল্য সম্পদ্। একাদশ শতাব্দী হইতে মহারাষ্ট্র সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট ভাবধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। মুকুন্দরামের 'পরমামৃত', 'বিবেকসিন্ধু' এবং অন্যান্য শক্তিশালী লেখকদের গ্রন্থ উক্ত প্রবাহকে চালু রাখে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞানেশ্বরীতে উহা পরিপুষ্ট হইয়াছে। 'মিষ্টিসিজম্

অফ্ মহারাষ্ট্র' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার আর ডি রাণাডে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে জ্ঞানেশ্বরীতে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞানের তিনটি প্রবাহের মিশ্রণ দেখা যায়। জ্ঞানদেব প্রেমধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন, নামদেব উহার ভিত্তির উপর মন্দির নির্মাণ করেন এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাধক তুকারাম উক্ত মন্দিরের চূড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। সাহিত্যিক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে, মুক্তিকামী অধ্যাত্ম পিপাসা মিটাইতে এখানে আসেন। যে ভাবধারা একাদশ শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার এখনও বিরাম হয় নাই। কতকাল চলিবে, তাহা কে জানে।

জ্ঞানদেবের জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। উহা পাঠককে মুগ্ধ করে। উহার তত্ত্ব তাঁহার গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন, বর্ষায় ঘন কালো মেঘের প্রবল বারিবর্ষণে যে বন্যা হয় তাহা কোন নির্দিষ্ট খাতে বহে না, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রকে উর্বরা করিয়া দেয়। গুরুকৃপাও সেরূপ বহু ধারায় প্রবাহিত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির পলি ছড়াইয়া সমাজকে পুষ্ট করে। এইজন্য গুরুশক্তি পরম হিতকারী। ভক্তের নিকট ভগবৎ বিরহ কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, বিরহের মধ্যে দিয়া ভক্ত কিভাবে গভীর প্রেম অনুভব করেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি একটা অভঙে বলিয়াছেন, বিরহ যখন উপস্থিত হয় তখন ভক্তের মনে হয় বিরহের আগুনে দেহ ভস্ম হইয়া যাইতেছে। চন্দ্রের শীতলত্ব চলিয়া গিয়া আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়াছে। সর্বাঙ্গে চন্দন লেপিয়া দিলেও শরীর স্নিগ্ধ হয় না বরং মনে হয় আরও তীব্রভাবে দগ্ধ হইতেছে। গন্ধ পুষ্পশয্যা তপ্ত কয়লার মত উত্তপ্ত বোধ হয়। যে মধুর গান মানুষের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে তাহা শান্তি ত আনেই না বরং বিরহ জ্বালার মাত্রা বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রিয়তমের একবার মাত্র দর্শনে সকল জ্বালার অবসান হয়। ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের পূর্বে সাধক অন্ধ, খঞ্জের ন্যায় সহায়হীন থাকে। কাম্যবস্তু লাভে অসমর্থ হইয়া নিরাশ হয়, তাহার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু ইষ্ট দর্শনের পর তাহার মনে হয় সে আনন্দময় কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া স্নিগ্ধ মলয় পবন অনুভব করিতেছে। তখন তাহার মনের দ্বিধাভাব দূর হইয়া যায়। প্রেমের দীপ্ত আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া শান্তিসুখ অনুভব করে। ইন্দ্রিয় বশে আসে, তাহা বিপথে চালিত করে না। ভগবৎ মহিমা কীর্তনে অশান্তি দূর হইয়া যায়, অমৃতের সন্ধান মিলিয়া থাকে, পাপ এবং কর্মজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দে অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া যায়। যে অবাঞ্ছিত অহমিকার মোহে মানুষ অন্ধ হয় তাহা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যায়। মন বুদ্ধি সব অনন্তের তারে সুর মিলাইয়া থাকে।

যাবতীয় দৃশ্য বস্তু ভগবৎ বিভূতি বলিয়া মনে হয়। সর্বত্র ব্রহ্ম মহিমা প্রকাশ পায়। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক বলিয়া মনে হয়, ভেদ ঘুচিয়া যায়। অভেদ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। একমাত্র সত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুর সত্তা থাকে না। ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ।

অনুভূতির আনন্দ তিনি একা উপভোগ করিতে চান না। তিনি চান সকলেই এই আনন্দের অধিকারী হন। পাণ্ডারপুর বিটোবার মন্দিরে স্বীয় অনুভবের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—বিগ্রহের মধ্য দিয়াই অনন্ত সান্ত হন। সান্ত অনন্তের দর্পণ বিশেষ, এই দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়ে। ভগবান যখন নিজ মুখ দর্শন করিতে চান তখন তিনি সান্ত রূপ পরিগ্রহ করেন। ফুলের গন্ধকে কেহ দড়ি দিয়া বাঁধিতে পারে না। অনন্ত আকাশকে কেহ সান্তের গণ্ডিতে আনিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ, শরণাগতি, ইষ্টনিষ্ঠা।

জ্ঞানদেবের নামকীর্তনে মুগ্ধ হইয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন। টেরা ডোকির পটনির্মাতা গোরা, বরসিগ্রামের বিশোয়া খেচরা, ছোকা, প্রসিদ্ধ যোগী চাঙ্‌দেব, বিখ্যাত ভক্ত ও সাধক নামদেব তাঁহাদের অন্যতম। যে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে তাহাও আকৃষ্ট হয়, তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা যুগধর্মকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

জ্ঞানদেবের দিন ফুরাইয়াছে, যাহা করণীয় তাহাও শেষ হইয়াছে। প্রেমময়ের ডাক আসিয়াছে। তাঁহার খেয়ায় আসন মিলিয়াছে। এবার পাড়ি দিতে হইবে। প্রদীপে তৈল ফুরাইয়াছে। বরাদ্দ অনুযায়ী জীবনের শেষ চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। আর ঘুরিবে না, তিনি প্রস্তুত। তিনি নিজ জন্মভূমি আরন্ধিতে আসিয়াছেন। মন সর্বদা অন্তর্মুখীন। ১২৯৬ সালে শুভ মুহূর্তে তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে মহারাষ্ট্র গগনের আধ্যাত্মিক তারকা কক্ষচ্যুত হইল।



॥ একুশ ॥

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

যোগশক্তির অসীম প্রভাব। ইহার কার্যকরী শক্তি স্থূলে, সূক্ষ্মে, দূরে, নিকটে, মানুষে, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। যোগী এই শক্তি দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র এমন কি মনুষ্যেতর প্রাণীরও সেবা করিয়া থাকেন, তবে নীরবে, প্রকাশ্যে নয়। নীরবে হইলেও কখন কখন ইহার শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কচুয়া চব্বিশ পরগণা জিলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণের বাস। রামকানাই ঘোষাল এই গ্রামের অধিবাসী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধর্মপরায়ণ। প্রবন্ধোক্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রায় ১৭৩১ সালে এই ধার্মিক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেন। তিনি পিতার চতুর্থ সন্তান, তাঁহার মাতা কমলাদেবী স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা। পুত্র দীর্ঘায়ু হইয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করুক এবং সুখী হউক ইহা পিতামাতা মাত্রেই কামনা করেন। এইজন্য ছোট বেলাতেই পুত্রের সদ্ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কখন কখন দায়িত্ব নিজ হাতে নেন আবার কখন কখন উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পুত্রের মঙ্গল কামনায় পিতা রামকানাই ভগবান গাঙ্গুলী নামক উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে তাহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। শিক্ষকও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বান্, উঁচুদরের সাধক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

উপনয়ন দীক্ষা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম, ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে উহা অবশ্যই করণীয়। প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়সে লোকনাথের উপনয়ন দীক্ষা হইয়া গেল। ইহার পর তিনি গুরুর নিকট আসিলেন। বেণীমাধব মুখার্জি তাঁহার সমবয়সী, তিনিও কালীঘাটে গুরুর সঙ্গে থাকিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় কালীঘাটের অবস্থা অন্য রকম ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। শহর গড়িয়া উঠে নাই, লোকের বসতিও কম। নির্জন ছিল, তপস্যার অনুকূল স্থান। সামান্য কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী এই শক্তিপীঠে থাকিয়া তপস্যা করেন। লোকনাথ এবং বেণীমাধব

গুরুর নিকট ব্রহ্মচারী হিসাবে থাকেন। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী বৃদ্ধ হইয়াছেন, বয়স ৬০এর উপর হইবে। শিষ্যদের বয়স কম বলিয়া নিজে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষা করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন, তাহাদের মঙ্গলকামনা করিতেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেন। জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ, সেই বিষয়ে উপদেশ দান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় যে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন তাহার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কিন্তু চপলস্বভাব ব্রহ্মচারী শিষ্যদ্বয় গুরুর উদার ভাব ধরিতে পারিতেন না। ব্রহ্মচর্য জীবনের গুরুত্বও বুঝিতে সমর্থ হইতেন না, শুধু কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য প্রতিবেশী তপস্বী সাধুদের বিরক্ত করিতেন। স্নেহপরায়ণ গুরু শিষ্যদ্বয়ের মঙ্গলকামনায় তাহাদের নিয়া স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহার অনতিকাল পরে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে গিয়া বাস করিবার জন্য রওনা হইলেন। ভ্রমণকালে হিতলাল মিশ্র নামে কোন উঁচুদরের যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কেহ কেহ মনে করেন তিনি বারাণসীর বিখ্যাত যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তবে জীবনী লেখকদের এই অনুমান কত দূর সত্য তাহা বলা কঠিন। তবে উক্ত যোগী যে হৃদয়বান এবং উন্নত ছিলেন পরবর্তী ঘটনা তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই সময়ে বৃদ্ধ গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর শরীর যায়। যোগী করুণার বশবর্তী হইয়া যুবক শিষ্যদ্বয়ের দেখাশুনা শিক্ষাশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিষ্যদ্বয় বহু বৎসর যোগঅভ্যাস করেন। হিমালয়ের নানা স্থানে এবং তিব্বতে যাইয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বহুকাল যোগঅভ্যাসের ফলে শিষ্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশে উভয়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। একজন আসামে কামাখ্যাতীর্থে এবং অপরজন চন্দ্রনাথে যান এবং যোগসাধনায় সময় অতিবাহিত করেন।

ব্রহ্মচারী লোকনাথের জীবনের বহু ঘটনা অজ্ঞাত রহিয়াছে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বারদি গ্রামের ভাঙ্গু কামারই প্রথমে তাঁহাকে লোকসমাজে প্রকাশ করেন। একবার তিনি খুব বিপদে পড়িয়া দৈব বশতঃ ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন এবং তাঁহার কৃপায় বিপদমুক্ত হন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে প্রথমে নিজ গ্রামে নিয়া আসেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে প্রাণপণে সেবা করেন। এই সময়ে বারদি গ্রামের এক শ্মশানঘাটের নিকটে লোকনাথ ব্রহ্মচারী এক কুটীয়ায় বাস করিতেন। বারদি গ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে অবস্থিত হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পুণ্যতীর্থে স্নান করিতে আসেন এবং ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া ধন্য হন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বর্ণ উজ্জ্বল, হাত লম্বা, চোখ সুন্দর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; দেখিলেই মনে হয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উঁচুদরের যোগী। তাঁহার দীর্ঘ যোগঅভ্যাস বৃথা যায় নাই। তাঁহার মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছে। হৃদয় উদার হইয়াছে, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়াছে। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে আসেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে ইহার আবহাওয়া পবিত্র। ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে আসামাত্রই নিজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার পূর্ব জীবনের একটা ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিলেন, 'বন্য জানোয়ার পরিপূর্ণ জঙ্গলে আপনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ আগুন লাগে এবং আপনি বিপদগ্রস্ত হন। ঐ সময় কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে হঠাৎ একজন মহাত্মা আসিয়া আপনার জীবন রক্ষা করেন। এই ঘটনা আপনার মনে আছে কি?' এই ঘটনা লোকনাথ ব্রহ্মচারী কি করিয়া জানিলেন ভাবিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বুঝিলেন হয়ত যোগশক্তির প্রভাবে এরূপ জানা সম্ভব হয়।

অন্য একদিন কোন ভদ্রমহিলা আশ্রমের জন্য একটি পাত্রে কিছু দুধ নিয়া আসেন। ঐ সময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাহাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'ভিতরে এস'। ভদ্রমহিলা এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে একটা বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত পাত্র হইতে দুধ পান করিতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী যখন বলিলেন যে 'এখন যাও', সাপটি পোষা জানোয়ারের মত আস্তে আস্তে চলিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিল। ঐ সময়ে গৌরগোপাল রায় নামক জনৈক পুলিস কর্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাত্রের অবশিষ্ট দুধটুকু ব্রহ্মচারী তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া ঐ দুধ পান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। বিষধর সর্প দুধের পাত্রে গরল ঢালে নাই, ভয়ানক হিংস্র জানোয়ারও ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করিতে জানে। যোগীর যোগশক্তির প্রভাবে বিষধর সাপও হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে এবং মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়।

একবার আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ভদ্রমহিলা কোলে শিশু রাখিয়া মারা যান। তখন স্তন্য দুগ্ধের অভাবে শিশুর জীবন রক্ষা কঠিন হইল। ঐ পরিবারে শিশুর খুড়ীমাকে তাহার লালন-পালনের ভার লইবার জন্য ব্রহ্মচারী অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উক্ত মহিলা বন্ধ্যা, কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। স্তন্যদুগ্ধ দিয়া শিশুকে

বাঁচাইতে পারিবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি তিনি মাতৃহারা শিশুর ভার নিলেন। ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ আসিল এবং শিশু ঐ দুধ পান করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত যোগশক্তি অসম্ভব সম্ভব করে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনের অনেক ঘটনাই জানা যায় নাই। তথাপি কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে কোন কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। ঐ সূত্রে জানা যায় যে তাঁহার বাল্যবন্ধু বেণীমাধব মুখার্জি এবং যোগীগুরু হিতলাল মিশ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি হিমালয়ের বরফাচ্ছন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া চীন দেশেও গিয়াছিলেন এবং শত্রুর চর সন্দেহে ধৃত হইয়া হাজতে বাস করিয়াছিলেন। পরে চীন গভর্নমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা যখন নিশ্চিত রূপে জানিলেন যে বন্দী যোগী চর নন, তখন তিনি মুক্তিলাভ করেন। ঐ সূত্রে আরও জানা যায় যে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে আরব দেশে গিয়াছিলেন। এমন কি মুসলমানদের প্রধান তীর্থ মক্কাতেও গিয়াছিলেন। সেখানে মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে উঁচুদরের যোগী জানিয়া নিরামিষ খাদ্য খাইতে দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এখানে প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আব্দুল গফুরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। ইহা ব্যতীত আটলান্টিক মহাসাগরের তীরেও কোন কোন স্থানে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

একবার লোকনাথ ব্রহ্মচারী চন্দ্রনাথ তীর্থে কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। একদিন একটি হিংস্র ব্যাঘ্রীর সামনে পড়েন, শাবকও সঙ্গে ছিল কিন্তু নিজের এবং শাবকের নিরাপত্তার জন্য ব্যাঘ্রীটি তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিল না। হয়ত অহিংস যোগী বুঝিয়া ব্রহ্মচারীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। বরং অন্য একদিন তাঁহার জীবন রক্ষায় সাহায্য করিয়াছিল। একদিন দুইজন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক হাতে ভয়ানক ধারাল অস্ত্র নিয়া অসদ্ অভিপ্রায়ে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিল। হঠাৎ ব্যাঘ্রগর্জন শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গুণ্ডাদ্বয় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল কিন্তু লুকানো স্থান হইতে দেখিতে পাইল ব্যাঘ্র ব্রহ্মচারীর পা চাটিতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। যোগীর যোগশক্তি দেখিয়া গুণ্ডাদ্বয় আশ্চর্যান্বিত হইল। এবং তাঁহার নিকট আসিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহাদের ধারণা হইল যোগের অসীম প্রভাব। উহার প্রভাবে বন্য জানোয়ার পোষ মানে এবং বন্ধুভাবাপন্ন হয়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভালবাসা শুধু মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ইতর প্রাণীর মধ্যেও উহার প্রভাব দেখা যাইত। পাখী, মধুমক্ষিকা, পিঁপড়ে প্রভৃতি ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র প্রাণীর সঙ্গে তাঁহার মধুর সম্পর্ক ছিল। খাবার পাইবার আশায় কখনও কখনও পাখী তাঁহার জটায় বসিয়া ঠোক্‌রাইত। কখন কখন তিনি চিনি ছড়াইয়া দিতেন, তখন পিঁপড়ে সারি বাঁধিয়া আসিয়া উহা চাটিত, কখনও কখনও চিনির দানা গর্তে নিয়া যাইত। উহা দেখিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইত।

বারদিতে যখন আশ্রম হইল তখন বহু দরিদ্র এবং রোগী সেখানে আশ্রয়লাভ করিল। দরিদ্রদের বন্ধু বলিয়া তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইল। আশ্রমের তরফ হইতে দরিদ্রদের সেবার ভাল ব্যবস্থা হইল। সমাজসেবার কাজ বাড়িয়া গেল। সুনাম ছড়াইয়া যাওয়াতে দূর দূর দেশ হইতে বিশিষ্ট লোক আশ্রম দর্শন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার জন্য আসিতে লাগিল। একদিন ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হাতীর পিঠে চড়িয়া বহু অনুচর সহ আশ্রম দর্শন করিতে আসিলেন। জমিদার জাতিতে ব্রাহ্মণ, একে ত জমিদার, তার উপর রাজা উপাধি, আভিজাত্য এবং অর্থের গৌরব তাঁহার থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রণাম করিবেন না। পথে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভাবিলেন ব্রহ্মচারী কোন্ জাতের জানা নাই; সুতরাং তাঁহাকে প্রণাম করা ঠিক হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত বদলাইল, যোগীকে অত্যন্ত সাদাসিধা দেখিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। পূর্বমত পরিবর্তন করিয়া তিনি যোগীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী রাজাকে পূর্বমত পরিবর্তন করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মনের কথা কি করিয়া ব্রহ্মচারী জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

বারদি আশ্রমে তাঁহার চালচলন দেখিয়া মনে হইত তাঁহার জীবনের দুইটা দিক্ আছে, একটা যোগীর জীবন—যোগসাধনা, ধ্যানভজনাদি দ্বারা সময় অতিবাহিত করা; অন্যটা, কর্মজীবন, নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রসেবা, সমাজসেবা ঐ কর্মজীবনের অঙ্গ। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, সাদাসিধা জীবন, উদারতা, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং মধুর ব্যবহারে অনেকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কৃপালাভের জন্য কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। লোকের দুর্দশা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। যাহার যেরূপ সেবার প্রয়োজন তাহার সেরূপ সেবার ব্যবস্থা করিতেন। যাহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়োজন, তিনি সেই অনুযায়ী আধ্যাত্মিক আহার যোগাইবার ব্যবস্থা করিতেন। যোগশক্তি ব্যতীত উহা সম্ভব নয়। সুতরাং যোগশক্তি প্রয়োগ করিয়াই তিনি তাহাদের সেবা করিতেন। আবার যাহাদের শারীরিক সেবার প্রয়োজন তিনি তাহাদের জন্য অন্ন, পথ্য এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

বরফাচ্ছন্ন হিমালয় এবং অন্যান্য স্থানে যখন যোগাভ্যাস করিতেন তখন তিনি যোগীর বেশে থাকিতেন, বস্ত্রাদি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, কন্দমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু যখন বারদিতে সমাজের মধ্যে থাকিতেন তখন সামাজিক লোকের মত চলাফেরা করিতেন। খাওয়াদাওয়া সব বিষয়ে দশজনের মত থাকিতেন। শীতে গরম জামা ও বস্ত্র পরিধান করিতেন। সমাজের না হইয়াও তিনি লোক-সমাজে বাস করিবার সময় কখন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই, এইজন্য লোকেরা তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তিনিও কোন সময় তাহাদের ঐ বিশ্বাস ভঙ্গ হইবার সুযোগ দেন নাই।

তাঁহার সেবা যে শুধু বারদিতে এবং আশেপাশে প্রতিবেশীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়। সুদূর সাগরপারেও উহা বিস্তৃতি লাভ করে। যোগশক্তি প্রয়োগ দ্বারা কিভাবে তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকিয়াও অন্যের সেবা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যায়। নিশিকান্ত বসু নামে জনৈক ভদ্রলোক আমেরিকায় ডাক্তারি করিতেন। তিনি বারদির নাগবংশের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন আমেরিকাতে নিজ ডাক্তারখানায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক সম্ভ্রান্ত আমেরিককান মহিলা ডাক্তার বসুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উক্ত মহিলা বহুদিন যাবৎ কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। বহু বিখ্যাত ডাক্তারের ঔষধ খাইয়াছেন কিন্তু রোগের উপশম হয় নাই। সব রকম চিকিৎসা বৃথা গিয়াছে। ভুগিয়া ভুগিয়া হতাশ হইয়াছেন। নিজের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। ভারতীয় যোগীদের কথা তিনি শুনিয়াছেন। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির কথা জানিয়াছেন। যোগশক্তির প্রভাবে কিংবা কোন প্রকার গাছ-গাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধ দ্বারা রোগ দূর করা যায় ইহাও শুনিয়াছেন। উক্ত ডাক্তার ঐ রকম কিছু ঔষধ দিতে পারেন ভাবিয়া মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া উহা চাহিলেন। ডাক্তার বসু মহাশয় যোগপ্রক্রিয়া কিংবা গাছগাছড়ায় প্রস্তুত কোন ঔষধের কথা জানেন না। তিনি এই বিষয়ে আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। ভারতবাসী হইলে যে সকলে যোগী হইবেন কিংবা গাছগাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধ দ্বারা অসাধ্য রোগ দূত করিতে পারিবেন এমন কোন কথা নাই। উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা যখন ডাক্তার বসু মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে ডাক্তার বসুর পিছনে একজন জটাধারী দাঁড়াইয়া আছেন। আমেরিকায় জটাধারী লোক দেখা যায় না। জটাধারী যে ভারতীয়, বুঝিতে মহিলার দেরি হইল না। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, হাত লম্বা, চোখ সুন্দর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

সৌম্যভাব যোগীর চেহারা। তিনি মহিলার হাতে একটা গাছের শিকড় গুঁজিয়া দিলেন। বসু মহাশয় জটাধারীকে দেখিতে পাইলেন না কিন্তু মহিলার হাতে শিকড় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। ইহাতে ভারতীয় যোগীদের উপর তাঁহার বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। যোগ-শক্তির প্রভাব, গাছগাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধের গুণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। এই ঘটনার পরে উক্ত মহিলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে জটাধারীর বিবরণ শুনিয়া ডাক্তার বসু স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে তিনিই বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারী। কারণ বারদির নাগবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকায় তিনি উক্ত ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কিছু জানিতেন। সশরীরে উপস্থিত না থাকিয়াও দূর হইতে যোগশক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে সেবা সম্ভব হইতে পারে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নিবারণচন্দ্র রায় নামে কোন ভদ্রলোক একবার ফৌজদারী মোকর্দমায় অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়েন। দোষের গুরুত্ব দেখিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল যে তাঁহার ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে। মোকর্দমার রায় বাহির হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া ভয়ে নিবারণের অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি মনে মনে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন যে যদি যোগী যোগশক্তির প্রভাবে তাঁহার শাস্তিরোধ করিতে পারেন তবে তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইবেন। ব্রহ্মচারীর কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ স্বপ্নে দেখিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'তোমার মোকর্দমার রায় বাহির হইয়াছে। শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। তোমার জীবন নিরাপদ।' পরের দিন উক্ত স্বপ্ন সত্য হইয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। স্বপ্ন যে সব সময় মিথ্যা হইবে তাহা হইতে পারে না। কখন কখন উহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মোকর্দমার রায় সত্য সত্যই নিবারণের অনুকূলে হইয়াছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদিতে দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাটাইয়াছেন। তিনি এখন আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শরীর পাখীর খাঁচা-বিশেষ, এখন উহা শীর্ণ হইয়াছে। মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর কোথায় কিভাবে সৎকার করিতে হইবে তিনি তাহা পূর্ব হইতে সব ভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১৮৯০ সালে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দরিদ্রের চিরবন্ধু, লোকের পথপ্রদর্শক মহান্ যোগী ভক্তদের কাঁদাইয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

॥ বাইশ ॥

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

ধনীর ঘরে জন্ম নিলে ধনী হইয়া আরামে দিন কাটাইতে পারে, অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে মহৎ হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। অন্যদিকে গরীবের ঘরে জন্ম নিলে গরীব হইতে পারে, কখনও আরামের মুখ না দেখিতে পারে, অন্নবস্ত্রের অভাবে জর্জরিত হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য যে মহৎ হইতে পারিবে না তা বলা চলে না। অবস্থার বিপাকে ধনী দরিদ্র হয়, পথের ভিখারী হয়; আবার পথের ভিখারীও ধনী হয়, সম্রাট হয়। সুতরাং ধন মহত্ত্বের মাপকাঠি নয়। দারিদ্র্যও নিকৃষ্টের মাপকাঠি নয়। ধন ও দারিদ্র্যের দ্বারা মহত্ত্বের নির্ণয় সম্ভব হয় না। হৃদয়ের বিস্তারে, জ্ঞানের প্রসারে, উদার আহ্বানে, ত্যাগের সোপানে, পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা ও অনুভূতির কষ্টিপাথরে মহত্ত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়। এই সকল গুণ আয়ত্ত হইলে ধনী যেমন মহৎ হইতে পারে, নির্ধনও সেরূপ মহৎ হইতে পারে। সুতরাং সকলেরই মহৎ হইবার অধিকার আছে। মহত্ত্ব কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জগতে যত লোক মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কষ্টিপাথরের ঘর্ষণে বিশুদ্ধ হইয়া তবে মহৎ হইয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

বহুকাল হইতে উজ্জয়িনী শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এখানকার মহাকালেশ্বর শিব অগণিত ভক্তের পূজা পাইয়া আসিতেছেন এবং বিনিময়ে তাহাদের শান্তি দান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। নিকটেই শিপ্রা নদী, পুণ্যতীর্থ। ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। সহস্র সহস্র সাধুভক্ত নদীতে স্নান করিয়া ধন্য হন। আশেপাশে বহু দেবদেবীর মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের ধারা বহিয়া চলিয়াছে।

প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষ বালানন্দ ব্রহ্মচারী এই উজ্জয়িনীরই একজন নগণ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান। পূর্বনাম পিতাম্বর। পিতা ধার্মিক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রবিদ্। কিন্তু অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে বিধবা পত্নী নর্মদাবাই পুত্রকে নিয়া বিপদে পড়েন। পুত্রের লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা সব রকমের ভার মাতার উপর পড়ে। অসময়ে স্বামীহারা হইয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তার উপর পুত্র

পিতাম্বরের স্বভাব ছোট বেলা হইতে অন্তরকম। পিতাম্বর ডানপিটে, সাহসী কিন্তু চঞ্চলমতি, পড়াশুনায় মন নাই। লেখাপড়া না শিখিলে পুত্র আজীবন দুঃখ পাইবে। এইজন্য নর্মদাবাইয়ের মনে বড় খেদ। তিনি কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারেন না। পিতাম্বর শুধু যে ডানপিটে ছিল তা নয়। তাহার আরও বৈশিষ্ট্য ছিল। কখনও কখনও আপন মনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত, প্রকৃতির সৌন্দর্যে ডুবিয়া থাকিত, শিপ্রা নদীর তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও কোন গুহায় বসিয়া থাকিত, কখনও মহাকালেশ্বর শিবমন্দিরের নিকট পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে আপনভোলা হইয়া বসিয়া থাকিত। কি যে ভাবিত সেই জানে। এখানে সেখানে ঘুরিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে এবং পড়াশুনায় অবহেলা করিতেছে বলিয়া একদিন নর্মদাবাই পিতাম্বরকে খুব তিরস্কার করিলেন। বালক তিরস্কারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। পরনের কাপড় আগুনে পুড়াইয়া ফেলিল। উহার ছাই দ্বারা গায়ে ভস্ম মাখিল, এবং কৌপীন পরিয়া মায়ের সম্মুখে হাজির হইল। পুত্রকে সাধুর বেশে দেখিয়া মাতা নর্মদাবাই হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। অন্য কোন রকমের খেয়াল না চাপিয়া বালকের মনে এরূপ অদ্ভুত খেয়াল যে কেন চাপিল তাহা বুঝা মুশকিল। হয়ত পূর্ব সংস্কার বশতই এরূপ হইয়াছে। মহাকালেশ্বর শিব তাহাকে আপনভাবে গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া এরূপ মনোবৃত্তি দিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে। এই ঘটনা হইতে একটা জিনিস বুঝা যায়ঃ সামান্য খেলাধূলার মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ সন্তান। উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন। নয় বৎসর বয়সে বালক পিতাম্বরের উপনয়ন সংস্কার হইয়া গেল। সংকল্পই কর্মের মূল, কিন্তু তাহার কোন সংকল্প নাই। সব বিষয়ে এলোমেলো। সাধারণ বালকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত পিতাম্বরের নিকট উহার ঠিক বিপরীতটাই স্বাভাবিক মনে হইত। বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার জন্য যাহারা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নিকট অসাধারণটাই স্বাভাবিক এবং সাধারণটাই অস্বাভাবিক মনে হয়। সেজন্য তাহারা কখনও কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিতাম্বর অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত মাতা নর্মদাবাই পুত্রের মতিগতি সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। অনেক খোঁজ করিলেন। কোন হদিস পাইলেন না। চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। অবশেষে মহাকালেশ্বর শিবের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইলেন যে পিতাম্বর যেখানেই যাউক না কেন, সে যেন সুখে থাকে। শিব যেন তাহার ভার নেন এবং

মঙ্গলবিধান করেন। জীবনযুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপেই পিতাম্বর হোঁচট খাইল। অভুতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন হইল। উপনয়নের সময় আত্মীয়দের নিকট সোনার গহনা উপহার পাইয়াছিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করিবার সময় উহা রাখিয়া যায় নাই। উহা যে তাহার বিপদ ডাকিয়া আনিবে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। বালকের গায়ে মূল্যবান সোনার অলঙ্কার দেখিয়া এক ধূর্ত লোকের লোভ হইল। আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে সে বালককে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে গহনাগুলি রাস্তায় চলিবার সময় জীবন বিপদাপন্ন করিতে পারে। ঐগুলি তাহার নিকট জমা থাকুক। ফিরিবার পথে ফেরত লইয়া গেলে চলিবে। পথের নিরাপত্তার জন্য ঐগুলি সঙ্গে না রাখাই যুক্তিযুক্ত। বালক ধূর্তের পাল্লায় পড়িল। ধূর্তের অভিসন্ধি সফল হইল। বালক সরল, কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারে না। যে কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না সে-ই অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে। তাহার কোন বিষয়ে আঁট নাই। ধূর্তকে বিশ্বাস করিয়া বালক ঠকিল বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জীবনপথের প্রথম কণ্টক দূর করিয়া দিলেন। ঐ অলঙ্কার তাহাকে অন্য কোন বিপদে ফেলিত কে জানে। অন্যদিকে যে ধূর্ত বালকের নিকট হইতে সোনার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিল সে জাগতিক দিক হইতে লাভবান হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবঞ্চনা ও পাপের বোঝা মাথায় তুলিয়া নিল এবং ভগবৎ পথের একটা নূতন কণ্টক বরণ করিয়া নিল। পাপ পুণ্যের জমা খরচের হিসাব এইভাবেই চলে।

কোমলমতি বালকের পক্ষে এরূপ অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে পথ চলা দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই, তবু সে চলিতে লাগিল। পথে এক সাধুর দেখা পাইয়া তাহার সঙ্গ নিয়া বরোদা হইতে চল্লিশ মাইল দূরে নর্মদাতীরে এক সাধুর আশ্রমে পৌছিল। ব্রহ্মানন্দস্বামী ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ, তিনি উঁচুদরের সাধক, মহাপুরুষ, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন উন্নত যোগী, বহুকাল যোগ অভ্যাস করিয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে সর্বদা একটা আলো এবং ধুনি জ্বালা থাকিত। বালক যখন আশ্রমে পৌছিল তখন তিনি ধুনির সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বালকের পূর্ব সংস্কার জাগিয়া উঠিল। যোগশক্তি প্রভাবে ব্রহ্মানন্দস্বামী বালকের নাম, ধাম, ঠিকানা, আসিবার উদ্দেশ্য জানিতেন। জিজ্ঞাসা না করিয়াই বালককে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। পিতাম্বরকে আশ্বাস দিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন যে পরের শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন তাহাকে দীক্ষিত করিবেন। বালক এই সময়ের মধ্যে যেন দীক্ষার দিনে অতিথি সৎকারের জন্য আয়োজন করে, দীক্ষিত হইবার আশায় বালকের

মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল কিন্তু দীক্ষার দিনে বহু অতিথিসৎকার করিবার মত ব্যবস্থা সম্ভব হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তিত হইল। বালকের মনে নৈরাশ্য আসিয়াছে বুঝিয়া ব্রহ্মানন্দস্বামী আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে গুরুর প্রতি বিশ্বাস থাকিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। গুরুর ভিক্ষাপাত্রে অলৌকিক শক্তি আছে। উহা লইয়া বাহির হইলে প্রচুর ভিক্ষা মিলে, তাহাতে আশ্রমবাসী এবং অভ্যাগত অতিথির ভোজন শেষ হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।

যথানির্দিষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন বালকের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হইয়া গেল। বালক পিতাম্বর বালানন্দ ব্রহ্মচারী হইলেন। এই উপলক্ষে শাস্ত্রবিধি যথাযথভাবে পালন করা হইল। শুভকর্মে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হয় নাই। আশ্রমবাসী এবং অভ্যাগত সকলে প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। গুরুর ভিক্ষাপাত্রের অলৌকিক শক্তি বালক ব্রহ্মচারী সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন। বাকী দক্ষিণান্ত। বালানন্দ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদক্ষিণা কি দিতে হইবে'। ব্রহ্মানন্দস্বামী সস্নেহে বলিলেন, 'কোন প্রকার জাগতিক ঐশ্বর্যে আমার প্রয়োজন নাই। তপস্যার ফল ভগবানে অর্পণ করিতে হয়। তুমি তাই কর, তাহাতেই আমার আনন্দ, ইহার অধিক কিছু প্রয়োজন নাই'। এরূপ স্বার্থ-গন্ধহীন গুরুর সংস্পর্শ দুর্লভ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মানন্দস্বামী উঁচুদরের যোগী। নর্মদাতীরস্থ গঙ্গানাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ। ঝরোদার মহারাজা এবং তাঁহার সহধর্মিণী যমুনাবাই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য কখন কখন রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। ব্রহ্মানন্দস্বামী তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন বটে কিন্তু পাছে তাঁহার যোগবিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য অত্যন্ত সাবধানে থাকিতেন। এই গঙ্গানাথ আশ্রমে থাকিয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারী (বালক পিতাম্বর) গুরুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কঠোর তপশ্চর্যা এবং যোগাভ্যাসে রত হইলেন। কয়েক বৎসর পর গুরুর আদেশে নর্মদাতীরস্থ তীর্থাদি ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। ঐ তীর্থপরিক্রমা করিবার সময়ে তিনি গৌরীশঙ্কর মহারাজ নামক এক উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলেন। গৌরী-শঙ্কর মহারাজ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, গঙ্গানাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দস্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। যোগী হিসাবেও তাঁহার খুব সুনাম আছে, এখন হইতে বালানন্দ ব্রহ্মচারী গৌরীশঙ্কর মহারাজের প্রেরণা এবং নির্দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ কঠিন যোগাভ্যাসে রত হইলেন। মাঝে মাঝে গুরুস্থান গঙ্গানাথ আশ্রমে যাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন।

পরিব্রাজক-জীপন যাপন করা সাধুর কর্তব্য। সাধু পদব্রজে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী ভ্রমণে বাহির হইলেন, পথে একজন উদাসী সাধু সঙ্গী জুটিল। তাঁহার সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে নর্মদাতীরে মণ্ডল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র ব্যতীত একখানা কাপড়, কম্বল, কুঠার, গাঁজা এবং সামান্ত সেঁকো বিষ ছিল। ঐ সময় একজন ইয়োরোপীয়ান পুলিস্ কমিশনার একটি চুরির তদন্তের জন্য ঐ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট মাদক দ্রব্য এবং মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র পাইয়া পুলিস কমিশনারের গভীর সন্দেহ হইল। তিনি উভয়কে ধরিলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী যতই বলেন যে ঐ যন্ত্র কন্দমূল তুলিবার জন্য এবং মাদক দ্রব্য শীতকালে শরীর গরম রাখিবার জন্য রাখা হইয়াছে, ততই অফিসারের সন্দেহ গভীর হয়। তিনি কোন প্রকার যুক্তি শুনিলেন না। অবশেষে বলিলেন যে যদি বালানন্দ ব্রহ্মচারী ঐ সেঁকো একসঙ্গে সেবন করিতে পারে তবে তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে নইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না—চালান দিবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। বালানন্দ ব্রহ্মচারী ভাবিলেন, জেলবাসের চেয়ে মৃত্যু শতগুণে ভাল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি সঙ্গী উদাসী সাধুকে শেষ অনুরোধ করিলেন যে তাহার মৃত্যু হইলে দেহটা যেন নর্মদার পবিত্র জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, এই বলিয়া তিনি সমস্ত সেঁকো বিষ মুখে পুরিয়া দিলেন এবং অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে কিছু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে বালানন্দ ব্রহ্মচারী অনুভব করিলেন, নর্মদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই। সে শীঘ্র বিপদমুক্ত হইবে। ইতিমধ্যে জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পুলিস কমিশনারকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করিলেন। তা ছাড়া আর একটা ভয়ানক দুঃসংবাদের খবর শুনিয়া সাহেবের মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাঁহার নিকট খবর আসিল যে তাঁহার পুত্র শিকার হইতে ফিরিয়া এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ডাক্তার পৌছিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অগত্যা বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে সাহেব মুক্তি দিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জেলবাস করিতে হইল না। তিনি বিপদমুক্ত হইলেন। নর্মদাদেবীর আশীর্বাণী সফল হইল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে উক্ত কমিশনার সাহেব কর্ম উপলক্ষে পথ চলিবার সময় বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে রাস্তার ধারে মাটি খুঁড়িয়া কন্দমূল তুলিবার সময় দেখিতে পাইলেন। নিজের চোখে দেখিয়া এবার সাহেবের বিশ্বাস হইল যে সাধুর যোগশক্তি

আছে, তাহা দ্বারা শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, অসাধ্যসাধন হয়, তখন তিনি বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে সম্মান দেখাইবার জন্ত অথবা পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত কিছু টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বালানন্দ ব্রহ্মচারী উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে ভারতীয় যোগীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িল, পূর্বের ভুল ধারণা দূর হইল, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আসিল।

একবার বালানন্দ ব্রহ্মচারী অন্যান্ত সাধুর সঙ্গে নর্মদার তীর ধরিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে যখন বিপদে পড়িতেন তখন নর্মদার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার কৃপায় বিপদমুক্ত হইতেন। ইহাতে তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে নর্মদাদেবী তাঁহাকে অলক্ষ্যে রক্ষা করিতেছেন। একদিন গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছিলেন, তখন সূর্য নিজ কর্তব্য শেষ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার, অসংখ্য তারকা আকাশে জলজল করিতেছে। সারাদিন আহার জুটে নাই। দীর্ঘ পথ ভ্রমণে সকলেই ক্লান্ত। আর পথ চলা যায় না। নিকটে কোন গ্রাম নাই এবং লোকালয়ও নাই। জঙ্গলে জানোয়ারের ভয় আছে, ধুনি জ্বালিয়া আত্মরক্ষা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তীব্র ক্ষুধার সময় কি করিয়া ফলমূল কিংবা অন্নসংস্থান করা যায় তাহা ভাবিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন এক পাহাড়ী মেয়ে একটা গাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সাধুরা তাহাকে নিকটস্থ গ্রাম হইতে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে মেয়েটি আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যত ইচ্ছা দুধ পান করিতে পারেন এবং তিনি ঐ দুধ যোগাইবেন। রাত্রে গভীর জঙ্গলে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণ ভরিয়া টাটকা দুধ পান করিয়া সাধুদের ক্ষুধা দূর হইল। একটু পরে তাঁহারা দেখিলেন গাইটি নাই, মেয়েটিও নাই। কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। যাঁহারা ভগবানের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন ভগবান তাঁহাদের ভার নেন, যোগক্ষেম বহন করেন, বিপদে পড়িলে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞতায় সাধুদের হৃদয় পূর্ণ হইল। সকলেই নিশ্চিন্ত মনে ধুনি জ্বালিয়া বিশ্রাম করিলেন।

তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বালানন্দ ব্রহ্মচারী কামাখ্যাধামে আসিলেন। আসামের গৌহাটি শহরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থান প্রসিদ্ধ তীর্থ। পাহাড়ের পাশ দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য যাত্রী এই পীঠস্থান দর্শন করিবার জন্ত আসেন এবং মায়ের পূজা দিয়া ধন্ত হন। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ হইতে ১০।১১ তারিখ পর্যন্ত অম্বুবাচীর সময় এইখানে

বহু যাত্রীর ভিড় হয়। ধ্যানভজনের উপযুক্ত এই মনোরম স্থানে বালানন্দ ব্রহ্মচারী অনেক দিন মায়ের ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন। এইখানে থাকার কালে তাঁহার ভীষণ কলেরা হয়। প্রাণের আশা নাই, শরীর অত্যন্ত অবসন্ন, কখন শেষ নিশ্বাস নির্গত হইবে তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন দিব্যজ্যোতিসম্পন্না এক অপরূপ সুন্দরী বালিকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন যে এযাত্রা তাহার দেহ রক্ষা পাইবে, তবে শীঘ্র স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক। পরের দিন সকালবেলা বালানন্দ ব্রহ্মচারী খুব ক্ষুধার্ত বোধ করিলেন। স্নান সারিয়া খিচুড়ী তৈয়ারী করিয়া খাইলেন। এবং শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কামাখ্যা হইতে তিনি তারকেশ্বরে আসিলেন। বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আসিয়া শিবের পূজা দিয়া ধন্য হন। বিশেষতঃ শিবরাত্রি এবং চৈত্রমাসে চড়কের সময় অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। তারকেশ্বর হইতে অন্যন্য তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি জলেশ্বরে আসেন। এবং নিকটস্থ এক পুরনো শিবমন্দিরে আশ্রয় নেন। মন্দিরটি জীর্ণ হইলেও উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা খুব জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিবার সময় শুনিতে পাইলেন যে কে যেন তাঁহাকে নিকটে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ধ্যান করিতে নির্দেশ দিতেছেন। নির্দেশ অনুযায়ী ধ্যান করিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিলেন এবং অলৌকিক দর্শনাদি করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিলেন। পরের দিন তাঁহাকে ঐ মন্দির হইতে নিরাপদে বাহির হইতে দেখিয়া স্থানীয় লোকেবা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কারণ উঁচুদরের যোগী ব্যতীত ঐ পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ধ্যান করিলে অত্যন্ত বিপদ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। ইহার পর তিনি উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের দিকে গেলেন। স্থানে স্থানে অনুকূল মনোরম স্থান পাইলে ধ্যানভজনে ডুবিয়া যাইতেন এবং অলৌকিক দর্শনাদি করিয়া আনন্দে অভিভূত হইতেন। বালক অবস্থায় গঙ্গানাথ আশ্রমে গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময় আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস থাকিলে অসাধ্য সাধন হয়। সিদ্ধি করতলগত হয়। এখন তাহার ফল ফলিতে চলিল। উর্বর জমিতে ভাল বীজ বপন করিলে জলবায়ুর সাহায্যে বৃদ্ধি পাইয়া কালে ফলেফুলে শোভিত হয়। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর বেলাতেও তাহাই হইল। তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে গুরু বলিয়াছিলেন, 'মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধু আহরণ করে, সাধুও সেরূপ গভীর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া এই জীবনেই আধ্যাত্মিকতা অর্জন করে'। কালে শুধু যে গুরুর

আশীর্বাদ ফলিল এবং যোগশক্তির স্ফুরণ হইল তাহা নহে বরং অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাইয়া দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁহার মধ্যে আসিল। এইভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন দ্বারা তিনি অন্যের সেবা করিতেন।

ক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিতে লাগিল। রাণাঘাটের সাব ডিভিশন অফিসার রামচরণ ব্যানার্জি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অনেক গুণ ছিল, আবার অদ্ভুত খেয়ালও ছিল। তিনি একজন পাকা শিকারী। তিনি মনে করিতেন পাশ্চাত্য সবই ভাল এবং প্রাচ্য সবই মন্দ। বালানন্দ ব্রহ্মচারী একবার একখানা ব্যাঘ্রচর্মের আশায় তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিকট তখন কোন ব্যাঘ্রচর্ম ছিল না বলিয়া দিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী মনক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন ইহা ঠিক নহে। সেইজন্য তিনি ভাল কম্বল দিতে চাহিলেন, কিন্তু কম্বলের প্রয়োজন নাই বলিয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারী উহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া গেলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ত্যাগের ভাব অফিসারকে মুগ্ধ করিল। অফিসার এই সময়ে খুব বিপদে পড়েন। কর্তব্যে অবহেলা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট নালিশ গেল এবং তাঁহার চাকরি যাইবার উপক্রম হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শরণাপন্ন হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে বিপদমুক্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িল এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিলেন। আর একবার উক্ত অফিসারের কারবাঙ্কল অপারেশন হইল, যতই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই তিনি গুরুর ধ্যানে নিযুক্ত রহিলেন এবং গুরুর কৃপায় হাসিমুখে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিলেন।

রামচরণ বসু নামে একজন ধনী শিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী গুরুর জন্য আশ্রম নির্মাণ করেন। এইভাবে দেওঘরের প্রায় ছয় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। যোগাভ্যাসের পক্ষে খুবই অনুকূল, এইজন্য উহাকে তপোবন বলে। করণীবাদেও আশ্রম আছে। এখানে বহু শিষ্য থাকেন এবং যোগ ও ধ্যানাভ্যাস করেন। দয়ানিধি ঝা নামক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর একজন শিষ্য বাস করিতেন। শেষ বয়সে গুরুর কাছে থাকিয়া জীবন কাটাইবেন মনস্থ করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পুত্র ছিল। একদিন দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি বিষাক্ত সাপ পুত্রকে কামড়াইল। মুমূর্ষু পুত্রের চিন্তায় পিতা মুষড়িয়া পড়িলেন। পুত্রের জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময় এক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যমদূতের

মত বিরাট আকৃতিবিশিষ্ট এক পুরুষ করণীবাদ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে এবং তাঁহার গুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাতে একটি লাঠি নিয়া তাহাকে তাড়া করিতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই মুমূর্ষু পুত্রের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ছেলে সুস্থ হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর গুরুর প্রতি দয়ানিধি ঝার শ্রদ্ধা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল।

বহুদিন হইল বালক পিতাম্বর স্নেহময় মায়ের কোল ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখন প্রসিদ্ধ যোগী বালানন্দ ব্রহ্মচারী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়াছে। এতকাল মাতা নর্মদাবাই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইয়াছেন। পুত্রের কল্যাণ কামনায় মহাকালেশ্বর শিবের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন। হয়ত ভক্তের করুণ আবেদনে পাযাণ শিবের হৃদয় গলিয়াছে। শিবের কৃপায় পুত্র পিতাম্বর ত্যাগ, তপস্যা, যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বহুদিন পর পুত্রের খবর পাইয়া নর্মদাবাই করণীবাদ আশ্রমে আসিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে মাতা-পুত্রের মিলন ঘটিল। হারানো পুত্রকে পাইয়া মায়ের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল এবং পুত্রও বহুকাল পরে মাতৃস্নেহের স্বাদ পাইয়া তৃপ্ত হইলেন। রক্তের সম্বন্ধ এমন প্রগাঢ় যে দূরত্বের ব্যবধানে তাহা কখনও ছিন্ন হয় না। এখন বৃদ্ধ মাতাকে দেখিবার কেহ নাই। পুত্রই একমাত্র সম্বল। মাতা নর্মদাবাই যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, বালানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাণপণ মাতৃসেবা করিয়া মাতৃঋণ শোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। গর্ভধারিণী মাকে আরাধ্যজ্ঞানে সেবা মহাপুরুষ মাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীর এখন বহু শিষ্য হইয়াছে। তিনি শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে খুব দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক শিষ্যকে চারিটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, এইগুলি যথাক্রমে ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন এবং তারণ। অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের সঙ্গে সৎগুরুর তুলনা করিয়া তিনি বলেন স্বর্ণকার প্রথমে সোনাকে কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিয়া উহা খাঁটি কি মেকী ঠিক করেন, আগুনে পোড়াইয়া তাপন দ্বারা খাঁটি-মেকীর মাত্রা ঠিক করেন, ছেদন করিয়া খাঁটি হইতে মেকী পৃথক করেন, অবশেষে হাতুড়ি দ্বারা ঠুকিয়া (তারণ) সুন্দর অলঙ্কারে পরিণত করেন। সদ্গুরুও বিচাররূপ কষ্টিপাথরে শিষ্যের অন্তর পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত ধর্মভাব আছে কিনা নির্ণয় করেন। এইরূপ ঘর্ষণ দ্বারা শিষ্যের অন্তরস্থ সত্ত্বগুণ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তপস্যার আগুনে পোড়াইয়া তাহার সত্ত্বগুণের মাত্রা বৃদ্ধি করেন, তাহার অন্তরের মলিনতা (রজ তম প্রভৃতি নিম্নতর বৃত্তিগুলি) ছেদ করিয়া অর্থাৎ দূর করিয়া অবশেষে জ্ঞানভক্তির হাতুড়িতে ঠুকিয়া (তারণ) শিষ্যের সুপ্ত আত্মচেতনার

সঞ্চার করেন। স্বর্ণকার সোনায় পরীক্ষা প্রণালী প্রয়োগ করিয়া যেমন সোনাকে সুন্দর অলঙ্কারে পরিণত করেন সদ্‌গুরুও উপরি-উক্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়া শিষ্যের অন্তরে দিব্যভাব ফুটাইয়া তুলেন। দেবত্বের স্ফুরণ হইলেই শিষ্য ঠিক ঠিক গুরুর মহিমা বুঝিতে সমর্থ হন। গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কের উপর দেবত্ব স্ফুরণ নির্ভর করে। সেইজন্য ভারতে গুরুশক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে তিনি সর্বদা সচেতন থাকিতেন। কোন শিষ্যের ত্রুটি দেখিলে তাহাকে কঠোর শাসন করিতেন। ত্যাগী শিষ্যদের প্রতি তিনি নির্মম ছিলেন। ত্যাগের মহিমা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে কঠোর শাসনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আদর্শনিষ্ঠাই তাঁহাকে এরূপ করাইত। কিন্তু এই কঠোরতার পিছনে তাঁহার শুভ ইচ্ছা সর্বদা শিষ্যের অন্তরে প্রেরণা যোগাইত। ত্যাগী শিষ্যদের প্রতি কঠোর হইলেও গৃহস্থ শিষ্যের বেলায় তিনি কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। নানাপ্রকার বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের জীবন কাটাইতে হয় বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত কোমল মনোভাব পোষণ করিতেন। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্বদা প্রসারিত ছিল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী একবার কলিকাতার নিকটে বরাহনগরে জনৈক ভক্তের বাড়িতে কিছুকাল বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় ঠাকুর-পরিবারের বিখ্যাত জমিদার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া জনৈক কর্মচারীকে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট পাঠাইলেন। তিনি ঐ কর্মচারীকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে লোকেরা তাঁহাকেও (বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে) মহারাজ সম্বোধন করিয়া থাকেন। এক মহারাজ অন্য মহারাজের নিকট যাওয়া কতদূর সমীচীন তাহা বিবেচনার বিষয়। বালানন্দ ব্রহ্মচারী আরও বলিলেন যে তিনি নিজে যাওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। যদি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রয়োজন বোধ করেন তবে দয়া করিয়া আসিলে তিনি খুবই আনন্দিত হইবেন। একটা গল্পের অবতারণা করিয়া তিনি উহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কোনস্থানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন; তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন এবং পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। একদিন মাঝরাস্তায় আসন করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ঠিক ঐ সময় ঐ দেশের রাজা বহু সিপাই, লস্কর, কর্মচারী নিয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। কর্মচারী মহারাজ আসিতেছেন বলিয়া হাঁক ডাক করিয়া সাধুকে শীঘ্রই সরিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। কিন্তু সাধু নির্বিকার। কে কাহাকে ডাকিতেছে সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ নাই। সরিয়া যাইবারও কোন লক্ষণ নাই। অনেক হাঁকডাকের পর সা; জবাব দিলেন যে মহারাজ আসিতেছেন, ভাল কথা, সেইজন্য যে রাস্তা ছাড়িয় চলিয়া যাইতে হইবে তার কোন কথা নাই। যদি রাজা হুকুম করেন তবে তিনি ঐ হুকুম পালন করিতে বাধ্য নন। কারণ তিনিও মহারাজ। এক মহারাজ অন্ মহারাজের হুকুম পালন করিতে বাধ্য নন। কর্মচারীর সঙ্গে সাধুর এরূপ কথা বার্তা হইতেছে এমন সময় রাজা স্বয়ং সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 'আপনি যদি মহারাজ, আপনার সৈন্যসামন্ত কোথায়? তাঁহাদের দেখ যাইতেছে না কেন?' রাজার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলিলেন, 'আমার সৈন্যসামন্ত নাই। দরকারও নাই। শত্রু থাকিলে আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার জন্য সৈন্য- সামন্তের প্রয়োজন হয়। আমার কোন শত্রু নাই। সুতরাং সৈন্যসামন্তেরও প্রয়োজন নাই।' আবার মহারাজ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার টাকশাল কোথায়?' তাহার জবাবে সাধু বলিলেন, 'খরচের জন্য টাকশাল প্রয়োজন আমার কোন খরচ নাই। সুতরাং টাকা কিংবা টাকশালেরও প্রয়োজন নাই। মহারাজের এখনও কৌতুহল নিবারণ হয় নাই। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনার রাজ্য কোথায়, উহার বিস্তৃতি কতদূর, প্রজাসংখ্যা কত?' এই প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলিলেন, 'ত্রিভুবনব্যাপী আমার রাজ্য, স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল উহার পরিধি সমস্ত ত্রিভুবনবাসী আমার প্রজা, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ইহা কোনমতেই বলা চলে না যে মহারাজ সাধু মহারাজের চেয়ে কোন অংশে মহৎ। সুতরাং রাস্তা হইতে সরিয়া যাইবার কোন প্রশ্নই উঠে না। উচ্চ-নিচের, বড়-ছোটর কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই।' সাধুর সৌম্যমূর্তি এবং গাম্ভীর্য দেখিয়া মহারাজ বুঝিলেন এই সাধু সামান্য নয়। পূর্ণ জ্ঞানী, পরমহংস, পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে 'স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্'। টাকা, টাকশাল, সিপাই, লস্কর, রাজ্য সবই তুচ্ছ। তিনি তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামান না। সন্ন্যাসীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কর্মচারীর নিকট বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বালানন্দ ব্রহ্মচারীর রহস্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। ইহার পর তিনি নিজে স্বীয় মত পরিবর্তন করিয়া সাধুদর্শন করিবার জন্য একদিন তাঁহার নিকট আসিলেন এবং কিভাবে সংসারে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন সম্ভব হয় তাহার জন্য উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। মায়াতে আবদ্ধ না হইয়া কি করিয়া মুক্তিলাভ সম্ভব হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বালানন্দ ব্রহ্মচারী রহস্য করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ আপ, উলটে যাইয়ে, অর্থাৎ যেভাবে চলিতেছেন তাহার বিপরীত ভাবে চলুন'। তাঁহার হেঁয়ালির

তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন বালানন্দ ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'সংসার যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-বিষয়-সম্পত্তি আমার না ভাবিয়া সব তাঁহার বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে। আমার আমার ভাবনা দ্বারা অহমিকা বৃদ্ধি পায়। এই অহমিকাই সব দুঃখের মূল। অহম্ ভাব ত্যাগ করিয়া তুঁহু তুঁহু ভাবনা করিলে অনেক দুর্বলতা কাটিয়া যায়। অহমিকা হইতে মালিকানা বোধ আসে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি আসে। এই আসক্তিই বাসনা। বাসনা চরিতার্থ না হইলে ক্রোধ, দম্ভ ইত্যাদি আসে এবং তাহাতে বিনাশ অবশ্য-ম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে ভগবানই মালিক। জগতের কর্তা, বিষয় তাঁহারই। দীন সেবক হিসাবে তাঁহারই দেওয়া বিষয় দ্বারা অতি পীড়িতদের মধ্যে তাঁহারই সেবা করিতে হয়। তিনি দীন দুঃখীর মধ্য দিয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। মালিকানা বোধ ত্যাগ হইলে তবে প্রকৃত সেবা সম্ভব হয়। আর একটা কথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে, মালিকের হিসাবপত্র ঠিক রাখিতে হইবে। হিসাবে গরমিল হইলে বিশ্বাস-ঘাতকতা দোষে দোষী হইতে হইবে এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার ফল শাস্তি—বিনাশ। মনুষ্যত্বের বিনাশ, আদর্শের মৃত্যু, দেবত্বের সংকোচ। অথচ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের বিকাশ। তাহাতেই জীবন মধুময় হয়, শান্তি আসে, এবং হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।'

বালানন্দ ব্রহ্মচারীর হেঁয়ালির তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অতিশয় প্রীত হইলেন। এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ তাঁহার আশীর্বাদ নিয়া গৃহে ফিরিলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী স্ত্রী ভক্তদের ও অনুরূপ উপদেশ দিয়া বলিতেন যে সংসারে ভগবানের দাসী হিসাবে থাকিতে হয়। দাসী ভাবে জীবন যাপন করিলে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৯০৩ সালে নর্মদা তীরস্থ গঙ্গানাথ আশ্রমে গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দেহরক্ষা হয়। তখন গুরুভাই কেশবানন্দ স্বামীকে গদিতে বসাইয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারী দেওঘরে ফিরিয়া তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে আশ্রমের উন্নতি হইতে লাগিল। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসিল। যোগী হইলেও তিনি অমর নন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ডাক আসিয়াছে, তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি প্রস্তুত। ১৯৩৭ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তিনি মহাসমাধিতে লীন হইয়া বৈদ্যনাথ শিবের অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর শিবের দান বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে বৈদ্যনাথ শিব গ্রহণ করিলেন।

॥ তেইশ ॥

মধুসূদন সরস্বতী

'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে'। চরিত্র ও কীর্তির গুণেই মহাপুরুষেরা মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় আসন লাভ করেন। তাঁহাদের জীবন প্রগাঢ়, পূর্ণাঙ্গ এবং অনুশীলনযোগ্য বলিয়াই লোকে তাঁহাদের স্মৃতি পূজা করে। তাঁহাদের আদর্শ এবং কৃতকর্ম আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস, জীবনের অবলম্বন স্বরূপ। তাঁহারা জীবনের কৃত্য, ব্রত, উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে সদা সচেতন এবং সক্রিয়। তাঁহারা সার্থকজন্মা, স্বীয় ব্যক্তিত্ব এবং স্বকীয় প্রতিভায় তাঁহারা যুগ পরিবর্তন করেন। তাঁহারা পথিকৃৎ, তাঁহাদের প্রভাবে ইতিহাসের ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যুগের প্রয়োজন মূর্ত হইয়া উঠে। আগামী দিনের সম্ভাবনা তাঁহাদের চিন্তা ও কর্মে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহারা ইতিহাসের বিস্ময়। নানা কারণবশতঃ এ রকম মহাপুরুষদের জীবনের বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিবার উপায় নাই। এইজন্য তাঁহাদের জীবন চরিত বর্ণনা অতি কঠিন কার্য। তবুও তাঁহাদের উপদেশ, আদর্শ এবং জীবন সংক্রান্ত সত্য ঘটনা যতদূর জানা যায় তাহা যে আদরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, উহা পাঠে পাঠকের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, আদর্শ উন্নত হয়, হৃদয় উদার হয় কারণ তাঁহারা অভয় মন্ত্রের সাধক। তাঁহাদের সাধনার ভাবধারা ব্যক্তিগত নয়, মানব-সমাজের বাস্তব সুখ দুঃখ এবং চিন্তার সঙ্গে জড়িত। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য আছে। জীবনের প্রস্তুতির জন্য তাঁহাদের সময় সময় নির্জনে থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু তাঁহারা সংসারের দুঃখ দৈন্য ব্যাধি শোকের প্রতি উদাসীন নন, তাঁহাদের ব্যক্তিমন সমাজমনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁহাদের চিন্তাধারা এবং সমস্ত কাজ-কর্ম প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতিকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়া থাকে। তাহার ফলে সমাজে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি হয়, ধর্মে-কর্মে সর্ববিষয়ে প্রগতির রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, উদারতা, সত্য, পবিত্রতা প্রবৃত্তির মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়।

উনসিয়া গ্রাম ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত। ভৌগোলিক বিবরণ অনুযায়ী উহা এখন ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া থানার অন্তর্গত। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র পরিবেষ্টিত গ্রাম। নদীমাতৃক বলিয়া বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে

গ্রামে আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, খেজুর, তাল প্রভৃতি ফলবৃক্ষ, এবং জবা, টগর, অপরাজিতা, পদ্ম, শেফালিকা, চাঁপা, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ যথেষ্ট। পদ্মানদী গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উহার অপর নাম কীর্তিনাশা। কখন কোন্ কূল ভাঙিয়া অন্যকূলে চর পড়ে ঠিক নাই। এইজন্য ইহাকে কীর্তিনাশা বলে। নদীর রুদ্র বেগ হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ করে বলিয়া ইহার কীর্তিনাশা নাম সার্থক হইয়াছে। স্থানটি চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের জমিদারীর মধ্যে। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান, শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র। সরস্বতীর কৃপা আছে। রাজ-আনুকূল্যও আছে। সেইজন্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

১৫২৫ সালে মধুসূদন সরস্বতী উনসীয়া গ্রামে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রমদা পুরন্দরাচার্য। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান। কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সেইজন্য রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজসভায় তাঁহার সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল। মধুসূদন পিতার চতুর্থ সন্তান। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। একটা বিরাট কীর্তি রাখিবার জন্য যে তাঁহার সংসারে আসা তাহা বেশ সহজে অনুমিত হয়। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ধর্মে, সাহিত্যে, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সাফল্যে ইহার প্রমাণ মিলে। পরবর্তী কালের ইতিহাসও তাহার জগতে আসার মহান্ উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে উনসিয়া গ্রামবাসী প্রমদা পুরন্দরাচার্য রাজা কন্দর্পনারায়ণের জমিদারীর মধ্যে বাস করেন। বিদ্বান্ কবির সঙ্গ লাভের আশায় রাজা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে আচার্যকে মাঝে মাঝে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। তাঁহাকে কর দিতে হইবে না, ফল উপহার দিলেই চলিবে। উহাই কর রূপে গ্রাহ্য হইবে। এই উপলক্ষে রাজা বিদ্বানের সংস্পর্শে আসিবার এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইবেন এবং আচার্যেরও রাজার পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ মিলিবে। এই ব্যবস্থা বহুদিন চলিল, এখন আচার্যের বার্ধক্য ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে হয়ত নিজে যাইতে পারিবেন না। এইজন্য পুত্র মধুসূদনকে সঙ্গে নিয়া তিনি কর প্রদান উদ্দেশ্যে নৌকায় ফল বোঝাই করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পুত্র মধুসূদন অত্যন্ত মেধাবী। অতি অল্প বয়সেই তাহার মধ্যে কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, তাহার সরল ব্যবহার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া যদি রাজা কন্দর্পনারায়ণ দয়া করিয়া অনুমতি প্রদান করেন

যে ভবিষ্যতে বালকের দ্বারা কর পাঠাইলেই চলিবে, তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে আচার্যকে কষ্ট করিয়া রাজসভায় যাইতে হইবে না। রাজার সহিত প্রীতির সম্বন্ধও বজায় থাকিবে এবং তিনিও যাওয়াআসার হাঙ্গামা হইতে রেহাই পাইবেন। কিন্তু মানুষ এক ভাবে আর এক হয়, সংকল্প বাস্তবে রূপ নেয় না। আশার ছলনে ভুলিয়া কষ্ট পায়। বালক মধুসূদনের প্রতিভা স্ফুরণের ক্ষেত্র মিলিল না। এবার পিতা পুরন্দরাচার্যকে অন্যান্যবার রাজা কন্দর্পনারায়ণ যেরূপ সমাদর করিতেন সেরূপ করিলেন না। ইচ্ছা করিয়াই যে অযত্ন করিলেন তা নয়। কিছুকাল যাবৎ তাঁহার মনের মধ্যে একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তার স্রোত চলিতেছিল। তখন ভারতে অধিকাংশ স্থান মুসলমান রাজার করগত। আকবর দিল্লির সম্রাট্। দক্ষিণ ভারতে মাত্র কয়েকটি হিন্দুরাজ্য অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিল। গৌড় দেশ মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত। চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারয়ণ রাজা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু ইদানীং তাঁহার রাজ্য টলটলায়মান। নানা দিক হইতে রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। সত্য সত্য যদি রাজ্য যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে জাতি, ধর্ম, মান, সবই হারাইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় কারণে মন ভারাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই যে রাজা বিদ্বানের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই তাহা পুরন্দর আচার্য বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে আঘাত পাইলেন। কিন্তু বেশী আঘাত পাইল পুত্র মধুসূদন। বালক হইলেও তার মান অপমান যথেষ্ট আছে। তাহার মনের উপর একটা ঝড় বহিয়া গেল। অতি ক্ষুণ্ণ মনে পিতা পুত্র পুনরায় নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। বালকের মনে এখনও ঝড় বহিতেছে। তখন তাহার বয়স মাত্র বার বৎসর। এত অল্প বয়সেই তাহার মধ্যে নিত্য ও অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে, সংসার যে অনিত্য তাহা বোধ হইয়াছে। বাল্যের পর যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্ধক্য অবস্থা আসিবে, অবশেষে মৃত্যুর করাল ছায়া গ্রাস করিবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। মানব জন্ম দুর্লভ, জন্ম লাভ করিয়া ইহ জীবনে ভগবান লাভ হইলে তবে জন্ম সার্থক হয় নইলে সব বৃথা। বৈরাগ্যর পথই একমাত্র পথ, ঐ পথে মুক্তি মিলে। মুক্তি লাভ করিলে তবে যাওয়া আসার প্রশ্ন ঘুচিবে। জীবন সার্থক হইবে। নৌকাতেই বালক মধুসূদন পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যাক্ত করিয়া বলিল, 'বাবা, বড়লোকের খোশামোদ না করিয়া ভগবৎ চরণে শরণ লওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাজা আপনার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ইহাতে যে শুধু ব্রাহ্মণত্বের অপমান করা হইল তাহা নয়। ইহাতে শাস্ত্র ও ধর্ম উভয়ের প্রতি যথেষ্ট অনাদর দেখান হইয়াছে। সংসার এমন জিনিস যে

এখানে উদার আহ্বান নাই, আছে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব, অবিচার, সত্যের কণ্ঠরোধ, ধর্মের প্রতি অবহেলা। এইজন্য বহু গুণী ব্যক্তি অনাদরে প্রচুর অভিমান নিয়া বিদায় গ্রহণ করে। এই সমস্ত বিচার করিয়া আমি সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। আমি স্থির করিয়াছি, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভগবৎ চিন্তায় দিন কাটাইব। আপনি দয়া করিয়া আমায় সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিবার অনুমতি দিন। এবং আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমি মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তে মিশাইয়া যাই।' আকাশ হইতে পড়িলে মানুষের যেমন হয়, বালক মধুসূদনের কথা শুনিয়া পিতা পুরন্দরাচার্যের সেরূপ হইল। শাস্ত্রজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান পিতা বালক পুত্রের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন ভগবৎ কৃপায় পুত্রের মধ্যে বিবেক জাগিয়াছে। তিনি নিজে নিঃশ্রেয়সের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। নিজে অকৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া যে পুত্র কৃতকার্য হইবে না এমন কোন কথা নাই। পুত্রের কৃতকার্যে পিতারই গৌরব। সর্বত্র জয়ম্ ইচ্ছেৎ পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয় শিষ্যাৎ বা। পুত্রের শিরচুম্বন করিয়া পিতা পুরন্দরাচার্য আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, এ সংকল্প উত্তম। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার শুভ ইচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি। তবে একটা বিষয় ভাবিবার আছে, পিতার ন্যায় মাতারও পুত্রের উপর দাবি থাকে এবং পিতার চেয়ে মাতার দাবি অধিক, কারণ মাতা পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেন, স্তন দিয়া পালন করেন, এবং স্নেহে পুষ্ট করিয়া তুলেন, সুতরাং মহৎ জীবনের পথে তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

পিতা-পুত্রে গৃহে ফিরিলেন। পুত্রের সৎ সংকল্পে পিতা মাতা উভয়েই মুষড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের ছেলে পর হইবে, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবে ইহা কোন পিতা মাতা চান না। বিশেষতঃ মাতার পক্ষে ইহা মর্মশেল। পুত্রের অখণ্ডনীয় যুক্তির নিকট পিতা পূর্বে হার মানিয়াছিলেন তবু মনের কোণে একটু আশা ছিল কিছুতেই পুত্রের সন্ন্যাসে মাতা অনুমতি দিবেন না। মায়ের চোখের জলে পুত্রের সংকল্প ভাসিয়া যাইবে। এখন দেখিলেন মায়ের স্নেহও পরাস্ত হইল। পুত্রকে সংসারের রাখা সম্ভব নয়। অবশেষে বহু পীড়াপীড়ির পর মাতা-পিতা পুত্রকে একটি মাত্র শর্তে অনুমতি দিলেন যে মধুসূদন নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ে থাকিবেন। পিতা পুরন্দরাচার্য মধুসূদনকে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে সে যেন অধ্যয়নাদি শেষ করিয়া বুদ্ধি পরিণত হইলে গভীর বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সন্ন্যাস জীবন অত্যন্ত কঠোর। উহার আদর্শ কঠিন। ঐ পথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা

থাকে। সদসৎ বিচার দ্বারা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিলে তবে ভগবৎ কৃপায় মাত্র উহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সুতরাং উপযুক্ত না হইয়া কখনও যেন অনিশ্চয়তার পথে ঝাঁপাইয়া না পড়ে।

পিতামাতা উভয়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ মিলিল। এত অল্প বয়সে বালকের গৃহত্যাগ কোটালিপাড়ায় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিল। পরে এই বালক মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া পিতামাতা, গ্রাম এবং সমস্ত দেশের মুখ উজ্জ্বল করিল, অদ্বৈত বেদান্তের ধারক হইল, শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত বেদান্তকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল, আদর্শ সন্ন্যাসী হইয়া সর্বতোভাবে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিল, ত্যাগ ধর্মের মহিমা প্রচার করিল। পূর্বে ইহা কেহ ভাবিতে পারেন নাই।

পিতামাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া বালক মহান্ উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আজন্ম স্নেহে পুষ্ট বালক ঘরের সুখ জানে, বাহিরে কখনও বাহির হয় নাই। সুতরাং পথের কষ্ট কখনও অনুভব করে নাই, এমন কি কল্পনাও করিতে পারে নাই। বাড়ী ছাড়িয়া প্রথম কষ্টের মুখ দেখিল, অনির্দিষ্টের পথে হোঁচট খাইল। সঙ্গে এক কপর্দকও নাই। সম্বলহীন হইয়াই তাহাকে জীবন পথে চলিতে হইবে। পথে একটা নদী পড়িল, উহা পার হইতে হইবে। নৌকায় পার হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। নিকটে কোন নৌকা নাই, আশ্রয় লইবার কোন বসতিও নাই। শুধু এই একটা নদী পার হইলে চলিবে না। তাহাকে ভবনদী পার হইতে হইবে। বালক নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিল। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'শীঘ্রই নদী পার হইতে পারিবে'। দেবীর আশ্বাস বাক্যে সাহস পাইয়া বালক বিনীতভাবে জানাইল যে সে শুধু এই নদী পার হইতে চায় না, সে ভবনদীও পার হইতে চায়। বালকের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া দেবী তাহার সে প্রার্থনাও মঞ্জুর করিলেন। দেবীর অন্তর্ধানের কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একজন জেলে নৌকা লইয়া সেখানে আসিল। বালক অনায়াসে সে নদী পার হইল, ভবনদীও পার হইতে পারিবে এই বিশ্বাস জন্মিল।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বালক মধুসূদন নবদ্বীপ আসিয়া পৌঁছিল। যখন জানিতে পারিল যে মহাপ্রভু চিরতরে নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে চলিয়া গিয়াছেন তখন তাহার দুঃখের সীমা রহিল না। এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। মনে শান্তি নাই। শান্তির আশায় নানা মন্দিরে গিয়া বিগ্রহাদি দর্শন করিতে লাগিল। যে উদ্দেশ্য নিয়া সে স্বেচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল সে বিষয়ে সে

সর্বদা সচেতন। মোটেই ভুলে নাই। সে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে প্রথমে শাস্ত্রাদিতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে, সন্ন্যাসের উপযুক্ত অধিকারী হইবে, তারপর বিচার করিয়া ত্যাগব্রত অবলম্বন করিবে। শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার তিনটি বিখ্যাত কেন্দ্র আছে। বারাণসী, মিথিলা এবং নবদ্বীপ। প্রত্যেক কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের গবেষণার ব্যবস্থা আছে। বালক মধুসূদন তৃতীয় স্থানটিই আপাতত বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া নিল। কারণ নবদ্বীপে ন্যায়-দর্শনের চর্চা সমধিক হয়। এই দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য দূর দূর দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী আসে। এখানে ন্যায়শাস্ত্রের উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব নাই। ধুরন্ধর ন্যায়াচার্যগণ এখানে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। রঘুনাথ শিরোমণির পরে মথুরানাথ অদ্বিতীয় অধ্যাপক। বালক মথুরানাথের টোলেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ মেধা, সরল ব্যবহার, স্পষ্টবাদিতা এবং কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়া তাহাকে যথাসাধ্য পারদর্শী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। অধ্যাপকের শ্রম সার্থক হইল। স্বীয় প্রতিভাবলে বালক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়নের বিষয় সম্যক্ আয়ত্ত করিল এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি, পক্ষধর মিশ্র এবং রঘুনাথ শিরোমণির টীকা ভাষ্যাদিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিল। তাহার মেধা দেখিয়া অধ্যাপক মথুরানাথের ধারণা হইল বালক দৈবী শক্তিসম্পন্ন। দৈব কৃপা ব্যতীত এত অল্প সময়ে এরূপ কঠিন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপ মেধাবী ছাত্র সচরাচর জুটে না। কদাচিৎ দুই একটা মিলে।

ছোটবেলা হইতেই মধুসূদনের মধ্যে ভক্তিভাব প্রবল ছিল। স্বভাবসুলভ ভক্তিভাবই তাহাকে মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে টানিয়া আনিয়াছিল। শাস্ত্রপাঠে, যৌবনের উন্মেষে তাহার অন্তরের ভক্তিভাব আরও দৃঢ় হইল। ন্যায় দর্শনে দ্বৈতভাব সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর, জীব, জগৎ সবই পৃথক্ বস্তু। দার্শনিক তত্ত্ব চমৎকার। এই তত্ত্বের বিস্তারকল্পে শাস্ত্র প্রণয়ন করিলে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে এবং মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রসার লাভ করিবে। এ সংকল্প কাজে পরিণত করিতে হইলে উহার প্রধান বাধা অপসারিত করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদই দ্বৈত প্রসারে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং উহা খণ্ডন করিতে না পারিলে দ্বৈতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে হইলে উহার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে যত প্রকার যুক্তি আছে সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে। অদ্বৈতবাদের পক্ষে যদি দুর্বল যুক্তি কিছু থাকে তাহা দ্বারাই উহাকে খণ্ডন করিতে

হইবে। এবং উক্ত প্রকারে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন সম্ভব হইলে দ্বৈত প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে এবং ভক্তির মহিমা প্রসার লাভ করিবে।

অদ্বৈত তত্ত্ব সম্যক্ আয়ত্ত করিতে হইলে নবদ্বীপে থাকিলে চলিবে না। বারণসীই উহার কেন্দ্র। জ্ঞানপিপাসু যুবক মধুসূদন বারাণসী যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু বারাণসী নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে ভ্রমণের আধুনিক সুবিধা, সুযোগ মিলিত না। রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন কিছুই হয় নাই। পদব্রজে গমন ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু পথ চলিতে হইলে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। জন্তু জানোয়ারের ভয় আছে। ডাকাতের ভয়ও আছে। সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া প্রাণেও বিনাশ করিতে পারে। তথাপি তাঁহাকে যাইতে হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ভয়ে পথে চলা বন্ধ করিলে চলিবে না। অতঃপর সাহসে ভর করিয়া ভগবানের নাম মাত্র সম্বল করিয়া কপর্দকহীন যুবক মধুসূদন মূল্যবান পুঁথিপত্র বগলে নিয়া পুণ্যতীর্থ বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। ঈশ্বর কৃপায় নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ এবং অন্যান্য দেব-দেবী দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। এই ধামে তাঁহার আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। বারাণসী পৌছিয়া মধুসূদন অদ্বৈত বেদান্তের ধুরন্ধর আচার্য অথচ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন বহু পণ্ডিত সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিলেন। তন্মধ্যে রামতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, নারায়ণ ভট্ট, মাধব সরস্বতী, নৃসিংহ স্বামী, জগন্নাথ আশ্রম কৃষ্ণতীর্থ বিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রধান। তিনি বিখ্যাত আচার্য রামতীর্থের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক শিষ্যের ব্যবহার, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, ত্যাগ, বিচারশক্তি, জাগতিক উন্নতিতে উদাসীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিবার অভ্যাস প্রভৃতি যাবতীয় গুণ যাহা প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সবই শিষ্যের মধ্যে বিদ্যমান দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। এমন উপযুক্ত আধার সচরাচর মিলে না। কালে-ভদ্রে দুই-একটা মিলে। অল্প সময়ের মধ্যে যুবক মধুসূদন অদ্বৈত বেদান্তের কঠিন কঠিন গ্রন্থগুলি সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তির পরিচয় দিলেন। অদ্বৈত দর্শনের উপর তাঁহার এত অধিকার জন্মিল যে অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিত, আচার্য তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। নৃসিংহ স্বামী, উপেন্দ্রতীর্থ প্রভৃতি ধুরন্ধর বেদান্তের আচার্যদের সঙ্গেও শাস্ত্রীয় তর্কে তিনি আপন প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেন। নারায়ণ ভট্ট, মীমাংসার ধুরন্ধর পণ্ডিত। তিনি দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া এই পুণ্যতীর্থ বারণসীতে থাকিতেন। কখন কখন বেদান্তের বিশিষ্ট পণ্ডিতদেরও তর্কযুদ্ধে হারাইয়া

দিতেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন মীমাংসা দর্শন আয়ত্ত করিবার জন্য সংকল্প করিলেন। তিনি ন্যায় ও মীমাংসার বিখ্যাত পণ্ডিত মাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসা পড়া আরম্ভ করিলেন। মধুসূদনের মত মেধাবী ছাত্রের অধ্যাপক হওয়া আনন্দের বিষয়। মাধব সরস্বতী অতি যত্ন সহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদন মীমাংসা শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিলেন।

তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন মধুসূদনের পক্ষে যে কোন দর্শনের অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অল্প সময়ে আয়ত্ত করা শক্ত নয়। অদ্বৈত বেদান্তের গভীর তত্ত্বে তিনি যতই প্রবেশ করিলেন ততই তাঁহার মনের পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া গেল। ইহার মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিলেন প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত ভক্তির বিরোধী নয়। স্ব-স্বরূপকে অনুসন্ধানই ভক্তি। ইহাই আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত ভক্তির সংজ্ঞা। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। আপাত বিরোধ বলিয়া যাহা অনুমিত হয় তাহা ঠিক নয়। গভীর তত্ত্বে উভয়ের সমন্বয় সম্ভব। শাস্ত্র এই সমন্বয়ের অনুকূলে মত দেয়। মধুসূদনের মনে হইল অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিকূলে তিনি এতকাল যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক। এত উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিজের উপর বিরক্ত হইলেন।

মধুসূদনের মনে গভীর অনুতাপ আসিল। অধ্যাপক রামতীর্থের নিকট গিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদের সমর্থক, দ্বৈত প্রতিষ্ঠার জন্যই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের প্রয়োজন। তিনি অধ্যাপকের নিকট অদ্বৈতবাদ পড়িবার প্রকৃত কারণ গোপন করিয়াছেন। এখন যতই গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন ততই উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। এত উচ্চ তত্ত্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় যে কি ভীষণ অপরাধ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। শুধু কাজ হাসিল করিবার জন্য প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করা বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল। এই ভীষণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। মধুসূদনের সরল ব্যবহারে রামতীর্থ মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিলেন। এরূপ বিনয়ী এবং প্রতিভাশালী ছাত্র তিনি এ পর্যন্ত একটিও পান নাই। তিনি বুঝিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে যে সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে হয় মধুসূদনের মধ্যে ঐ সমস্ত গুণের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছে।

ছাত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের পরামর্শ দিতে গিয়া অধ্যাপক রামতীর্থ বলিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য অমরত্ব লাভ। সন্ন্যাস গ্রহণে জন্ম মৃত্যুর নিরোধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

হয়। তিনি আরও বলিলেন যে মধুসূদন নব্যন্যায়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। অধীত বিদ্যার সৎব্যবহার করিলে সমাজ ও ধর্মের প্রভূত উপকার হইবে মাধবাচার্যের অনুগামী শিষ্য ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিকে অত্যন্ত হাল্কা করিয়া দিয়াছে। নব্যন্যায়ের সাহায্যে ন্যায়ামৃতের যুক্তি প্রকৃষ্টরূপে খণ্ডন করিতে না পারিলে অদ্বৈতবাদের গভীরতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে। অদ্বৈত দর্শনের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করিবার এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ন্যায়ামৃত খণ্ডন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করা দরকার এবং এরূপ কঠিন অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজ একমাত্র মধুসূদনের মত প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব। তিনি আরও বলিলেন, মধুসূদন অদ্বৈত তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া কোন অন্যায় করে নাই। যদি বা মনে করে সে অন্যায় করিয়াছে তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নব্যন্যায়ের সাহায্যে ন্যায়ামৃত খণ্ডন এবং অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এমন সুদৃঢ়ভাবে করা যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ উহা খণ্ডনের সাহস না করে।

রামতীর্থের যুক্তিপূর্ণ কথা মধুসূদনের মনে গভীর রেখাপাত করিল। দ্বৈততত্ত্ব খণ্ডন দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরুর সংকল্পকে রূপ দিলেন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। সাহিত্য-জগতে ইহার স্থান অতি ঊর্ধ্বে। এই গ্রন্থ বেদান্তে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, দ্বৈতের মূল্য ম্লান করিয়াছে, অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রে এরূপ গ্রন্থ পূর্বে কখনও কাহারও লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। অধ্যাপক প্রদত্ত দায়িত্ব শেষ করিয়া মধুসূদন সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্বেশ্বর সরস্বতী মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তবু তাঁহাকে পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিতে চান। তিনি জানিতেন ভগবৎ ভক্তি এবং বৈরাগ্য উভয়েই সন্ন্যাসের পথে প্রথম সোপান। অনেক সময় মর্কট বৈরাগ্য অথবা ভাবপ্রবণতা বশতঃ সন্ন্যাসেচ্ছা হয়। মধুসূদনের সন্ন্যাসের সংকল্প ভগবান লাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত, অন্য কোন কারণ বশতঃ নয় জানিয়া আশ্বাস দিলেন যে তিনি অবশ্যই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। সন্ন্যাস দীক্ষা দান করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সাহায্য করিবেন। তবে তিনি এখন তীর্থভ্রমণে যাইতেছেন। ইত্যবসরে মধুসূদন যদি গীতার প্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করে তবে তাহার চিন্তাধারা আরও গভীর, উদার এবং সুদৃঢ় হইবে। বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। মধুসূদন গীতার টীকা প্রণয়নে হাত দিলেন। কঠোর পরিশ্রম

করিয়া গ্রন্থখানি শেষ করিলেন। গ্রন্থখানি অমূল্য। ইহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

তীর্থ ভ্রমণের পালা শেষ করিয়া বিশ্বেশ্বর সরস্বতী বারাণসীতে ফিরিয়া মধুসূদন রচিত গীতা ভাষ্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন। মধুসূদনের বাসনা পূর্ণ হইল। পিতামাতার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে শাস্ত্রে সম্যক্ বুৎপত্তি লাভ করিয়া তবে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিবেন তাহা রক্ষিত হইল। পিতামাতার আশীর্বাদ ফলিল। তাঁহাদের কুল ধন্য হইল। মধুসূদনের পূর্ব নাম ঠিক রহিল। তবে তাঁহার নামের পিছনে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 'সরস্বতী' উপাধি যুক্ত হইল। তিনি মধুসূদন সরস্বতী নামে পরিচিত হইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মধুসূদন অধ্যাত্মসাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সময়ের মূল্য বুঝেন। সময় কখনও বৃথা নষ্ট করেন না। বরাবর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই আজ কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রামের অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ সন্তান বিশ্ববিখ্যাত মধুসূদন সরস্বতী হইয়াছেন এবং ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। গুরুর প্রত্যেক উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তীর্থ ভ্রমণ কালে যমুনার তীরে তপস্যার অনুকূল একটা মনোরম স্থান ঠিক করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে মধুসূদন ঐখানে কুটীরায় বাস করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং এখানে থাকিয়াই তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল জ্ঞান লাভ করিলেন।

ক্রমশঃ তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইল। এমন কি রাজধানী দিল্লীতে পর্যন্ত তাহা পৌছিল। তখন আকবর দিল্লীর সম্রাট। তাঁহার মহিষী কিছুকাল যাবৎ কঠিন শূল বেদনায় ভুগিতেছিলেন। হাকিমী এবং অন্যান্য যত রকম চিকিৎসা আছে সব করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় নাই। এখন দৈব কিংবা সাধু ফকিরের আশীর্বাদে রোগের উপশম হয় কিনা তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। যমুনা তীরে এক কুটীরায় মধুসূদন তপস্যারত আছেন শুনিয়া একদিন স্বীয় বেগমকে নিয়া আকবর ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মধুসূদন বালির স্তূপের উপর বসিয়া ধ্যানরত। অনেকক্ষণ পর তাঁহার ধ্যান ভাঙিলে বেগম সাহেবা বিনীতভাবে তাঁহার নিকট শূল বেদনায় কষ্ট পাওয়ার কথা জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পরার্থেই সন্ন্যাসীর জীবন। ভগবৎনির্ভরশীল সন্ন্যাসী কোন ঔষধ দিলেন না। শান্তভাবে বলিলেন, 'মা, ভগবৎ কৃপায় আপনি শীঘ্রই রোগমুক্ত

হইবেন।' ভগবানের আশীর্বাদ সাধুর বাণীতে প্রকাশ পায়। বেগম সাহেবা রোগ মুক্ত হইলেন। সাধুর অমায়িক ব্যবহারে আকবর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। সাধুকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মধুসূদন ত্যাগী সন্ন্যাসী। ধর্ম, অর্থ, কামের প্রয়াসী নন ঐ সব চান না বলিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। দিল্লীর বাদশার দান মধুসূদন সবিনে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে তাঁহার উপর আকবর বাদশার শ্রদ্ধা সহস্র গু বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ত্যাগের মহিমা আরও ছড়াইল। সম্রা প্রদত্ত দান প্রত্যাখ্যানে সব চেয়ে যিনি বেশী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি বিশ্বেশ্বরী সরস্বতী। মধুসূদনের গুরু। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, উভয়েই ধন্য।

ইহার পর মধুসূদন বারাণসী ধামে আসিলেন। এই ধাম শুধু যে ৺বিশ্বনা অন্নপূর্ণার প্রিয় এবং হিন্দু মাত্রেরই তীর্থস্থান তাহা নহে। ইহা শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রধান কেন্দ্র। ত্যাগ, তপস্যা, ভাব, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞানের ক্ষেত্র। কত অসংখ্য সা এখানে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কল্‌কল্‌ নাদিনী গঙ্গা ইহা মাহাত্ম্য আরও বাড়াইয়াছেন। বারাণসীতে আসিয়া মধুসূদন চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে নিকটে একটা মঠে থাকিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ কর্তৃক কোটালি পাড়ার অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত ব্রাহ্মণ বালক আজ ভগবৎকৃপায় এবং গুরুর আশীর্বা বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অবিসংবাদী নেতা, সন্ন্যাসী সমাজের শিরোমণি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে অনেকে জীবন ধন্য মনে করে। দূর দূরান্ত হইতে বহু ছাত্র এবং শিষ্য বেদান্তের পাঠ নেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গোপন অভিসন্ধিও ছিল। অদ্বৈ বেদান্তের অনুকূল এবং প্রতিকূল যুক্তিসকল সম্যক্‌ জানিয়া উহা খণ্ডন করিবা উদ্দেশ্যেই তাঁহার নিকট অদ্বৈত-বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করিতেন। ন্যায়ামৃ গ্রন্থকার ব্যাসরাজের প্রিয় শিষ্য ব্যাসরাম তাঁহাদের অন্যতম। গুরু কর্তৃ আদিষ্ট হইয়া দ্বৈতবাদের স্থায়িত্ব রক্ষার্থেই তিনি মধুসূদনের নিকট অদ্বৈ বেদান্তের পাঠ নিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপনে অদ্বৈত মত খণ্ডনা ন্যায়ামৃতের 'তরঙ্গিণী' নামক টীকা লিখিতেছিলেন। ব্যাসরামের গোপন অভিস জানিয়াও মধুসূদন তাঁহার প্রতি কখনও বিরূপ হন নাই বরং প্রকৃত সন্ন্যাসী মত বলিলেন যে তিনি গুরু হইয়া শিষ্যের প্রতিবাদ করিবেন না। তাঁহা অপর শিষ্য বলভদ্র উহার সমুচিত উত্তর দিবে। ঘটনা তাহাই ঘটিল। বলভ যখন গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন তখন মধুসূদন তাঁহার জন্য শঙ্করাচার্যে

নির্বাণ দশকের উপর সিদ্ধান্তবিন্দু টীকা লিখেন। পরে এই বলভদ্রই নিজ গুরু মধুসূদনের অদ্বৈত সিদ্ধির সিদ্ধিব্যাখ্যা রচনা করিয়া ব্যাসরাজ শিষ্য ব্যাসরামকৃত ন্যায়ামৃত তরঙ্গিণীর আক্রমণ ব্যর্থ করেন। প্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীও ব্যাসরামের মত ঐরূপ মতলব করিয়া মধুসূদনের নিকট অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং 'ষড় সন্দর্ভ' লিখিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন জানিয়াও কাহাকে কখনও বিমুখ করেন নাই। তাঁহার অপর এক শিষ্য শেষ গোবিন্দ শঙ্করকৃত সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের উপর টীকা লিখেন এবং প্রথমে মধুসূদনকে গুরুরূপে বন্দনা করেন। পুরুষোত্তম সরস্বতীও মধুসূদনের শিষ্য। মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর টীকা রচনা করিয়া তিনি গুরুর মতবাদ দৃঢ় করেন। তাঁহার বহু কৃতবিদ্য শিষ্যের মধ্যে উক্ত তিন জন শিষ্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈত বেদান্তের পুষ্টি সাধন করেন।

মধুসূদনের বহু প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। অদ্বৈত সিদ্ধি, গীতার টীকা, ভক্তি রসায়ন, সিদ্ধান্তবিন্দু, মহিম্নস্তোত্র টীকা প্রভৃতি সতেরখানি গ্রন্থ তার মধ্যে প্রধান। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও পাঁচখনি গ্রন্থ আছে। গুরু রামতীর্থের প্ররোচনা, শিষ্য বলভদ্রের অনুরোধ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশ এবং শঙ্কর মিশ্র কর্তৃক ভেদরত্ন নামক গ্রন্থের উত্তর প্রদানের জন্য তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন। পূর্ণ জ্ঞানী হইয়াও তিনি ভক্তিকে উচ্চ আসন দিয়াছেন। যোগ-বশিষ্ঠকারের মতে যোগী কর্ম ত্যাগ করেন না। কর্মই যোগীকে ত্যাগ করে, যেহেতু কর্মের মূলীভূত যে সঙ্কল্প তাহা যোগীর নাশ হইয়া যায়। মধুসূদন এই মত সমর্থন করেন। তিনি নিজে আদর্শ সন্ন্যাসী, শিষ্যদেরও আদর্শ সন্ন্যাসী হইবার জন্য শিক্ষা দিতেন। তাঁহার প্রভাবে যে প্রকৃত ধর্মভাবের একটা প্রবাহ চলিতেছিল তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পুনঃপ্রবর্তন করেন, দক্ষিণ ভারতের বিদ্যারণ্য স্বামী তাহার সংরক্ষণ করেন এবং উত্তর ভারতের মধুসূদন সরস্বতী তাহার সংস্কার সাধন করেন। শঙ্কর, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, বাচস্পতি ও চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্যগণের মত অদ্বৈত জগতে মধুসূদনের স্থান অতি উর্দ্ধে।

টোডরমল্ল আকবরের অর্থসচিব। তাঁহার অধীনস্থ অনেক ব্রাহ্মণ কর্মচারী তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। শূদ্রজ্ঞানে কখন কখন টিটকারিও দিতেন। এইজন্যে তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে দিন কাটাইতেন। অর্থসচিবের পদে ইস্তফা দেওয়ার সংকল্পও তাঁহার কখনও কখনও হইত। একবার নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব

প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ভারতের গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের সভাপতিত্বে বিরাট সভা বসিল। বারাণসীর মধুসূদন সরস্বতী উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে কায়স্থ শূদ্র নহে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। পূর্বকালে ইহারা ব্রাহ্মণবীর পরশুরামের অত্যাচারে 'অসি'জীবীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া 'মসি'জীবীর কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'কায়স্থ বয়ান' নামক ফারসি পুস্তকেও ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। মধুসূদনের যুক্তি সকলে মানিয়া নিলেন। সভাপতি আকবর বাদশাও অনুকূলে মত দিলেন। টোডরমল্লের মুখ রক্ষা হইল। অধীনস্থ ব্রাহ্মণ কর্মচারীর টিট্‌কারি বন্ধ হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে আকবর-মহিষী মধুসূদনের আশীর্বাদে শূল বেদনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্বয়ং বাদশা তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন সন্ন্যাসী। তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত দান প্রত্যাখ্যান করাতে আকবার তাঁহার ত্যাগে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন সভায় তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা, তর্কশক্তি, ব্যক্তিত্ব, রলস অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইলেন। ঐ সময়ে মোল্লাদের খুব আধিপত্য ছিল। মোল্লাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে হিন্দু সন্ন্যাসী ইসলামের প্রধান শত্রু। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি, ত্যাগ তপস্যার প্রভাবে হিন্দু সহজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে চায় না। সন্ন্যাসীর দল নির্মূল হইলে হিন্দু সংস্কৃতি লোপ পাইবে এবং ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। যে কোন উপায়ে ইসলামের আধিপত্য বজায় রাখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিবন্ধক সরাইতে হইবে। হিন্দু সন্ন্যাসীর দল বিলোপ করিতে পারিলে কার্য সহজ হইবে। মোল্লারা কাজেও তাই করিত। যথেচ্ছা সন্ন্যাসী নিধন করিত। তজ্জন্য তাহাদের কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হইত না। কারণ দেশের আইন তাহাদের উপর প্রয়োগ হইত না। তাহারা আইনের আওতায় পড়িত না। তাহাদের অত্যাচারে হিন্দু সন্ন্যাসীগণ জর্জরিত হইয়া উঠিতেন। আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার কোন উপায় তাঁহাদের ছিল না। সন্ন্যাসীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া মধুসূদন দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি সংগ্রহ করিলেন। এই ভাবে সন্ন্যাসীদের মধ্যে নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এখনও এই সম্প্রদায় আপদে বিপদে সন্ন্যাসীদের রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও সন্ন্যাসী। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিদ্বান্

বুদ্ধিমান্, ত্যাগী, ও জ্ঞানী আছেন। কুম্ভমেলার সময় তাঁহাদের অস্ত্রের খেলা দেখা যায়। নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব। নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কি অবস্থা ঘটিত কে জানে।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য এক সময়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসী সমাজের শিরোমণি মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করিতে যান। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং ত্যাগ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। মধুসূদন উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষা করিলেন। আর একবার এক মহাপুরুষ মধুসূদনকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। ভগবান বেদব্যাসও উত্তর কাশীতে শঙ্করাচার্যকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ আর কেহ নন। স্বয়ং গুরু গোরক্ষনাথ। তিনি প্রসিদ্ধ যোগী এবং নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মধুসূদনের যোগসিদ্ধি, জ্ঞানৈশ্বর্য ও বিশ্ববিশ্রুত যশোরাশির কথা শুনিয়াছেন। একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিবার সময় গুরু গোরক্ষনাথ মধুসূদনকে বলিলেন 'তুমি সিদ্ধ, তোমাকে একটি উপহার দিতে চাই। আমার নিকট একটি চিন্তামণি রত্ন আছে। এমন উপযুক্ত পাত্রেই উহা দান করিতে চাই, যে এই দানের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে। আমি উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না। উহাকে বৃথা বহন করিয়া বেড়াইতেছি। এই চিন্তামণি রত্নের একটা বিশেষত্ব আছে। যখন কোন অভাব ঘটিবে ইচ্ছা মাত্রে তাহা পূর্ণ হইবে। আমার বয়স হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে চিন্তামুক্ত কর'। মধুসূদন অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলেন 'আমার কোন অভাব নাই, উহা নিষ্প্রয়োজন। আপনি যোগ্যপাত্রে উহা দান করুন। দান সার্থক হইবে'। দান প্রত্যাখান সত্ত্বেও গোরক্ষনাথ তাঁহাকে বারবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে মধুসূদন একটি মাত্র শর্তে উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। শর্ত এই যে গ্রহীতা যেমন খুশি রত্নের ব্যবহার করিতে পারিবেন, দাতার কোন আপত্তি চলিবে না। এই শর্ত গোরক্ষনাথ মানিয়া নিলেন। অতঃপর মধুসূদন চিন্তামণি রত্ন গ্রহণ করিয়া দাতার সামনেই উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। যিনি 'যে ধনী হইয়া ধনী মণিরে মানে না মণি' বাস্তব জীবনে দেখাইতে পারেন তিনি মহাপুরুষ। যোগ্যপাত্রে চিন্তামণি রত্ন দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া গোরক্ষনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 'আমার দান সার্থক হইয়াছে। আমি যে যোগ্য পাত্রে রত্ন দান করিয়াছি ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তুমি পরম বস্তু লাভ করিয়াছ। তাই চিন্তামণি রত্ন গঙ্গায় বিসর্জন দিতে তোমার বিন্দুমাত্র সংকোচ হয় নাই'। ত্যাগের পরীক্ষায় মধুসূদন প্রথম স্থান

অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তাঁহার ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া গোরক্ষনাথ মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হিসাবে স্বীকার করিলেন এবং যথোচিত সম্মান দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। ত্যাগীই ত্যাগের মর্ম বুঝে।

শেষ বয়সে মধুসূদন একবার নিজের অধ্যয়ন কেন্দ্র নবদ্বীপে আসিলেন। সতীর্থ এবং অধ্যাপকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের যথোচিত সম্মান দেখাইলেন।

জগদীশ, গদাধর, হরিদাস, মথুরানাথ প্রভৃতি দিক্‌পাল পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খুব সম্মান প্রদর্শন করিলেন। নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে বেদান্তের উপযোগিতা প্রচার করিয়া মিথিলা এবং অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিলেন। বারাণসীতে অবস্থান কালে তিনি মাঝে মাঝে রামচরিতমানসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তুলসীদাসের নিকটে যাইতেন। তুলসীদাস মহাপুরুষ, ভক্ত। মধুসূদন বলিতেন 'তুলসীদাস কাশীর উদ্যানে তুলসী স্বরূপ। এই তুলসীর হাওয়া পবিত্র। ইহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত। ভক্তগণ এই তুলসী নারায়ণের মাথায় অর্পণ করেন। তুলসী ধন্য'। ইহার পর তিনি হরিদ্বার আসেন। হরিদ্বারের অপর নাম মায়াপুরী। কাশীর ন্যায় মোক্ষ ক্ষেত্র। মধুসূদন অনেক দিন ধর্ম, শাস্ত্র চর্চা করিয়া দেশ ও রাষ্ট্রের সেবা করিয়াছেন। এখন বয়স হইয়াছে। পারের ডাক আসিয়াছে ইঙ্গিত পাইলেন। শাস্ত্রালাপ, উপদেশ দান প্রভৃতি কাজ ক্রমশঃ বন্ধ হইল। অধিকাংশ সময় সমাধিতে কাটাইতেন। শিষ্যবর্গকে ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি শীঘ্র বিদায় নিবেন। ১০৭ বৎসর বয়সে একদিন মায়াপুর গঙ্গাতীরে প্রাতঃকালে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় যোগসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। অংশ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া অংশীতে মিলাইয়া গেল। মধুসূদন মধুসূদনে বিলীন হইলেন। স্থূলদেহ যথাবিধি গঙ্গাজলে জলসমাধি দেওয়া হইল। বিন্দু সিন্ধুতে একীভূত হইল। মধুসূদন ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেন।

মধুসূদনের জীবনে সাধক ও সিদ্ধভাব দুই-ই বিকশিত হইয়াছে। যিনি নিজ উপলব্ধ সত্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার জীবন যে অনুকরণীয় ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাঁহার অদ্বৈত সিদ্ধি ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর অক্ষয় কীর্তি। ইহাতে বিচার কৌশল দ্বারা তিনি আত্যন্তিক দুঃখ বিনাশের উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন দ্বারা ব্রহ্মের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জীবন ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন করিয়াছেন। সত্য, মিথ্যা ও অসৎ নির্ণয়েই অদ্বৈতসিদ্ধি কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থে সকল দর্শনের সব মতের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। মধুসূদন জগতে নূতন আলো আনিয়াছেন।

॥ চব্বিশ ॥

কমলাকান্ত

সাধকের অধ্যাত্ম সাধনার যে দিকৃটি বৃহৎ মানব সমাজের সুখদুঃখ চিন্তার সঙ্গে জড়িত, জনকল্যাণের দিকে বিচার করিলে বুঝা যায়, তাঁহার সে আগ্রহ একান্ত ব্যক্তিগত নয়। তাঁহার সাধনার বিশেষ দিকৃটি ইতিহাসের ধারায় স্থাপন করিলে তাঁহার সে আগ্রহের সর্থকতা অনুভব করা যায়। সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চেষ্টার দ্বারা মানব বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার সাধনার বিশেষ ক্ষেত্র। তাহাই তাঁহার ধর্ম। এ ধর্ম স্বার্থ বিসর্জনের প্ররোচনা দেয়, মানুষকে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করে, মানুষের আত্মাকে জাগায়, প্রাণবান্ করে, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া দূরত্বের ব্যবধান সরাইয়া দেয়।

বর্ধমান জিলার অম্বিকা কালনা গ্রাম শক্তিসাধক মহাপুরুষ কমলাকান্তের জন্মে ধন্য হইয়াছে। মহেশ্বর ভট্টাচার্য এই গ্রামেরই একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ধর্মপরায়ণ কিন্তু দরিদ্র। দারিদ্র্যের বহু দোষ, মানুষের গুণরাশি নষ্ট করে, সত্য; কিন্তু কখনও কখনও ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ধর্মপরায়ণ হইতে হইলে ধনী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিংবা দরিদ্র হইলেই যে ধার্মিক হইবে তাহাও বলা চলে না। জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী মানুষ ধার্মিক-অধার্মিক হয়, সৎ-অসৎ হয়। প্রবন্ধোক্ত সাধক কমলাকান্ত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসাল ঠিক ঠিক জানা যায় না। জীবনী-লেখকগণ বহু বিচার করিয়া প্রায় ১৭৭৩ সাল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কমলাকান্ত অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। দেখা যায় শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রী বিয়োগ ঘটিলে জীবনে যত কষ্ট দেয় বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা তত করে না। মাতার আদর যত্নই শৈশবের প্রধান অবলম্বন থাকে বলিয়া পিতার দেহান্ত হইলেও তাঁহায় অভাব তত বোধ করে না। কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ হইলে যখন দিন দিন পিতার ভালবাসার পরিচয় পাইতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তখন সব অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। পিতা প্রাণপণে সে অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহার প্রতি পুত্র আকৃষ্ট হয়। আর সে সময়ে পিতৃ-বিয়োগ উপস্থিত হইলে অভাববোধের সীমা থাকে না। দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন মাতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অভাব-

বোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। তখন জননী নিকটে থাকিলে পুত্র পিতার অভাব অনেকটা ভুলিয়া যায় এবং মাতা নিকটে পুত্রকে পাইয়া স্বামীর শোক ভুলিয়া যায়, পিতৃবিয়োগে কমলাকান্তের জীবনে অভাববোধ তীব্র হয়। কিন্তু হৃদয় ও বুদ্ধি ভগবৎ কৃপায় অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক ছিল বলিয়া কমলাকান্ত মাতার দিকে চাহিয়া উহা ভুলিয়া যাইতেন। পিতা দরিদ্র ছিলেন বলিয়া পুত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার দেবত্ব স্ফুরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। বরং মনুষ্যত্ব গঠনের মাল-মশলাদি সস্তা দরে যোগান দিয়াছে। চিন্তাশীলতা, নির্জনপ্রিয়তা, ভাব, ভক্তি, প্রেম, কবিত্ব, পবিত্রতা, ভগবৎ নির্ভরতা প্রভৃতি মহৎ গুণ তাঁহার নিকট সুলভ হইয়াছে।

কমলাকান্তের মাতার নাম মায়াদেবী। তিনি ধর্মপরায়ণা। পিতৃহীন বালকের তিনিই একাধারে মাতা ও পিতার স্থান অধিকার করেন। মাতা অতি কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতেন। তবু পুত্রের সৎ শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। পুত্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইলেন। তাহাদের সামান্য জমি ছিল, তাহার আয়ে কুলাইত না। ক্রমশঃ আর্থিক দুরবস্থা বাড়িয়া চলিল। পুত্রের বিদ্যার্জনের পথ বন্ধ হইয়া আসিল, আর চলে না। চারিদিক অন্ধকার তখন মাতা মায়াদেবী বাধ্য হইয়া পুত্রকে নিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। কমলাকান্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী, তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। উত্তর কালে সংস্কৃত শিক্ষাই তাঁহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত কবিত্বশক্তি স্ফুরণের সাহায্য করে। কমলাকান্তের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তী কালে গান এবং রচনার মধ্য দিয়াই উহা ফুটিয়া উঠে। বিশেষতঃ মায়ের ভজন গানে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির ফোয়ারা আপনি খুলিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সন্তান, উপনয়ন সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন, উহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। যথা সময়ে কমলাকান্তের উপনয়ন দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার পর তাঁহার মনে একটা পরিবর্তন আসে। যত দিন যাইতে লাগিল তত মন উদ্বিগ্ন হইল। তিনি এমন একটা জিনিস চান যাহা পাইলে তাঁহার সবই পাওয়া যাইবে, অন্য কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে রহিলেন। ভাগ্যক্রমে গুরু জুটিয়া গেল। চন্দ্রশেখর গোস্বামী আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন উঁচুদরের সাধক। তিনি কমলাকান্তকে কৃপা করিলেন। দীক্ষার পর শিষ্যের মনে উদাসীন ভাব জাগিয়া উঠিল। পুত্রের ভাব দেখিয়া মাতা মায়াদেবীর মনে শঙ্কা জাগিল। তিনি

এক সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারে জড়াইলেন। কিছু দিনের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটিই অনিশ্চিত। স্ত্রীর অকাল-মৃত্যুতে কমলাকান্তের সংসারবন্ধন শিথিল হইল। কিন্তু অবস্থার বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল। তাহা সত্ত্বেও শুভ সংস্কার তাঁহাকে ধর্মপথে চালিত করিল। অসাধারণ স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া অধিকতর উচ্ছল হইয়া উঠিল। তাঁহার পথ ভক্তির পথ। ভগবানকে মাতৃরূপে পাইতে তাঁহার তীব্র বাসনা। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্র মতের এই সাধন অল্প সময়ে ফল প্রদান করে। কমলাকান্ত কেনারাম ভট্টাচার্য নামক এক উঁচুদরের সাধকের নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হন। দীক্ষার পর তাঁহার সুপ্ত শুভ সংস্কার আরও স্ফুরণের অবকাশ পাইল। কমলাকান্ত সংসার করিয়াছেন। কর্তব্য এড়াইতে পারেন না, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। সংস্কৃত বিদ্যার প্রসারকল্পে তিনি এক টোল খুলিলেন। তাঁহার কয়েক ঘর যজমানও ছিল। পুরোহিতের কাজ করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই অতি কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত মাঝে মাঝে অত্যন্ত তীব্র হইলেও সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি ধৈর্য হারাইতেন না ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইতেন না। দারিদ্র্য এই একনিষ্ঠ ভক্তকে টলাইতে পারিল না। কমলাকান্ত মায়ের উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শাস্ত্রে দেখা যায় যিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন ভগবান তাঁহার ভার নেন, যোগক্ষেম বহন করেন। মাতৃভজনে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। কখনও কখনও ভজনে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে বাহিরের হুঁশ থাকিত না। সন্তানের মুখে মধুর মাতৃনাম বড় ভাল লাগে। তাঁহার ইষ্ট মাকালী মতৃভজন শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কখনও কখনও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের কষ্ট হইলে মাকালী সুন্দরী বালিকাবেশে কমলাকান্তের বাড়ীতে খাদ্যাদি এবং পূজার সামগ্রী লইয়া আসিতেন—যাহাতে তাঁহাকে সংসার ভাবনা ভাবিতে না হয় এবং তিনি নিশ্চিত মনে দেবীর পূজা করিতে এবং মাতৃসংগীতে ডুবিয়া থাকিতে পারেন। মা কালী ভক্তকবি রামপ্রসাদকেও এইভাবে কৃপা করিতেন, তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিতেন। অধিকাংশ সময় কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর মন্দিরে নিবিষ্ট মনে দেবীর পূজায় রত থাকিতেন। তাঁহার আড়ম্বরহীন পূজা এবং ভক্তিতে সকলে আকৃষ্ট হইতেন। কমলাকান্তের মধ্যে যে শুধু ভক্তিভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল তাহা নহে। উদারতা, স্পষ্টবাদিতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ভক্তিতে

মুগ্ধ হইয়া বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই কমলাকান্তের ধর্মভাব স্ফুরণ হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিভরে মাকালীর পূজা এবং তাঁহার ভজন গানে দিন কাটাইতেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বর্ধমানের নিকটে কোটালপাট নামক স্থানে তাঁহার জন্য বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিলেন। এখন মায়ের কৃপায় তাঁহার অভাব পূর্বের মত নাই। তিনি নূতন বাড়ীতে নির্বিবাদে মায়ের পূজা এবং ভজনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে কমলাকান্তের দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও অতিশয় স্বামীভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। কোটালপাটের নূতন বাড়ীতে কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব খুব জাঁকজমকে পালন করা হইত। তাঁহার সংসার আদর্শ সংসার বলিলে চলে। নিজে মাতৃভক্ত, তাঁহার স্ত্রীও ধর্মপরায়ণা, সর্ব বিষয়ে স্বামীকে সাহায্য করিতেন। তিনি নিজেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া অনুযোগ করিতেন। একবার মহারাজ তেজচন্দ্রের জনৈক কর্মচারী ঐরূপ অনুযোগ করিলে কমলাকান্ত তাঁহার প্রতি রাগ ত করিলেন না, বরং বিনয়ভাবে তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে স্ত্রীলোক মাত্রই ভগবতীর অংশ। স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে সম্মান দেখাইতে হয়। শাস্ত্র নির্দেশ দেন যে স্বামীভক্তি-পরায়ণা ও পবিত্রস্বভাবা স্ত্রী ধর্ম-পথের কণ্টক নয় বরং সহায়ক। কমলাকান্তের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উক্ত কর্মচারী স্বীয় ধারণা পরিবর্তন করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্নী স্বর্গারোহণ করিলেন। স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তিনি শ্মশানে মায়ের উদ্দেশ্যে অভিমান করিয়া গান রচনা করিলেন 'মা শ্রীনাথের লিখন খণ্ডন করা যায় না। তুমি যেমন শ্মশানচারী তোমার প্রিয় স্বামী শিবও শ্মশানবাসী, তুমি আমায় সুখে রাখ কি দুঃখে রাখ তার জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু ছেলের প্রতি তোমার কি রকম স্নেহ তাহা দেখিয়া লইব।' তাঁহার গানের এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে বন্য জানোয়ারও হিংসা ভুলিয়া গানে মাতিয়া যাইত। বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া তালে তালে নৃত্য করিত। ছেলের ক্রন্দনরোল বন্ধ হইয়া যাইত। যখন বিয়োগজনিত দুঃখে মন অভিভূত হইত তখন এই গান-গুলি তাঁহার মনে শান্তি আনিত।

একবার কর্মোপলক্ষে কমলাকান্ত পাশের গ্রামে গিয়াছিলেন। ফিরিতে দেরি

গভীর অন্ধকার রাত্রি। ওরা গাঁয়ের ডাঙ্গায় পৌছিলে ডাকাতদল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের মায়া দয়া নাই, ডাকাতি করিয়াই তাহাদের চলে। পথিকদের সর্বস্বান্ত করে। সময় সময় তাহাদের প্রাণে বিনাশ করে। কমলাকান্তের যাহা ছিল তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হইল, স্বেচ্ছায় না দিলে প্রাণে বিনাশ করিবার ভয় দেখাইল। কমলাকান্ত দেখিলেন বাঁচিবার উপায় নাই। তাহাদের অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন 'মৃত্যুকে ভয় করি না, তবে মৃত্যুর পূর্বে আমার ইষ্ট মা-কালীকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার জন্য কিছু সময় দাও।' মৃত্যুর পূর্বে গান রচনা করিয়া এমন প্রাণের আবেগে গাহিলেন যে ডাকাতদের কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল। যাহা কাড়িয়া নিয়াছিল সব ফিরাইয়া দিল এবং কৃতকর্মের জন্য বার বার তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

ভগবৎ চরণে শরণ নিলে তিনি যে শুধু যোগক্ষেম বহন করেন তা নয়। তিনি সর্বদা আপদে বিপদে ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কমলাকান্তের জীবনে বহুবার এইরূপ ঘটিয়াছে। ওর গাঁয়ের ঘটনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরও একটি ঘটনা ইহার সত্যতার প্রমাণ দেয়। তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপ কমলাকান্তের বিশেষ ভক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার উপদেশমত সাধন ভজন করিয়া অনেক উপকার পাইয়াছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। রাজা, রাজপুত্র এবং রাজবংশের উপর কমলাকান্তের প্রভাব দেখিয়া পুরোহিতগণ প্রমাদ গনিলেন। নিজেদের স্বার্থহানির আশঙ্কা করিয়া হিংসায় জর্জরিত হইলেন। ভবিষ্যতের অনিষ্ট এড়াইতে হইলে যে কোন প্রকারে কমলাকান্তকে জব্দ করিতে হইবে। তাঁহারা গোপনে ষড়যন্ত্র করিলেন। রাজপুত্র প্রতাপকে কমলাকান্তের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল দেখিয়া পুরোহিতগণ রাজা তেজচন্দ্রের নিকট নালিশ করিলেন যে পুত্র প্রতাপ দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া বিস্তর মদের বোতল আনাইয়া হরদম মদ্য পান করিতেছে। কখন কখন মাতলামি করিতেছে, শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

রাজা তেজচন্দ্রের এখন উভয়সঙ্কট। এদিকে গুরু কমলাকান্ত, অন্যদিকে স্নেহের পুতলি, বংশের গৌরব প্রতাপ। গুরুর নামে ভীষণ অভিযোগ। তিনি দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া বোতল বোতল মদ সাবাড় করিতেছেন। বংশের গৌরব প্রতাপকে এই পথে টানিয়া আনিয়া সর্বনাশ করিতেছেন। পুত্রের নামে অভিযোগ সে ভীষণ মদ্যপায়ী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, পূজার নাম করিয়া ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে। এবং গুরু কমলাকান্তই তাহার জন্য দায়ী। ছেলের অপরাধ অমার্জনীয়। এরূপ সন্তান রাজবংশের কলঙ্ক। তাহাকে প্রশ্রয় দিলে লোকের নিকট মুখ দেখান যাইবে না।

আবার শিষ্যের পক্ষে গুরুর বিচার করা কঠিন। অভিযোগের সত্যতা যতক্ষণ না প্রমাণিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ রায় দেওয়া চলে না। রাজা তেজচন্দ্র স্থির করিলেন অন্য কাহারও কথার উপর নির্ভর না করিয়া, তিনি নিজেই উহা তদন্ত করিবেন। যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে, গুরু ও পুত্রের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। আর যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয় তবে উভয়ের সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন তাহার নিরসন করিবেন, এবং যাহারা হিংসায় জর্জরিত হইয়া এরূপ গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। তিনি স্থির করিলেন পূর্বে কোন খবর না দিয়া হঠাৎ পূজা দেখিতে আসিবেন এবং অভিযোগ সত্য কিনা নির্ধারণ করিবেন। করিলেনও তাই। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন গুরু কমলাকান্ত ভক্তিভরে মাকালীর স্তব পাঠ করিতেছেন "ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥ সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃখণ্ড-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্॥" পাশে পুত্র প্রতাপ মায়ের ধ্যানে রত। মদের বোতল রহিয়াছে সত্য কিন্তু উহার ভিতরের মদ দুধে পরিণত হইয়াছে। ঐ দুধ হইতে সঙ্গে সঙ্গে মাখন তৈয়ার করা হইল। এবং ঐ মাখন গলাইয়া মহারাজ তেজচন্দ্রের সামনে মাকালীর পূজায় হোমে আহুতি দেওয়া হইল। তারপর 'সর্বমঙ্গল্য মঙ্গলে শিবে সর্বার্থসাধিকে, শরণ্যে-ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে' মন্ত্রে প্রণামান্তর পূজা সাঙ্গ হইল। পুত্র প্রতাপকে জাহান্নমের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন অভিযোগ সত্য কিনা তেজচন্দ্র নিজে অতর্কিতে সন্ধান করিতে আসিয়া এরূপ অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। মা বিশ্বজননী সব সময় সন্তানের মুখ রক্ষা করেন। পুরোহিত কর্মচারীর অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। গুরু কমলাকান্ত এবং নিজ পুত্র প্রতাপ সম্বন্ধে ধারণা বদলাইল। এরূপ অলৌকিক ঘটনাতে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা সহস্র গুণে বাড়িয়া গেল। পরের কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিতে পারে না এবং নানারকম বিপদের ঝুঁকি এড়ান সম্ভব হয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ইহা যুক্তি এবং শাস্ত্রসম্মত।

কতকাল যে কমলাকান্ত সংসারে জীবিত ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। দিন দিন শরীর জীর্ণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন পারের ডাক আসিতেছে, যাইতে হইবে। তিনি প্রস্তুত। মায়ের সন্তান মায়ের কোলে ফিরিয়া

যাইলে আনন্দিতই হয়। ইতিমধ্যে একদিন প্রিয় শিষ্য তেজচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন কমলাকান্ত তাঁহাকে পরের দিন দুপুর বেলা আসিয়া তাঁহাকে (কমলাকান্তকে) গঙ্গায় নিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরের দিন তেজচন্দ্র যথাসময়ে আসিলেন। গুরুর আদেশ অনুযায়ী তাঁহার শরীর মাটিতে স্থাপন করিলেন। এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। মাটি ভেদ করিয়া গঙ্গায় ভীষণ বন্যা আসিল। এবং ঐ বন্যায় কমলাকান্তের দেহ ভাসাইয়া নিয়া চলিল। সাধারণত এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না। কিন্তু মহারাজ তেজচন্দ্র এবং অন্যান্য পরিষদ এই অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বিশ্বজননী যে আপন প্রিয় সন্তানকে কিভাবে আপন বুকে টানিয়া লইবেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি লীলাময়ী, তাঁহার লীলা বুঝা ভার।

কমলাকান্ত যে শুধু সাধক ছিলেন তা নয়। তিনি প্রথিতযশা কবিও ছিলেন। তাঁহার ভক্তিসুলভ গান ভক্ত, গায়ক এবং সাধকদের প্রেরণা যোগায়। তাঁহার বহু রচনা পাওয়া যায়। শ্যামা সঙ্গীত, কৃষ্ণ সঙ্গীত, বিজয়া, সাধক রজন, আগমনী, শিবসঙ্গীত প্রভৃতি রচনা সাধকদের আধ্যাত্মিক ভাব পুষ্ট করিতে সাহায্য করিয়াছে। আজকাল বহু কালীকীর্তন পার্টি যন্ত্রাদি সহযোগে কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত করিয়া ভক্ত হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তিভাবের উদ্দীপনা হয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য বিদ্বৎমণ্ডলী তাঁহার গানের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। শব্দবিন্যাস, ভাব এবং ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলেও তাঁহার রচনা যে অতুলনীয় এবং সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কমলাকান্তের ইষ্টনিষ্ঠা, মাতৃভক্তি এবং শরণাগতির ভাব যে কত গভীর নিম্নলিখিত গান হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধন কালী, মন কালী, প্রাণী কালী আমার রে॥
আসিয়ে ভুবনে এ তনু ধারণে যাতনা না হয় কার রে।
(একবার) হেরিলে ও কায় সব দুঃখ যায় এই গুণ শ্যামা মার রে
এ ভবে এসেছে কেহ সুখে আছে, পেয়ে শিরে রাজ্যভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন ও রাঙা চরণ গলায় করেছি হার রে॥
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়া আসা বারংবার রে।
মায়ের অভয় চরণ কররে শরণ অনায়াসে পাবি পার রে॥

\

॥ পঁচিশ ॥

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

মায়ার প্রভাবে জীব স্বীয় দিব্য স্বভাব ভুলিয়া অসীমকে সসীম এবং দেহকে আত্মা বলিয়া ভুল করে। এই ভুলের মাসুল তাহাকে দিতে হয়। বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আবার বন্ধন মুক্তি হইলে এই জীবই শিব হয়। তন্ত্রমতে শিবতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব এক। শিব পরমাত্মার প্রতীক। শীব গীতায় তাঁহাকে অচিন্তনীয়, অনন্ত, অনাদি, সর্বব্যাপী, নিত্য, সৎ, চিৎ, আনন্দময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিব আর শক্তি অভেদ। উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। শক্তিকে শিব হইতে পৃথক্ করা যায় না। যখন কোন ইচ্ছা, ক্রিয়া থাকে না তখন শিব শবরূপে বিরাজমান থাকেন। শিবের শক্তিই চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হন। তন্ত্র এই শিবশক্তির মহিমা প্রচার করেন, ইহার তত্ত্ব অদ্বৈত, কাহারও কাহারও মতে অথর্ব বেদের কর্মকাণ্ড পরবর্তী যুগে তন্ত্রে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। বহুকাল হইতে শক্তির উপাসনা এই দেশে প্রচলিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্র, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঋক্ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শক্তি উপাসনার আভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিবর্ত পুরাণে ব্রহ্মের এই শক্তিকে প্রকৃতি রূপে, তন্ত্রে শক্তিরূপে, দেবী ভাগবতে দেবী রূপে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সচ্চিদাব্রহ্মই শক্তিরূপে প্রকাশিত। পুরুষ স্ত্রী সবই তিনি। উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে বঙ্গদেশ আসাম প্রভৃতি সর্বত্র এই তন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান, শক্তি আরাধনার প্রচলন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। শক্তি সাধনার প্রভাব শুধু যে ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নয়, ভারতেতর দেশেও আছে। সুদূর মিশরে ওসিরিস্ দেবতার সঙ্গে আইবিস্ দেবীর উপাসনা, পরবর্তী কালে প্রায় সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ যুগে বজ্রযান এবং সহজযান শাখায় তন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজা হর্ষদেবের সময়ে সোমদেব কৃত বৃহৎ কথাতেও শক্তি-সাধনার আভাস পাওয়া যায়। শক্তি সাধনা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এ দেশে নূতন নয়। সময়বিশেষে এই ধারার উন্নতি অবনতি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও এই ধারা অব্যাহত আছে।

বাংলা দেশের অন্তর্গত নবদ্বীপ শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র। ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, ন্যায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রচর্চা যথেষ্ট হয়। শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের চর্চা এবং

অনুশীলনও আছে। এখানে ধর্ম সাধনার দুটি ধারা প্রবাহিত। একটি শক্তি-সাধনার ধারা অপরটি বৈষ্ণব-সাধনার। মহেশ্বর ভট্টাচার্য এই নবদ্বীপেরই একজন অধিবাসী। পূর্বে উত্তরবঙ্গ নিবাসী ছিলেন, পরে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপে আগমেশ্বর তলায় আসিয়া বাস করেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিদ্, ন্যায়নিষ্ঠ এবং ধর্মপরায়ণ। বংশানুক্রমে তান্ত্রিক ভাব তাঁহাদের ভিতরে বর্তমান। ধর্মজগতে এই বংশের অবদান যথেষ্ট। বৈষ্ণব ভাবের বন্যায় কখন কখন দেশ ভাসিয়া গেলেও শক্তি সাধনার ধারা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, প্রত্যেক ধারাই আপন আপন প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী ছিল। দেখা যায় একই সমাজে এমন কি. একই পরিবারে কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত। একই পরিবারে গোপালের উপাসনা এবং শক্তির উপাসনা দুই বিদ্যমান। ধর্ম বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে।. সামাজিক কিংবা পারিবারিক হস্তক্ষেপ কখনও হয় না। ধর্মবিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকিলে এই ধারা নিষ্কণ্টক ভাবে চলিতে পারে এবং দেশে ধর্মবীর এবং কর্মবীরের উদ্ভব হইতে পারে।

প্রবন্ধোক্ত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ উক্ত উভয় ধারার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। হয়তো অনেকটা প্রভাবান্বিতও হইয়াছিলেন। তিনি উপরি-উক্ত আগমেশ্বর তলার মহেশ্বর ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনা বিশেষ জানা যায় না। বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত থাকিয়াও তিনি শক্তি সাধনার ধারাকে অধিকতর বেগবতী করিয়া তুলেন। নিজে শক্তির উপাসক, বিশ্বজননী তাঁহার আরাধ্য দেবী। বিরাটের রূপ কল্পনা কঠিন। নির্গুণের ধ্যান আরও কঠিন। সেইজন্য ভক্ত ঈশ্বরকে সগুণ রূপে ধ্যান করেন। কখনও মাতৃরূপে ধ্যান করেন। মাতৃভাব অত্যন্ত প্রশস্ত এবং অতি শুদ্ধ ভাব। তিনি কালী, দুর্গা, ষোড়শী, তারা, ভুবনেশ্বরী, কমলা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি রূপে বিদ্যমান। আগমবাগীশ মা-কালীকে ইষ্টরূপে ভজনা করিতেন। ধ্যান পূজা সেবা করিতেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আর এক ভাই ছিলেন। তাঁহার নান সহস্রাক্ষ। তিনি বৈষ্ণব, গোপাল তাঁহার উপাস্য দেবতা। একবার তাঁহাদের বাগানে এক ছড়া কলা পাকে। উভয় ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা পাকা কলা আপন আপন ইষ্টকে নিবেদন করিয়া ধন্য হন। একদিন কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে ঐ পাকা কলা তাঁহার ভাই সহস্রাক্ষ পূর্বেই তুলিয়া গোপালকে ভোগ দিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণানন্দের মন ক্ষুণ্ণ হইলেও কিছু করিবার নাই, ভাইকে কিছু বলিতে পারেন না। ক্ষুণ্ণ মনে গভীর রাত্রে অমাবস্যায় মা কালীর পূজা শেষ করিয়াছেন। দেবীকে উক্ত কলা ভোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া মনে আক্ষেপ ছিল। কোন মতে দেবীর পূজা শেষ করিয়া

বিশ্রাম করিতে যাইবেন এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন দেবীর মন্দির হইতে একটা উজ্জ্বল আলো আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দরজা খুলিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার ভাই সহস্রাক্ষের ইষ্ট গোপাল দেবীর কোলে বসিয়া আছেন। দেবী নিজে গোপালের মুখে কলা তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং গোপাল মায়ের হাতে কলা খাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কৃষ্ণানন্দের জ্ঞানের কবাট খুলিয়া গেল। অন্ধকার অপসারিত হইল, দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইল। সঙ্কীর্ণভাব চলিয়া গেল। বুঝিলেন দেবী আর গোপাল পৃথক নন। মূলত এক, ভক্তের নিকট বিভিন্ন নাম রূপে প্রকাশিত হন মাত্র। সুতরাং বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের পূজাও তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত ইহা বুঝিলেন। তাই এই ঘটনার পর স্বরচিত তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধিও সন্নিবিষ্ট করিলেন। পূর্বে অমাবস্যা রাত্রিতে দেবীর পূজা করিতেন এখন হইতে নিত্যই রাত্রে দেবীর পূজা করেন এবং মনকে ইষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত রাখেন। শহরের কোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে নির্জন শ্মশানে এক বট-বৃক্ষের তলায় সাধনার জন্য বেদী নির্মাণ করিয়া ধ্যানের আসন নির্দিষ্ট করিলেন। স্থানটি অতিশয় ভয়ঙ্কর। গাছের ডালে অসংখ্য পেঁচা, নীচে বহু শিয়ালের গর্ত। উভয়ই রাত্রিচর। উক্ত আসনে বসিয়া তিনি তন্ত্রসম্মত ক্রিয়াদি অভ্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান অভ্যাস করিতেন। এইভাবে তিনি কঠোর সাধনায় ডুবিয়া গেলেন।

পূর্ব যন্ত্রে কিংবা ঘটে দেবীর পূজা হইত। এই প্রথাটি যে কত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। প্রচলিত প্রথায় সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি উহার উন্নতিবিধান করিতে তৎপর হইলেন। দেবীর নিকট নিত্য প্রার্থনা জানাইতেন যেন দেবী উপাসনার ধারা সব দেশেই নিষ্কণ্টক ভাবে প্রবাহিত হয় এবং উন্নত ধরনের পূজাবিধি প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে মূর্তিতে দেবী পূজার প্রবর্তন করা হইলে উপাসনার ধারা অব্যাহত থাকিবে। অধিক সংখ্যক ভক্ত আকৃষ্ট হইবে, দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইবে এবং দেবীর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু যন্ত্র বা ঘট ব্যতীত উন্নত ধরনের পূজাবিধি তাঁহার জানা ছিল না। তাই নিয়ত প্রার্থনা করিতেন দেবী যেন কৃপা করিয়া প্রকৃত উপায় জানাইয়া দেন। সন্তানের মনোবেদনা 'মা' জানেন। ছেলের প্রতি মায়ের দরদ বেশী। কোন্ মূর্তি গড়িয়া দেবীর আরাধনা করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন এবং ভবিষ্যতে ঐ পূজা জনসমাজে প্রবর্তিত হইলে অধিক ভক্ত দেবীপূজার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তাহা দেবী কৃষ্ণানন্দকে জানাইয়া দিলেন। দেবী আরও জানাইয়া দিলেন,

পরের দিন ভোরে সে (কৃষ্ণানন্দ) প্রথমে যেরূপ জীবন্ত মূর্তি দর্শন করিবে তাহাই দেবীর রূপে বলিয়া ধরিয়া নিবে। ঐরূপ মূর্তির মধ্য দিয়া দেবী নিজেকে প্রকাশিত করিবেন। অনুরূপ সুন্দর মূর্তি গড়িয়া পূজার প্রবর্তন করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন। পরের দিন সকালে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গাস্নানের পথে এক অপরূপ সুন্দরী বালিকার দর্শন পাইলেন। বালিকা ত্রিনয়না, চোখ পদ্মের পাপড়ির মত টানা, স্নেহপূর্ণ করুণা মাখা দৃষ্টি, দাঁত উজ্জ্বল, আলুলায়িত কেশগুচ্ছ হাঁটু পর্যন্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। জিব বাহির হইয়া রহিয়াছে। লোল রসনা, দুই পাশ দিয়া রক্তের ধারা বহিতেছে। হঠাৎ স্বামীর বুকে পা পড়িলে কিংবা আগন্তুক দেখিলে যেমন লজ্জায় স্ত্রীলোকের মুখ অবনত হয় দেবী বালিকারও তাহাই হইল। তাহার গায়ের রং মেঘের মত গাঢ় কাল, মুখে জ্যোতি, চতুর্ভুজা দেবী এমন দিব্য ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন যেন ভক্তকে এক হাতে বর এবং অপর হাতে অভয় দান করিতেছেন। তৃতীয় হস্তে দৈত্য-দলনীর অসি জলজল করিতেছে এবং চতুর্থ হাতে নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। কোমরে বস্ত্র জড়ান কিন্তু বস্ত্রখানি নরহস্ত দিয়া তৈয়ারী। গলায় মুণ্ডমালা, দক্ষিণ পদ স্বামীর বুকের উপর স্থাপিত এবং বাম পদ তাঁহার (স্বামীর) ঊরুতে সন্নিবিষ্ট। দিব্য মূর্তি দেখিয়া কৃষ্ণানন্দের মনে দিব্য ভাবের উদয় হইল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

ইহার পর তিনি দেবীর অনুরূপ সুন্দর মূর্তি তৈয়ার করিয়া মাতৃপূজা প্রবর্তন করিলেন। বাড়ীর একটা পৃথক্ ঘরের কোণে পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈয়ার করিলেন। মৃত মানুষ, বনের শৃগাল, নেউল এবং সাপের মুণ্ড চারিদিকে চারিটা এবং মধ্যখানে একটা পুঁতিয়া তাহার উপর বেদী নির্মাণ করিয়া আসন পাতিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ এবং ধ্যানাদিতে ডুবিয়া যাইতেন। ঐ সাধনার যাহা ফল তাহাও দেবীর কৃপায় লাভ করিলেন। এই সময়ে জটাধারী নামক একজন কৌল তান্ত্রিকের নির্দেশ অনুযায়ী তন্ত্রের কঠিন কঠিন সাধনায় রত থাকিলেন। তন্ত্র সাধনকালে সাধককে কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়; দেবীর কৃপা ব্যতীত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। কৃষ্ণানন্দকেও ঐ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। একদিন রাত্রিতে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী পূজা শেষ হইবার পূর্বে তিনি মায়ের জ্যোতির্ময়ী দিব্য রূপ দেখিতে পাইলেন এবং পরক্ষণে এক দীর্ঘকায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন—তাঁহার কপালে রক্তচন্দন মাথায় জটা এবং পরনে রক্ত বস্ত্র। ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ঘরে কি করিয়া সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন তিনি বুঝিতে পারিলেন না। দেবীর কৃপায় তাঁহার নানাপ্রকার অনুভূতি হইল।

উপাসকের উপাসনার সুবিধার জন্য কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার এবং তত্ত্ববোধিনী নামক দুইখানি তন্ত্রের গ্রন্থ তৈয়ার করিলেন। গ্রন্থগুলি কঠিন হইলেও অতি উচ্চস্তরের। সর্ব-সাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহার উদ্যম, ত্যাগ তপস্যা, নিষ্ঠা বৃথা যায় নাই; মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা প্রবর্তন সিদ্ধিলাভের মই বা সোপান। এই খবর পাইয়া নদীয়ার মহারাজা আগমবাগীশকে নিজ সভায় আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশ মত দেবী পূজা প্রবর্তন এবং প্রচার করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অনেকে ঐরূপে দেবী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, নীরব সিদ্ধ পুরুষ কখন কিভাবে সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত পূজাবিধি যে এখনও অগণিত সাধককে পরিচালিত করিতেছে ইহা সত্য।

॥ ছাব্বিশ ॥

রামপ্রসাদ

তৈলের সাহায্যে যন্ত্র চলে। যন্ত্রের কলকব্জা ভাল থাকে, মরিচা ধরে না। তৈল ব্যতীত যন্ত্র চালাইতে গেলে উহার অংশ বিকল হইয়া যন্ত্রটাই অকেজো হইয়া পড়ে। মানুষের জীবনটাও যন্ত্রবিশেষ, ইহাও তৈলের সাহায্যে চলে। তবে এই তৈল ভিন্নজাতীয়। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসাদি এই তৈল। স্নেহ, প্রীতি না পাইলে জীবন মরুভূমির মত শুকাইয়া যায়। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসাদি ভগবৎ সত্তার স্ফুরণ। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই পরিধির বিস্তার হয়। প্রেমই ভগবান, সেইজন্য ভগবানকে প্রেমময় বলে, প্রেমকে ভগবান হইতে পৃথক করা যায় না। বস্তুত দুইই এক সত্তার বিকাশ, পৃথক্ নাম। প্রেমে আত্ম মহিমা বৃদ্ধি পায়, পরাজয়ের গ্লানি থাকে না, ঘৃণা বিদ্বেষ মুছিয়া যায়। মানুষ সাধারাণের গণ্ডি ছাড়িয়া অসীমে মিশিয়া যায়, ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। মধুর ভগবৎ রস আস্বাদন করে, চিরসুন্দরের পূজা করে। অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়। আত্মার গৌরব বৃদ্ধি এবং প্রেমের স্ফুরণের জন্যই ভগবান ভক্ত হৃদয়ের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়া প্রেমের মাধুর্য অনুভব করেন। প্রেম স্ফুরণের বহু ক্ষেত্র আছে তবে মাতৃভাবে ইহার স্ফুরণ সর্বাপেক্ষা অধিক, এই কারণে ভারতে মাতৃ উপসনার স্থান অতি ঊর্ধ্বে। স্ত্রীলোক মাত্রেই তিনটি ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। দুহিতৃত্ব, স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব। দুহিতার ভালবাসায় স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারে এবং থাকেও। স্ত্রীর ভালবাসাতেও দেনা-পাওনার সম্বন্ধ

থাকিতে পারে। দুহিতাই পরে স্ত্রী হয়। স্ত্রীত্ব দুহিতৃত্বেরই পরিণতি, দ্বিতীয়টা প্রথমটার বর্ধিত সংস্করণ বলিলে চলে। কিন্তু তৃতীয়টা অর্থাৎ মাতৃত্ব উভয়েরই পরিণতি। এই অবস্থাতে পাওয়ার সম্বন্ধ লোপ পায়, শুধু দেওয়ার সম্বন্ধ থাকে। মাতৃত্বেই দুহিতৃত্ব এবং স্ত্রীত্বের পূর্ণ বিকাশ, দুহিতা এবং স্ত্রী হিসাবে স্ত্রীলোকের যাহা মূল্য মাতা হিসাবে তাঁহার মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। মাতৃত্বের মধ্য দিয়াই আত্ম-বিলুপ্তি আসে, অনন্তত্বের প্রসার হয়, এইজন্য মায়ের স্থান সকলের উর্ধ্বে। মাতৃত্ব গৌরবের মুকুট। শাক্তদর্শনের মূল কথা একত্ব। ব্রহ্মই মতৃরূপে আপনাকে বিকাশ করেন, মাতৃ উপসনায় সিদ্ধ হইয়া অগণিত সাধু ভক্ত মহাপুরুষ হইয়াছেন। প্রবন্ধোক্ত রামপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম।

বাংলা দেশে রামপ্রসাদের নাম শুনেন নাই এমন লোক অল্পই আছেন। তিনি শুধু উপাসক নন। তিনি শক্তি মন্ত্রের হোতা, চারণ কবি, ভক্ত, সাধক। সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উর্ধ্বে। তিনি তন্ত্রসাধনার ধারক ও বাহক। গানের মাধ্যমে ভক্তির সুমধুর ঝঙ্কার কি করিয়া তুলিতে হয় তিনি ভালরূপে জানিতেন। তাঁহার অন্তঃসলিলা ভক্তির স্রোত আপনিই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। চেষ্টা করিয়া ফলাইবার প্রয়োজন হইত না। মাতৃরূপে সাধন যুগধর্মরূপে বহু সাধকের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু ইহার তত্ত্ব সকলের বোধগম্য হইবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন এমন আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রামপ্রসাদ ইহার তাৎপর্য জানিতেন। শক্তির কোমল অথচ কল্যাণময়ী মহিমা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার উপসনার ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ ভালবাসা, পূজার উপাচার ছিল শুদ্ধা ভক্তি অর্ঘ ছন্দোময় গানের মালা। ছন্দ, ভাব, পদলালিত্যের দিক থেকে বিচার করিলেও তাঁহার রচনাগুলি উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে শোভা পায়। আর তাঁহার গানের সুর রামপ্রসাদী সুর হিসাবে পৃথক স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিশেষত্বের জন্যই তাঁহার গান বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ এবং জনসাধারণের মনে অত্যন্ত সাড়া দেয়। পরবর্তী যুগে তাঁহার গানগুলি বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে ভগবৎ উদ্দীপনা আনিয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যেও প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হালিসহর গ্রাম শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, গঙ্গাতীরস্থ গ্রামটি দুটি কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দুইটি প্রধান উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এই গ্রাম হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম বৈষ্ণব ভাবধারা, দ্বিতীয় শক্তি সাধনার ধারা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরী প্রথমটির এবং রাম-

প্রসাদ দ্বিতীয়টির বাহক। দুটি আধ্যাত্মিক ধারার সঙ্গমস্থল এই স্বনামধন্য গ্রাম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৭২০ সালের আশ্বিন মাসে রামপ্রসাদ প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাম রাম সেন। তিনিও তান্ত্রিকমতে সাধনা করিতেন। তবে গোপনে। পুত্রের ন্যায় তিনি জনসাধারণের নিকট সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে গণ্য হন নাই, সাধারণ লোক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। রামপ্রসাদের মাতার নাম সরস্বতী দেবী। তিনিও স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তন্ত্রের ভক্তিভাব রামপ্রসাদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাব্য এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফার্সী এবং উর্দু ভাষাও আয়ত্ত করেন। তখনকার দিনে দেশে মুসলমান প্রভাব খুবই ছিল। ফার্সী এবং উর্দু অনেককে শিখিতে হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে রামপ্রসাদের বৈদ্য পরিবারে জন্ম, সাধারণত বৈদ্যদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে মার্জিত আচরণাদি আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা তাঁহাদের পৈত্রিক পেশা, কিন্তু নাম যশের আকাঙ্ক্ষা হইতে তিনি প্রথম হইতেই দূরে থাকিতেন বলিয়া তিনি জাতীয় ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেন নাই। কোন বিষয়ে তাঁহার আঁট নাই, উদাসীন ভাব। পুত্রের উদাসীন ভাব পিতামাতার মনে আশঙ্কা জাগায়, সেজন্য পুত্রের ঐ ভাব দূর কবিবার জন্য তাঁহারা সদা সচেষ্ট থাকেন। পিতা রাম রাম সেন রামপ্রসাদকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য শর্বাণী নামক এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। শর্বাণী শুধু রূপবতী নন, তিনি ধর্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী, স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী, কখনও স্বামীর ধর্মপথের প্রতিবন্ধক হন নাই, বরং সব সময়ে সহায়ক ছিলেন। সব বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। চাল চলন কর্মকুশলতা অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। সাধারণতঃ ভগবৎ পরায়ণ স্বামী এবং ধর্মপরায়ণা স্ত্রী দুর্লভ। এই বিষয়ে রামপ্রসাদ ভাগ্যবান ছিলেন। উভয়েই কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মানুষ এক ভাবে আর হয়, পরিকল্পনা রূপ দিতে পারে না। বিধাতার পরিকল্পনা অন্যরকম, মানুষের সঙ্গে মিলে না। শেষ পর্যন্ত মানুষের পরিকল্পনা ভাসিয়া যায় এবং বিধাতারটাই টিকিয়া যায়। এখানে মানুষকে বিধাতার নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। রামপ্রসাদ সংসারে উদাসীন থাকিয়া কাটাইবেন ইহা বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা নয়। তাই ঘটনাচক্রে তাঁহাকে সংসারে মন দিতে হইল। কিছু

দিনের মধ্যে পিতা রাম রাম সেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সংসার নির্বাহের পথ বন্ধ হইল। পৈত্রিক ব্যবসায়ে কখনও মন দেন নাই, রামপ্রসাদকে আর্থিক দুর্দশায় পড়িতে হইল। প্রয়োজন চেষ্টার মূল, প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহাকে সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায় খুঁজিতে হইল। বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে যে কর্মের সংস্থান হইবে আর্থিক উন্নতি হইবে এবং আয়েসে দিন কাটিবে এমন কোন নিয়ম নাই। সরস্বতীর কৃপা থাকিলে যে লক্ষ্মীরও কৃপা থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ফার্সী এবং উর্দুতে ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সুপারিশ বা পিছনে বড় লোকের সহানুভূতি না থাকাতে কর্ম যোগাড় করিতে পারিলেন না। কিছুকাল অভাবের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তাঁহার অদৃষ্ট একটু সুপ্রসন্ন হইল। ভগবৎ কৃপায় তিনি কলিকাতার গরাণহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের স্টেটে ত্রিশটাকা বেতনে সামান্য হিসাব রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার সাংসারিক অভাব কিছু দূর হইল বটে, কিন্তু মানসিক অভাব দূর হইল না। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিবার কোন উপায় হইল না। তাই মায়ের নিকট মিনতি জানাইতেন যদি তাঁর দয়া হয়। বক্ষ নিঙড়াইয়া মাতা সন্তানকে পালন করেন তাই ছেলের ব্যথা মায়ের বুকে বেশী বাজে, সত্যই বিশ্বজননীর দয়া হইল। তাঁহার দয়ায় রামপ্রসাদের মধ্যে মাতৃভাবের উদ্দীপনা হইল, ভক্তির উৎসমুখ খুলিয়া গেল। স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনার মধ্য দিয়া মাতৃ আরাধনা চলিতে লাগিল। জমিদারের হিসাবের খাতা তাঁহার রচিত গানে ভরিয়া গেল। পেটের দায়ে জমিদারের হিসাব রক্ষকের কাজ নিয়াছেন। সুতরাং তিনি মাইনের চাকর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মায়ের বিনা বেতনের চাকর। ভক্তির মালা গাঁথিয়া মায়ের রাঙা চরণে উপহার দেন। প্রাণের আকূতি দিয়া রচিত গান মায়ের খাতায় নিত্য জমা হয়। ভক্তি কৌটা পূর্ণ হয়। অন্যদিকে জমিদারের খাতায় টাকার অঙ্কে কিছু জমা পড়ে না। হিসাবের খাতা গানের খাতায় দাঁড়াইয়াছে। তিনি হিসাব লিখিবার জন্য মাসিক বেতন পান। গান লিখিবার জন্য নয়, রামপ্রসাদ ঠিক ঠিক কাজ করিতেছেন না। কর্মে অবহেলার জন্য জমিদারের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ গেল।

জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র একদিন তদন্তে আসিয়া দেখিলেন হিসাবের খাতা রামপ্রসাদের রচিত গানে ভর্তি। উহা হিসাবের খাতা না বলিয়া গানের খাতা বলিলে ঠিক হয়। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইল। অপরাধ শাস্তির যোগ্য কিন্তু একটা গানের কলিতে জমিদারের মন গলিয়া গেল। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন 'মা আমায় দাও গো তহবিলদারী, আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী।

বিনা মাইনের চাকর আমি শুধু তোমার চরণ ভিখারী'। জমিদার দুর্গাচরণের মন অন্য উপাদানে গঠিত, সাধারণ লোকের মত নয়। হয়ত তাঁহার অন্তরে সুপ্ত ধর্মভাব ছিল। 'আমি শুধু তোমার চরণ ভিখারী' কলিটি তাঁহার হৃদয় বীণায় মধুর ঝঙ্কার তুলিল। তিনি বুঝিলেন রামপ্রসাদ পেটের দায়ে কর্ম স্বীকার করিলেও সামান্য নন। অন্ন বস্ত্রের চিন্তা হইতে রেহাই পাইলে তিনি অসাধারণ হইবেন সন্দেহ নাই। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত সৎবৃত্তি স্ফুরণে বাধা না পাইলে তিনি আধ্যাত্মিক বন্যায় দেশকে ভাসাইয়া দিবেন সেই সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি রামপ্রসাদকে সামান্য কর্মচারী বলিয়া অবহেলা ত করিলেনই না বরং সসম্মানে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে (রামপ্রসাদকে) আর চাকরি করিতে হইবে না, অন্ন বস্ত্রের ভাবনা করিতে হইবে না। তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তিনি বাড়ী ফিরিয়া যত ইচ্ছা মাতৃ আরাধনায় ডুবিয়া যাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বে যেমন মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইতেন এখন হইতে যতদিন জীবিত থাকিবেন মাসে মাসে ঐ টাকা তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মায়ের সন্তান মায়ের পূজা ধ্যানে ডুবিয়া থাকিলে জীবন ভালভাবে কাটিয়া যাইবে। বিশ্বজননী সন্তানকে সর্ব রকমে সাহায্য করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভগবান শরণাগতের ভার নেন। যোগক্ষেম বহন করেন, শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। রামপ্রসাদের অন্ন বস্ত্রের চিন্তা দূর হইল। ভগবৎ পথের প্রতিবন্ধক সরিয়া গেল। নিরন্তর মাতৃআরাধনায় ডুবিয়া যাইবার সুযোগ মিলিল। জন্মভূমি হালিসহরে ফিরিয়া আসিলেন। কখনও ঘরে বসিয়া কখনও গঙ্গায় নামিয়া এক গলা জলে নামিয়া প্রাণের আবেগে গান করিতেন। স্বরচিত গানগুলি তাল মান লয়ের সহিত এমন মধুর কণ্ঠে গাহিতেন যে বাহিরের জগতের হুঁশ থাকিত না। গানের ভাবে তাঁহার মন মায়ের শ্রীচরণ ধ্যানে ডুবিয়া যাইত। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে জানিতে পারিতেন না। এই আবেগ ভরা গানের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। গঙ্গায় চলিতে চলিতে নৌকার মাঝিরা দাঁড় বন্ধ করিয়া তাঁহার গান শুনিত আর মুগ্ধ হইত। শুধু নৌকার মাঝিরাই যে তাঁহার গানের সমজ্‌দার ছিলেন তাহা নয়, অনেক বিশিষ্ট লোকও ছিলেন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। জহুরীই প্রকৃত হীরা চেনে এবং তাহার মুল্য ঠিক করিতে পারে। একদিন গঙ্গায় নৌকা করিয়া যাইবার সময় রামপ্রসাদের আবেগ ভরা গানে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাকে নদীয়ায় গিয়া বাস করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিত্য ঐরূপ ভক্তিমূলক মাতৃসঙ্গীত শুনিবার সুযোগ পাইবেন এবং শান্তি লাভ

করিবেন। রামপ্রসাদ স্বভাবকবি, স্বরচিত গানের মালা গাঁথিয়া তিনি মায়ের বন্দনা করেন। সাধনার অনুকূল স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে মাতৃসেবা এবং স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে মহারাজ বিন্দুমাত্র রুষ্ট ত হইলেনই না বরং তাঁহার নিষ্ঠা এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি অতিশয় বিবেচক। এই প্রকার একনিষ্ঠ সাধক অন্ন-বস্ত্রের ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাহাতে নিরন্তর মাতৃচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে পারেন তার জন্য একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করিলেন। কবি, ভক্ত, সাহিত্যিক রামপ্রসাদও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা তখন বাংলার নবাব। দেশ ইংরেজের অধীনে আসে নাই। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের মতে নবাবের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তাঁহার যে অনেক গুণ ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য অনেক সময় বিজেতৃ জাতির ঐতিহাসিকগণ স্বজাতির কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য বিজিতদের সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের চরিত্রে কালিমা লেপন করেন। সিরাজউদ্দৌলার ক্ষেত্রে যে উহা হয় নাই তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ। তিনিও গানের সমজ্‌দার ছিলেন। একদিন তিনি নৌকা করিয়া গঙ্গা দিয়া যাইতেছিলেন তখন রামপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া প্রাণের আবেগে শ্যামা সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। মধুর সঙ্গীতে সাড়া দেয় না এমন কোন প্রাণী আছে কিনা সন্দেহ। এমন কি পশুপক্ষীও সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়। বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া নাচে, ময়ুর তালে তালে নৃত্য করে, হিংস্র জানোয়ারও সাড়া দেয়। আর সে সঙ্গীত যদি মাতৃসঙ্গীত হয় তবে ত কথাই নাই। মায়ের মধুর গান কানে পৌছিবা মাত্র নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিবিষ্ট মনে গান শুনিতেছিলেন। গান থামিলে নবাব তাঁহাকে আরও গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে রামপ্রসাদ ভাষাবিদ্; সংস্কৃত, বাংলা ব্যতীত ফার্সী এবং উর্দু ও শিখিয়াছিলেন। উর্দু গানেই নবাব সন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া রামপ্রসাদ উর্দু গান ধরিলেন। কিন্তু মাতৃসঙ্গীতই নবাবের কানে মধু ঢালিয়াছে। উর্দু সঙ্গীত তিনি বহু শুনিয়াছেন। রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত তাঁহাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে যে অন্য কিছুতে এত করে নাই। নবাব তাঁহাকে মাতৃসঙ্গীত করিতেই অনুরোধ করিলেন। রামপ্রসাদও মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া অন্যের মনে আনন্দ দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল হৃদয়ের গ্রন্থিসকল একে একে খুলিয়া যাইতে লাগিল। নিরন্তর মায়ের গান, চিন্তা ও ধ্যানে ডুবিয়া থাকিবার জন্য তিনি তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিকটে একটা পরিষ্কৃত স্থানে বিল্ব, নিম, আমলকী, বট, অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চবটী তৈয়ার করিলেন এবং তাহারই মধ্যখানে মৃত মানুষ, বানর, শৃগাল, নেউল এবং সর্পের মুণ্ড চারিদিকে চারিটি এবং কেন্দ্র স্থানে একটি পুঁতিয়া পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈয়ার করিয়া সাধনে রত রহিলেন। গভীর রাত্রিতে সাধনায় বসিয়া নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা দ্বারা অশ্রু সিক্ত জলে মাতৃপূজার অর্ঘ্য দিতেন। তাঁহার অন্য কোন কামনা নাই, এক মাত্র কামনা অনন্তকে বিশ্বজননীরূপে অনুভব করা। এইভাবে আরাধনার মধ্য দিয়া একটা বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রামপ্রসাদ দেখাইলেন যে সকলে ইচ্ছা করিলে মাতৃকোলে স্থান পাইতে পারে। কখনও কখনও মায়ের নিকট কাতর প্রার্থনা, আবার কখনও কখনও তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া, মান-অভিমানের পালা চলিত। পুত্র মাতৃ সংস্পর্শ পাইবার জন্য ছট্‌ফট করে, 'পাষাণী পাষাণের মেয়ে দয়া কি মা আছে, দয়া থাকলে মরে কি গো কোটি কোটি সন্তান তোর' বলিয়া অভিযোগ করে। পুত্রের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য মাতা নানারকম মায়াজাল সৃষ্টি করেন। দুঃখ কষ্টের আগুনে দগ্ধ করিয়া ভক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তবে কোলে স্থান দেন। তখন মাতাপুত্রের দিব্য সম্বন্ধ সম্যক্ বুঝা যায়। জ্ঞানের কবাট খুলিয়া যায়। মাতৃভাবের মধ্য দিয়া ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এরূপ গভীর প্রেমের সম্বন্ধ সচরাচর দেখা যায় না, কোন ধর্মে পাওয়া যায় না, সাহিত্যে ইহার তুলনা মিলে না।

একবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। প্রবল ঝড়ে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙিয়া যায়। ঘর মেরামত করা দরকার। ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া চলে না। নইলে বাস করা অসম্ভব। আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে মজুর নিযুক্ত করিয়া উহা মেরামত করেন। তখন বাধ্য হইয়া নিজেই মেরামতের কাজে লাগিয়া গেলেন। একা একা বেড়ার বাঁধন দেওয়া চলে না, বেড়ার অপর দিক হইতে দড়ি ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য একজন লোকের দরকার। অগত্যা ছোট মেয়ে জগদীশ্বরীর সাহায্যে বেড়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে রামপ্রসাদ প্রাণের আবেগে মায়ের গান ধরিলেন। হঠাৎ কোন কাজের জন্য জগদীশ্বরীকে অন্যত্র যাইতে হইল কিন্তু রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার কাজ মুহূর্তের জন্য বন্ধ হইল না। বেড়ার অপর দিক হইতে দড়ি ফিরাইয়া দেওয়ার কাজ চলিতেছে। তখন জগতের ঈশ্বরী কন্যা জগদীশ্বরীর কাজ করিতেছে। কন্যা জগদীশ্বরী পিতা রামপ্রসাদের

গানে মুগ্ধ হউক আর না হউক কিন্তু জগতের ঈশ্বরী যে পুত্র রামপ্রসাদের গানে মুগ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। পুত্রের মুখে মাতৃসঙ্গীত শুনিবার জন্যই বিশ্বজননী কন্যারূপে পিতার সাহায্য করিতেছেন। অথচ রামপ্রসাদ গানে এত মত্ত যে কন্যা জগদীশ্বরী কখন যে চলিয়া গিয়াছে জানেন না। অনেক্ষণ পর কাজ শেষ করিয়া কন্যা জগদীশ্বরী দেখিল যে বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ হইয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে কে দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে এতক্ষণ কন্যা জগদীশ্বরী কাছে ছিল না। বিশ্বজননীই কন্যারূপে কাজের সাহায্য করিয়াছে। পুত্রের প্রতি মায়ের টান দেখিয়া রামপ্রসাদের হৃদয় গলিয়া গেল।

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন এমন সময় এক অপূর্ব সুন্দরী অপরিচিতা বালিকা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আব্দার ধরিল যে তাহাকে মাতৃসঙ্গীত শুনাইতে হইবে। তিনি তখন বালিকাকে বলিলেন 'মা, দ্বিপ্রহরের মায়ের পূজার দেরী হইয়া যাইতেছে, তুমি অপেক্ষা কর, মায়ের পূজা শেষ করিয়া তোমায় গান শুনাইব'। রামপ্রসাদ মায়ের পূজা শেষ করিয়া বালিকাকে খুঁজিলেন কিন্তু কোথাও পাইলেন না। তখন বুঝিলেন উহা মায়ের লুকোচুরি খেলা। তিনি বালিকা-রূপে মাতৃসঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার মত দুঃখ আর নাই। ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে মা অন্নপূর্ণাই মাতৃসঙ্গীত শুনিবার জন্য বারাণসী হইতে আসিয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছেন। নিজের মনে ধিক্কার আসিল, 'আমায় ডেকে ডেকে ফিরে গেছেন মা, আমায় না পেয়ে চলে গেছেন, আসবে না বুঝি।' মা অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবেন সংকল্প করিয়া পদব্রজে বারাণসীর পথে রওনা হইলেন। ত্রিবেণী পর্যন্ত আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে এক গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছেন। তন্দ্রায় চোখ অভিভূত হইয়া আসিতেছে। এমন সময় আবার মধুর বাণী শুনিতে পাইলেন। হালিসহরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়া মা অন্নপূর্ণা বলিলেন 'আমি যে শুধু বারাণসী থাকি তা নয়। আমি বিশ্বজননী, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছি, ভক্তহৃদয় আমার বাসস্থান।' মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করিয়া আবেগ ভরে গাহিয়া মাকে শুনাইলেন, মাও প্রীত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি সর্বব্যাপী, তাঁহার শ্রীচরণই পবিত্র, বারাণসী, গঙ্গা এবং সমস্ত তীর্থ তাঁহার চরণ স্পর্শে ধন্য হয়। গভীর বিশ্বাস হৃদয়ে নিয়া মায়ের আদেশে রামপ্রসাদ আবার হালিসহর ফিরিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁহাদের পরিবারে আবার বিপর্যয় ঘটিল। তাঁহার

গর্ভধারিণী সরস্বতী দেবীর দেহরক্ষা হইল। পুত্র রামদুলাল এখন সাবালক হইয়াছে, সংসারের দায়িত্ব বহন করিতে পারে। সংসার বন্ধন কাটিবার জন্ত রামপ্রসাদ এখন অতিশয় ব্যগ্র। নিরন্তর মাকে দর্শন করিবার জন্ত মন আকুল। পঞ্চবটীতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কঠোর সংকল্প নিয়া ধ্যানে বসিলেন—হয় সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং মাকে নিরন্তর দর্শন করিবেন, না হয় দেহপাত করিবেন। দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। মা-ই ধ্যান, মা-ই জ্ঞান, সন্তানের কাতরতায় মা থাকিতে পারেন না। তিনি ভক্তির ডোরে বাঁধা, প্রেমে বিগলিত হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদকে দর্শন দিলেন। এই অনুভূতি বর্ণিত আনন্দের বেগ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। জগৎ ভুল হইয়া গেল। কোথায় কি ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দিন রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। পরে দেহে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

এই দিব্য দর্শনের পর তাঁহার জীবনের একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। হৃদয়ে আনন্দ, মনে বিপুল শান্তি, নিরন্তর মাতৃচিন্তা। ভাবের উৎস খুলিয়া যাওয়াতে নূতন নূতন গান রচনা করিয়া মায়ের নৈবেদ্য সাজাইলেন। এই রচনা এমন মধুর এবং ভাবোদ্দীপক যে শুধু গায়ক নয়, শ্রোতার মনেও মাতৃভাবের উদ্দীপনা জাগায়। এই রচনা শুধু যে সেকালের উপযোগী তাহা নয়, পরবর্তী যুগে বহু সাধক এবং অগণিত শ্রোতার আনন্দের খোরাক যোগাইয়া আসিতেছে। এখনও রামপ্রসাদী গানে মানুষ মাতোয়ারা হয়। এবং ভবিষ্যতেও যে হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। এই গীতাবলী রচয়িতার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইয়াছে, পরেও অনেকের মিটাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রেমিক মহাপুরুষের উদ্দীপনাপূর্ণ গীতাবলী যতই লোকের মধ্যে ছড়াইল ততই মাতৃভাব প্রসার লাভ করিল। তাঁহার গুণগ্রাহীর সংখ্যা বাড়িল, সমাজের সকল স্তরের মধ্যে একটা নব জাগরণের সূচনা দেখা গেল। অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইলেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। পূর্বে বলা হইয়াছে রাম-প্রসাদের জন্মস্থান হালিসহরে বৈষ্ণব সাধনা এবং শক্তি সাধনার দুই ভাবধারা যুগপৎ প্রবাহিত হইতেছিল। এ দুটি ধারার অনুগামীদের মধ্যে রেষারেষি ভাব দেখা যাইত বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধক এবং সিদ্ধদের মধ্যে ইহার কোন মূল্য ছিল না। বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে তখন আজু গোস্বামীর খুব নাম। তিনি একাধারে ভাবুক, সাধক এবং কবি। অন্যদিকে রামপ্রসাদও ভাবুক, কবি, সিদ্ধ মহাপুরুষ। আজু গোস্বামী বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া ভক্তের নিকট শক্তি সাধকদের হীন করিতে

চেষ্টা করিতেন অন্যদিকে রামপ্রসাদ পাল্টা গান রচনা করিয়া মাতৃ উপাসনার মহত্ত্ব দেখাইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উভয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহাদের গান শুনিবার জন্য তিনি কখনও কখনও উভয়কে এক আসরে আনিয়া শাক্ত আর বৈষ্ণবের লড়াই লাগাইয়া মজা দেখিতেন। আজু গোসাঁই রসিক, শক্তি সাধনাকে হেয় করিবার জন্য স্থান কাল পাত্রানুযায়ী গান রচনা করিবার ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহার গান শ্রোতার মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারিত না। রামপ্রসাদ স্বভাবকবি, সিদ্ধ মহাপুরুষ, মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই। সেইজন্য তাঁহার ভাবোদ্দীপক গান শ্রোতার মনকে বেশী আকৃষ্ট করিত। এই কারণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইলেন। আড়ম্বরহীন এই সিদ্ধপুরুষ যখন তান্ত্রিক উপাচারে দেবীর পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং মাঝেমাঝে ভাবের আবেগে নূতন ভক্তিমূলক গান রচনা করিয়া দেবীর অর্ঘ্য দিতেন, তখন তিনি অন্য লোক হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে এ জগতের লোক বলিয়া মনে হইত না। তখন শুধু তিনি আছেন আর তাঁহার ইষ্ট মা আছেন, জগৎ ভুল হইয়া যাইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার এই সন্তানভাবে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

রামপ্রসাদ মায়ের কৃপায় তাঁহার দর্শন মাঝে মাঝে পাইতেন, কিন্তু তিনি নিরন্তর মাতৃসন্দর্শন করিতে চান। তাহা করিতে হইলে আরও কঠিন সাধনার প্রয়োজন। তাই উঁচুদরের সিদ্ধ মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বিদ্বান্, বহু তন্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া তন্ত্র সাধনায় নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট তন্ত্রের নূতন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া রামপ্রসাদ আরও গভীর সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। প্রথমে কঠিন বামাচার প্রথা মত সাধনায় রত হইলেন। নারীর সংস্রবে আসিয়া সাধনা করিতে হয় বলিয়া ইহাতে বহু সাধকের পতন ঘটে। দেবীর কৃপা না থাকিলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। একনিষ্ঠ ভক্ত রামপ্রসাদ ইষ্টের কৃপায় ইহাতে উত্তীর্ণ হইলেন। তারপর কৌলাচার প্রথায় সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহাতে কৃতকার্য হইলেন। শব সাধনা তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গ। অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাত্রে শ্মশানে শবের বুকের উপর বসিয়া এই সাধনা করিতে হয়। সাধারণ সাধকের পক্ষে এই সাধনা করা অসম্ভব বলিলে চলে। বিভীষিকা দেখিয়া অনেক সাধক অগ্রসর হইতে পারেন না। কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রামপ্রসাদের প্রতি দেবীর অজস্র কৃপা ছিল বলিয়া তিনি সহজে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহার পর তিনি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর মায়ের উপস্থিতি এবং স্নেহ অনুভব করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধির পর তাঁহার মধ্যে অলৌকিক শক্তি দেখা দিল। একদিন গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতে বসিয়া আপন মনে মায়ের গান করিতেছেন। সন্তানের ভক্তিতে প্রীত হইয়া দিব্য জ্যোতিসম্পন্না মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছা হইলে ফুল তুলিতে গিয়া গাছে দুটি রক্তজবা দেখিয়া তুলিয়া মাকে অঞ্জলি দিলেন। অন্য একদিন তিনি আসনে বসিয়া মাতৃচিন্তা করিতেছেন এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠিল। বড় বড় গাছ মূলোৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গেল, অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইল কিন্তু রামপ্রসাদের গৃহ কিংবা তাঁহার সাধনার স্থান পঞ্চবটীর কোন প্রকার অনিষ্ট হইল না। রামপ্রসাদের প্রতি মায়ের অশেষ কৃপা আছে বলিয়া তাঁহার গৃহ এবং সাধনার স্থান টিকিয়া আছে, এই ধারণা প্রতিবেশীদের মনে বদ্ধমূল হইল। এইজন্য অনেকে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইলেন।

রামপ্রসাদের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি জানেন মা-ই সব হইয়াছেন। বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে কৃষ্ণরূপে উপাসনা করেন, তিনি মা-ই। আর কেহ নন, মা-ই। মা-ই বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি, শিবের শিব শক্তি, শ্যামা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি। ব্রহ্মই মাতৃরূপে ভক্তের জন্য সান্ত সাকার রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। তিনি প্রেমের ডোরে বাঁধা।

রামপ্রসাদের গান ভক্তিধারার প্রবল প্রবাহ। বহু উত্তর সাধক রামপ্রসাদী গান মাতৃসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। জগৎবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রায়ই রামপ্রসাদের গানে অন্যদের মুগ্ধ করিতেন। রামপ্রসাদের ডাক আসিয়াছে। মাতৃকোলে মাথা গুঁজিবার সময় হইয়াছে। বয়স ৮০ হইয়াছে। মায়ের ইঙ্গিতও মিলিয়াছে। একদিন গঙ্গায় এক বুক জলে নামিয়া মনের আবেগে মাতৃসঙ্গীত ধরিলেন, কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া মন ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু বাহির হইয়া মহাপ্রাণে মিলিয়া গেল। দেহ মা গঙ্গা ভাসাইয়া নিল। ছেলে মা পাইল, মা ছেলেকে বুকে নিলেন। দুই এক হইল, জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া গেল

॥ সাতাশ ॥

বামাক্ষেপা

শক্তি আরাধনা ভারতে নূতন নয়। বহুকাল হইতে ইহার প্রচলন আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ক্যাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, তৈত্তিরিয় আরণ্যক, ঋক্ সংহিতা প্রভৃতি নানা ধর্মগ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার ব্যাপক বিস্তার হয়। ভগবৎশক্তিই জগৎকে বিধৃত করিয়া আছেন। তন্ত্রে এই শক্তিকে শিবের অর্ধাঙ্গিনী, দেবীভাগবতে দেবী, মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধক তাঁহাকে মাতৃরূপে আরাধনা করেন। এই শক্তি এবং ব্রহ্ম অভেদ। তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দরূপিণী। উত্তরে কাশ্মীর দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম এবং গৌড় দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্র শক্তি পূজার প্রচলন দেখা যায়। যে স্থানে শক্তির আরাধনা করিয়া বহু সাধক সিদ্ধ হন, সে স্থান ক্রমশঃ সিদ্ধপীঠরূপে বিখ্যাত হইয়া উঠে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপীঠ বহুকাল হইতে এরূপ সিদ্ধপীঠ বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বহু শক্তিসাধক এস্থানে তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পীঠের পীঠত্ব রক্ষা করিয়াছেন। বীরভূম যে শুধু শক্তি সাধনার কেন্দ্র তাহা নহে। বৈষ্ণব সাধনার ধারাও এখান হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস, জয়দেব, নিতানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষেরা বৈষ্ণব সাধনার ধারক ও বাহক। অন্যদিকে আনন্দনাথ, কৈলাসপতি বাবা, মোক্ষানন্দ প্রভৃতি শাক্ত-অবধূতগণ তন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখেন। বামাক্ষেপা ভক্তি, ত্যাগ, তপস্যা এবং জীবন দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান নাই। একরকম নিরক্ষর বলিলেই চলে। একান্ত ভগবৎ নির্ভরশীল সাধকের পক্ষে ঐসব না হইলেও চলে। তিনি আর কিছু চান না, জানিতে চেষ্টা করেন না, প্রয়োজনও বোধ করেন না। অহমিকা বিশ্বজননীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন। সাধারণ গণ্ডি ছাড়িয়া অসাধারণে চালিয়া দেন। তারাপীঠের বামাক্ষেপা অসাধারণ উত্তর সাধক।

১৮৩৭ সালের ১২ই ফাল্গুন তারাপীঠের নিকটে আটলা গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বামাক্ষেপা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সর্বানন্দ চ্যাটার্জি সামান্য গৃহস্থ। দারিদ্র্য মানুষের গুণরাশি নষ্ট করে, কিন্তু তাঁহার গুণরাশি নষ্ট করিতে পারে নাই। আর্থিক কষ্টে পতিত হইয়াও তিনি সরলতা, পবিত্রতা, উদারতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের

গুণ বিসর্জন দেন নাই। মাতা রাজকুমারী দেবীও স্বামীর মত ধর্মপরায়ণা, পিতামাতা সৎ হইলে পুত্রও সৎ হয় ইহা স্বাভাবিক। কখনও কখনও যে ইহার ব্যতিক্রম হয় না তা নয়। বামাক্ষেপা সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। পিতৃদত্ত নাম বামাচরণ চ্যাটার্জি। ছোটবেলা হইতে তাহার চালচলন অন্য রকমের ছিল। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে দৃষ্টি নাই, কোন বিষয়ে আঁট নাই। সবই আল্‌গা আল্‌গা, ভোলানাথের ভাব দেখিয়া লোকে তাহাকে পাগলা ক্ষেপা বলিত। তাহার অদ্ভুত খেয়াল ছিল, রাত্রে চুপি চুপি প্রতিবেশীদের মন্দিরের বিগ্রহ নিয়া দূরে নদীর ধারে কিংবা নির্জন শ্মশানে জড় করিত এবং প্রাণ ভরিয়া পূজা করিত। ছেলেরা নানা রকমের খেলাধূলায় মাতিয়া থাকে। বামাচরণের পক্ষেও ইহা এক রকম খেলা এবং এই খেলায় তাহার খুব আনন্দ হইত। মন্দিরের বিগ্রহ হারাইয়া গেলে গৃহস্থেরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেন এবং পরে হারানো বিগ্রহ ফেরত পাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতেন। ক্ষেপা ছেলে বামাচরণ ঐ রকম করিয়াছে বলিয়া তাহাকে খুব তিরস্কার করিতেন। বিগ্রহ চুরি করিয়া পূজা করা ব্যতীত তাহার আরও অনেক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। মাঝে মাঝে গ্রামের বাহিরে খড় জড় করিয়া গাদার মধ্যে আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ করিতে গিয়া গাদায় আগুন লাগিয়া গেল। অবশ্য ভগবৎ কৃপায় কোন মতে জীবন রক্ষা পাইল।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম বলিয়া বামাচরণের লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা হইল না। অক্ষর জ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। মা সরস্বতী কৃপা করিলেন না। দূর হইতে বিদায় নিলেন আর মা লক্ষ্মী ত পূর্ব হইতেই বিমুখ ছিলেন। আর্থিক কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার আশায় পিতা সর্বানন্দ চ্যাটার্জি নিজ পুত্র এবং প্রতিবেশীদের লইয়া যাত্রার দল খুলিলেন। তিনি নিজে ভাল গায়ক, বেহালাবাদক হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল। একটু ভাল শিক্ষা দিলে সকলেই সুন্দর অভিনয় করিতে পারিবে এবং পালা গান করিয়া নিজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কপাল যখন মন্দ হয় তখন সব আশা উল্টা খাতে বহিয়া আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সর্বানন্দের তাহাই হইল। অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। ছেলে লেখাপড়া না শিখিলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইবে সেইজন্য ধর্মপরায়ণা মা রাজকুমারী নিজের ছেলেকে শিক্ষা দিতে চেষ্টিত হইলেন, মায়ের উৎসাহে বামাচরণ অনেক উন্নতিলাভ করিল। রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পড়িতে শিখিল। তাহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। দেবদেবীর গান তাহার খুব ভাল লাগিত। তাহার এক ধর্মপরায়ণা বিধবা ভগ্নী ছিল। সে ক্ষেপা ভাইয়ের দেখাশুনা করিত এবং ছোটবেলা হইতেই

তাহার মধ্যে ধর্মভাব জাগাইবার চেষ্টা করিত। তাহার প্রেরণায় বামাচরণ রামায়ণ, মহাভারত ব্যতীত আরও কিছু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল, এগুলি পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লাগিয়াছিল।

বামাচরণের কপাল মন্দ, ছোট বেলাতেই পিতৃবিয়োগ হইল, একে ত ক্ষেপা ছেলে, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ ঘটিল না। এমন অবস্থায় তাহাকে কিরকম কষ্টের মধ্য দিয়া যাইতে হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজকুমারী ছেলেদের নিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। সংসার চলে না, লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবেন সে অনেক দূরের কথা, তাহারা যদি খাইয়া দাইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তবে মঙ্গল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি ছেলেদের তাঁহার ভাইয়ের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার ভাই বিষয়ী লোক। পরের ছেলের জন্য টাকা পয়সা খরচ করা বৃথা। তিনি ভাগিনাদের গরু চরাইতে লাগাইয়া দিলেন। বামাচরণ গরু চরাইবার কাজেও অনুপযুক্ত। তাহাকে অবিলম্বে তাহার মার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষেপা ছেলে যে সংসারের কোন কাজেই লাগিবে না তাহার প্রমাণ মিলিল। কিন্তু সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে না পরিলে যে মানুষের জীবন বৃথা যায় এমন কোন কথা নাই। সংসার সুখ সকলের জন্য নয় এবং সকলের জীবনের লক্ষ্যও হইতে পারে না। খাওয়া দাওয়া ব্যতীত জীবনের অন্য উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। বামাচরণের জীবন সাধারণ সংসারী জীবনের সঙ্গে খাপ খাইবে না বলিয়াই বোধহয় বিশ্বজননী তাহাকে অন্য ধাতুতে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেক সময় গ্রাম হইতে ফুল বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সে ভক্তিভরে পূজা করিত। সে যখন 'মা তারা' বলিয়া মার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিত তখন অন্য মানুষ হইয়া যাইত, দেহের হুঁশ থাকিত না। নিজ সত্তা ভুলিয়া মার সত্তায় ডুবিয়া যাইত। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইত মার পূজা সেবা করাই তাহার জীবনের ব্রত। জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ইহা তাহার ধারণার মধ্যে আসিত না। এই সময়ে একটা সুযোগও জুটিয়া গেল তারাপীঠে তখন কৈলাসপতি বাবা এবং মোক্ষানন্দ থাকিতেন। উভয়ই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন উঁচুদরের তান্ত্রিক যোগী। তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ। দেবীর সেবা পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য নাটোরের মহারাজের তরফ হইতে তাঁহাদের কর্মচারী দুর্গাদাস সরকার এখানে থাকিতেন। বামাচরণ কখনও কখনও তাঁহার নিকট যাইত এবং তাঁহার মারফতে উপরি-উক্ত তান্ত্রিক যোগীদের সংস্পর্শে আসিত। সৎসঙ্গে শুভ সংস্কার জাগিয়া উঠে। বামাচরণেরও তাহাই হইল। তাহার উপর তান্ত্রিক যোগীদের

প্রভাব পড়িল। তাহার শুভ সংস্কার এবং মাতৃপদে অচলা ভক্তি দেখিয়া যোগীরা তাহাকে সাধনভজনে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বামাচরণের জন্ম-জন্মান্তরের শুভ সংস্কার এখন তান্ত্রিক যোগীদের সংস্পর্শে স্ফুরণোন্মুখ হইল। তাহার ইচ্ছা নিরন্তর মাতৃধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়া দিব্যানন্দ লাভ করে। পুত্রের আল্‌গা আল্‌গা ভাব দেখিয়া বামাচরণের মাতা রাজকুমারী ক্ষেপা ছেলেকে ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে 'বাধা পেলে জলে আরও এই ত প্রেমের ধারা' এবং সময় বিশেষে সব রকম প্রতিবন্ধক বন্যার ধারার মত ভাসিয়া যায়। বামাচরণের ভক্তির ধারা এখন তৈলধারার মত বহিতে লাগিল। জন্মার্জিত শুভ সংস্কার এখন স্ফুরণ হইবার সুযোগ পাইল। একদিন সুযোগ পাইয়া বামাচরণ দ্বারকা নদী সাঁতরাইয়া পুণ্যতীর্থ তারাপীঠে সিদ্ধতান্ত্রিক কৈলাসপতি বাবার নিকট উপস্থিত হইল। কৈলাসপতি বাবাও তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং কৃপা করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষা দিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। সুন্দর অথচ অনুকূল দেবস্থানে থাকিয়া ও গুরুর সন্নিকটে থাকিয়া মার ধ্যানে ডুবিয়া থাকিবার সুযোগ হইল বলিয়া বামাচরণের খুব আনন্দ। স্থানটি তাহার খুবই পছন্দ হইল।

বামাচরণের খবর বাড়ীতে মার নিকট পৌছিল। ছেলে পাগল হইলেও ছেলে, মা সকল সময়েই মা। ছেলে পর হইয়া যাইবে ইহা কোন মা সহ্য করিতে পারেন না। তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য মা তারাপীঠে আসিলেন। কৈলাসপতি বাবা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। অভয় দিয়া বলিলেন বামাচরণের কোন প্রকার অযত্ন হইবে না। মা তারা যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ চলে। তাঁহার ইচ্ছাতেই বামাচরণ ঘর ছাড়িয়াছে, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মায়ের চিন্তায় ডুবিয়া আছে। এদিকে গর্ভধারিণী মার কঠিন সমস্যা দাঁড়াইল—ছেলে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে তাঁহার কি করিয়া দিন চলিবে। যাহা হউক একটা সুরাহা হইল। নাটোর-মহারাজের কর্মচারী দুর্গাচরণ সরকারের মারফতে কিছু সাহায্য আসিতে লাগিল। বামাচরণকে দেবীর পূজার ফুল তোলা এবং অন্যান্য সেবা কার্যে সাহায্য করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়া কিছু টাকা তাহার মা রাজকুমারী দেবীর নামে দেওয়া হইল। কিন্তু বামাচরণ সামান্য ফুল তোলার কাজেও কোন প্রকার উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে পরিল না। অপদার্থ বলিয়া সকলে তাহার নিন্দা করিতে লাগিল। বামাচরণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মায়ের চিন্তা ও ধ্যানে ডুবিয়া থাকিত।

বামাচরণের এখন বয়স হইয়াছে। তিনি সকলের নিকট বামাক্ষেপা নামে

পরিচিত। বাড়ীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলেও নিজ গর্ভধারিণীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কোন দিনের জন্য শিথিল হয় নাই। গর্ভধারিণী বিশ্বজননীর অংশ। যিনি বিশ্বজননীর উপাসক তিনি কখনও নিজ গর্ভধারিণীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। ধর্মজগতে যাঁহারা মহৎ এবং প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবনে আকুণ্ঠ মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বামাক্ষেপা যখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতার দেহান্ত হইয়াছে, নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়াতে মৃতদেহ সংকার করিবার জন্য তারাপীঠের শ্মশানে আনা সম্ভব হইতেছে না তখন কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি দ্বারকা নদী সাঁতরাইয়া পার হইলেন। আত্মীয়দের নিকট হইতে মাতার দেহ নিয়া আবার সাঁতরাইয়া তারাপীঠ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভাইও আসিলেন। তাঁহার দ্বারা মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন।

বামাক্ষেপার ইচ্ছা হইল মায়ের শ্রাদ্ধ বেশ ভাল ভাবে হয় এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু লোকজনকে খাওয়ান হয়, কিন্তু বামাক্ষেপার আত্মীয়ের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অর্থ সংস্থান করা সম্ভব নয়, তবুও দেখা গেল এই উপলক্ষে যথাসময়ে জানা এবং অজানা স্থান হইতে প্রচুর সাহায্য আসিল এবং ভাল ভাল জিনিস তৈয়ার করিয়া আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের পরিতোষপূর্বক খাওয়ান হইল। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা ভোজনে বসিয়াছেন এমন সময় আকাশে গাঢ় কাল মেঘ উঠিয়া ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কাছাকাছি রাস্তা ঘাট জলে ভাসাইয়া নিল কিন্তু শ্রাদ্ধ মণ্ডপ এবং ভোজনের স্থানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না। বামাক্ষেপা বুঝিলেন, তারামায়ের কৃপাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বামাক্ষেপার অলৌকিক শক্তিতে এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে ভাবিয়া, লোকেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইল।

নিজ গর্ভধারিণী মাতার শেষ কৃত্য হইয়া গেল। এখন বামাক্ষেপার আর কোন বন্ধন নাই। তিনি আবার বিশ্বেশ্বরীর পূজা ধ্যানে ডুবিয়া থাকিবার জন্য তান্ত্রিক বিধিমত অনুষ্ঠানে রত হইলেন। কৈলাসপতি বাবা এবং মোক্ষানন্দজী তাঁহাকে তান্ত্রিক সাধনে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিলেন। উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ মত তপস্যা করিয়া শিষ্য ক্রমশঃ উচ্চ, উচ্চতর অনুভূতির স্তর ভেদ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তর্মুখীন ভাব দেখিয়া মনে হইল মা তারা ভক্ত সন্তান বামাক্ষেপার অন্তরে চিরতরে আসন পাতিয়া আছেন। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে। বহু প্রলোভন আসিয়া তাঁহার পতন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। একদিন এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহার ভৈরবী হইবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। চলিয়া যাইবার

জন্য বামাক্ষেপা তাঁহাকে বহু অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু যুবতী কিছুতেই গেলেন না। অনন্যোপায় হইয়া বামাক্ষেপা আত্মরক্ষার্থে তাঁহাকে চিম্‌টা নিয়া তাড়া করিলেন। তখন ঐ যুবতী ভয় পাইয়া বারবার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর একদিন তাবাপীঠের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী বামাক্ষেপাকে প্রলোভিত করিয়া তাঁহার পতন ঘটাইবার জন্য একজন বেশ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত বেশ্যা অসৎ উদ্দেশ্যে বামাক্ষেপার নিকট আসিয়া তাহার পুরুষাঙ্গ খুঁজিয়া পাইল না। বামাক্ষেপা পুরুষ কি মেয়ে কি নপুংসক কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহাব কার্য দেখিয়া বামাক্ষেপা মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যাটি পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইল। তাহার মুখ দিয়া গল গল করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে বামাক্ষেপার নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বামাক্ষেপা মহাপুরুষ। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। বেশ্যার অপরাধ নিলেন না। তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এই ঘটনার পর বেশ্যার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। বদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় বিশ্বজননীর প্রতি বামাক্ষেপার যেমন অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, বিশ্বজননীরও তেমনি সন্তান বামাক্ষেপার প্রতি অকুণ্ঠ স্নেহ ছিল। যখন বিপদ আসিয়াছে তখন মা সন্তানকে বাহুর বন্ধনে জড়াইয়া রক্ষা করিয়াছেন। মার কৃপায় বামাক্ষেপা কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সিদ্ধ পুরুষ কোন জায়গায় চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে চান না। যতদিন প্রয়োজন ততদিন থাকেন। প্রয়োজন ফুরাইলে মুক্ত পাখীর ন্যায় যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান। কৈলাসপতি বাবা এবং মোক্ষানন্দজী শিষ্য বামাক্ষেপার আধ্যাত্মিক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে এতকাল এখানে থাকিয়া পীঠের পীঠত্ব রক্ষা করিয়াছেন সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এখন হইতে বামাক্ষেপার উপর ঐ দায়িত্ব দিলে পীঠের পবিত্র ধারা অব্যাহত থাকিবে এবং মাহাত্ম্য বাড়িবে।

সিদ্ধ পুরুষেরা বিহঙ্গম জাতীয়। যেখানে খুশী স্বাধীনভাবে চলিয়া যান। কৈলাসপতি বাবা শিষ্যের নিকট বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। মোক্ষানন্দজীও তাঁহার পথ অনুসরণ করিলেন। এখন হইতে পীঠের পবিত্র আবহাওয়া অব্যাহত রাখার ভার বামাক্ষেপার উপর পড়িল, এই দায়িত্ব গুরুতর। ইহা বহুকালের পীঠ। কথিত আছে বশিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি উচ্চ আধ্যাত্মিকসম্পন্ন ঋষিদের সংস্পর্শে এবং বহু সাধকের তপস্যায় ইহার পবিত্র ভাব পুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র তপস্যা-প্রভাবেই ইহার কৌলিন্য বজায় রাখা সম্ভব। গুরুর আশীর্বাদে বামাক্ষেপা

স্বীয় জীবন দ্বারা পীঠের মাহাত্ম্য প্রচারে কৃতকার্য হইলেন।

বামাক্ষেপা কৌলাচার, দিব্যাচার প্রভৃতিতে সিদ্ধ। এখন কোন বাহিরের আচারের অধীন নন; কখনও কখনও রাস্তার কুকুরের সঙ্গে আহার করিতেন। কখনও বাহ্য প্রস্রাব করিয়া মন্দির সংলগ্ন পবিত্র স্থানাদি নষ্ট করিতেন। তিনি যে ইচ্ছাপূর্বক এরূপ অনাচার করিতেন তাহা নয়। তাঁহার নিকট আচার-অনাচার এক হইয়া গিয়াছে। তিনি এ সকলের পারে। মন্দিরের কর্মচারী তাঁহার এই অনাচার বহু সহ্য করিয়াছেন, কারণ মন্দির কর্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিল যে বামাক্ষেপাকে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ হুকুম অমান্য করে তবে তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হইবে। বামাক্ষেপা দিনরাত মাতৃচিন্তায় মগ্ন, তাঁহার নিকট শুচি অশুচি সব সমান। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট শুচি-অশুচির বিস্তর মূল্য আছে। তাহাদের পক্ষে এরূপ অনাচার সহ্য করা কঠিন। এরূপ অনাচার করার জন্য মন্দির কর্মচারী তাঁহার অন্ন বন্ধ করিয়া দিলেন। মায়ের কোন প্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত না। সিদ্ধ মহাপুরুষকে ইচ্ছাপূর্বক অবজ্ঞা করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হয়। তাহা কখন কিভাবে আসিবে বুঝা যায় না। নাটোরের মহারাজা এই সিদ্ধপীঠের মালিক। তাঁহার স্টেট্ হইতে পীঠস্থ মায়ের সেবাপূজার ব্যবস্থা হইত। বামাক্ষেপার অন্ন বন্ধ হইলে নাটোরের মহারাণী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে তিনি মহারাণীর সেবাপূজা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। তাঁহার প্রিয় সন্তান বামাক্ষেপা মন্দিরের কোন প্রকার প্রসাদ পাইতেছে না। সন্তানকে বঞ্চিত করিলে মায়ের প্রাণে লাগে। সন্তানকে বঞ্চিত করা মাকে বঞ্চিত করার সামিল। মহারাণী অবিলম্বে কড়া হুকুম পাঠাইলেন যে, বামাক্ষেপা যেমন ছিলেন তেমনই থাকিবেন। তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করা হইবে না। এই ঘটনার পর বামাক্ষেপার প্রতি অন্যায় অত্যাচার তো বন্ধ হইলই, বরং তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দূর দূর দেশ হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। কেহ আসিত কঠিন রোগমুক্তির আশায়, কেহ আসিত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নির্দেশের আশায়। বামাক্ষেপাও কাহাকে রোগমুক্তি কাহাকে ধর্মপথের নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনানুসারে তাহাদের যথাশক্তি সেবা করিতেন। তাঁহার নিকট আসিয়া কেহ বা মৃতপ্রায় পুত্র, কেহ বা মৃতপ্রায় কন্যা, কেহ বা মৃতপ্রায় স্বামীর জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

একদা মন্দিরের কোন কর্মচারী টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে কর্মচ্যুত হইলে

অনন্যোপায় হইয়া তিনি বামাক্ষেপাকে ধরিয়া বসিলেন এবং তাঁহার সুপারিশে কর্মে পুনরায় বহাল হইলেন। কন্যা ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে খবর পাইয়া রামপুরহাটের ডাক্তার হরিচরণ ব্যানার্জি দারুণ গ্রীষ্মের রোদে পদব্রজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তারাপীঠের নিকটে বামাক্ষেপার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি ডাক্তারকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাইতে বলিলেন। কন্যার জন্য ডাক্তারের মন চিন্তিত। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বেই কন্যা মারা গিয়াছে। বামাক্ষেপা অলৌকিক শক্তি বলে কন্যার মৃত্যুর খবর জানিতেন বলিয়াই যে তাঁহাকে (ডাক্তারকে) বিশ্রাম করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এখন তাহার মর্ম বুঝিতে পারিলেন। আর একদিন একজন মুমূর্ষু অতিকষ্টে তারাপীঠে আসিয়া মায়ের কিছু প্রসাদ চাহিল, তাহার আশা ছিল প্রসাদ পেটে পড়িলে হয়ত বাঁচিয়া উঠিতে পারে, কিংবা যদি মরিয়াও যায় তবে শান্তিতে মরিতে পারিবে। মুমূর্ষুকে দেখিয়া বামাক্ষেপার দয়া হইল। তিনি কিছু প্রসাদ দিলেন, লোকটি প্রসাদ খাইয়া সুস্থ শরীরে বাড়ী চলিয়া গেল। নন্দ হাড়ী নামে একজন অন্ত্যজ কঠিন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া বামাক্ষেপার শরণাপন্ন হইল। সমাজে অস্পৃশ্য শূদ্র হইয়াও সে মাঝে মাঝে বামাক্ষেপার জন্য খাবার নিয়া আসিত। অন্ত্যজ এবং কুষ্ঠরোগী বলিয়া বামাক্ষেপা তাহাকে কখনও হীন মনে করেন নাই। ক্ষতস্থানে মাখিবার জন্য তিনি মন্দির সংলগ্ন কিছু মাটি দিলেন। শরীরে ঐ মাটি ঘষিয়া সে এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। তাহার মনও ধর্মভাবে ভাবিত হইল।

বেলাগ্রামের নিমাই বহুদিন যাবৎ হার্নিয়ায় ভুগিতেছিলেন। ভয়ানক অর্থকষ্টের জন্য সংসার চালান কঠিন হইলে সে মনের দুঃখে আত্মহত্যার সংকল্প করিল। গলায় দড়ি দিয়া মরিবার জন্য একদিন গভীর রাত্রে তারাপীঠে আসিয়া ফাঁসিতে ঝুলিতে যাইতেছে এমন সময় বামাক্ষেপার 'মা তারা' 'মা তারা' ডাক শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আত্মহত্যা করা হইল না। মন্দিরের নিকটে থাকিয়া সে ভিক্ষান্নে দিন যাপন করিতে লাগিল তাহার নেশার অভ্যাস ছিল। একদিন গাঁজা সেবন করিবার জন্য আগুন খুঁজিতেছিল। তখন বামাক্ষেপা ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। কোথাও আগুন যোগাড় করিতে না পারিয়া সে ধুনি হইতে জ্বলন্ত কাঠ টানিয়া গাঁজার কল্কিতে আগুন দিল। সাধুদের নিকট ধুনি অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। নিমাইয়ের এরূপ অন্যায় কাজে বিরক্ত হইয়া বামাক্ষেপা তাহার তলপেটে জোরে এক লাথি মারিলেন। লাথির চোটে নিমাই অজ্ঞান হইয়া পড়িল, কিন্তু মারা গেল না। পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বাড়ী

ফিরিয়া গেল এবং ইহার পরে বহুদিন যাবৎ স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিল। অন্য একদিন একজন কঠিন যক্ষ্মাগ্রস্ত মুমূর্ষু রোগীকে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা খাটিয়ায় করিয়া বামাক্ষেপার নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহাকে দেখিয়া বামাক্ষেপা ভীষণ রাগিয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ তাহার ঘাড় মটকাইয়া আর কখনও পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে রোগী উঠিয়া বসিয়াছে এবং ক্ষুধার্ত হইয়া খাবার চাহিতেছে। কিছু খাওয়ার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিয়া গেল। বহু দুঃস্থ মুমূর্ষু রোগী তারা মায়ের কৃপায় এবং বামাক্ষেপার আশীর্বাদে সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে, কিন্তু সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে একথা বলা চলে না। কেহ কেহ নিরাশ হইয়াছে। একদিন একজন লোক ডাবি জুয়াখেলার প্রথম পুরস্কার পাইবার আশা নিয়া বামাক্ষেপার আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিল। বামাক্ষেপা তাহাকে এমন তাড়া করিলেন যে সে ভয়ে পলাইয়া গেল। অন্য একদিন কোন ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া ধ্যান করিতে বসিয়া নূতন জুতা কিনিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। টের পাইয়া বামাক্ষেপা তাঁহাকে মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান হইবার জন্য বলিয়া দিলেন। একবার কয়েকজন যুবক তারাপীঠে আসিয়া বামাক্ষেপাকে কুকুরের সঙ্গে অখাদ্য খাইতে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করেন, এমন সময় বামাক্ষেপা তাঁহাদের স্পর্শ করিলেন। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে বামাক্ষেপার নিকটে কুকুরগুলি দিব্য মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের কেহ সাপ, কেহ বাদুড় কেহ কুকুররূপে পরিণত হইয়াছে।

এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন বহু দূর দূর দেশ হইতে অজস্র লোক বামাক্ষেপার নিকটে আসিতে লাগিল। নগেন পাণ্ডা তাহাদের অন্যতম। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে বামাক্ষেপার কথায় মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়া আসে। তিনি সেইজন্য একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বামাক্ষেপার নিকট হাজির করিলেন। রোগীকে দেখিয়াই বামাক্ষেপা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'ফট্'। ফট্ মানে গেছে, বাস্তবিক রোগীটি তখন মারা গিয়াছে। নগেন পাণ্ডা বামাক্ষেপাকে ভীষণ দোষারোপ করিলেন যে তিনিই লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। তার উত্তরে বামাক্ষেপা বলিলেন যে তিনি লোকটির মৃত্যুর জন্য দায়ী নন। মা তারাই তাঁহার মুখ দিয়া ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটিত। যাহারা সরল অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট আসিত তাহাদের প্রতি তাঁহার আশীর্বাদ প্রায়ই ফলিত। একদা কোন যুবতী বিধবা তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি

অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাকে পুত্রবতী হইবেন বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বিধবার পুত্র লাভ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাঁহার মুখে ঐ কথা শুনিয়া বিধবাটি চমকাইয়া গেলেন। কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হয় না। বামাক্ষেপার কথা ফলিয়া গেল। উক্ত বিধবা যুবতীর সঙ্গে এক ধনী বৈষ্ণবের বিবাহ হইল এবং তিনি বহু সন্তানের জননী হইয়া সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন।

বর্ধমানের মহারাজা অপুত্রক ছিলেন। পুত্র কামনা করিয়া তিনি একদিন বামাক্ষেপার নিকট আসিলেন। কিন্তু তিনি এমন জাঁক-জমক বেশে আসিয়াছিলেন যে বামাক্ষেপার মনঃপূত হয় নাই। তিনি মহারাজাকে আমল দিলেন না। পরে অনুতপ্ত হইয়া মহারাজা তাঁহার নিকটে দীনভাবে আসিলে বামাক্ষেপা তাঁহাকে পুত্রলাভ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা ফলিয়া গেল। মহারাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন এবং বামাক্ষেপার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত হইলেন।

বামাক্ষেপা বলিতেন যে তিনি শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নাই। যখন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইত তখন মা তাঁহাকে সব জানাইয়া দিতেন। তিনি সর্বদা মার উপর নির্ভর করেন। মা ছাড়া কিছুই জানেন না। নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। মার ইচ্ছাই, তাঁহার ইচ্ছা। মা ইচ্ছাময়ী, মা জগৎজননী, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কারিণী, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া এই জগতের সব বস্তুতে ওত-প্রোত ভাবে রহিয়াছেন। তিনি সব মার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে কিছুই ভাবিতে হয় না। মা-ই তাঁহার ভাবনা ভাবেন, যোগক্ষেম বহন করেন। এবং তাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া জগতের কল্যাণ করেন।

দিন যাইতে লাগিল। বামাক্ষেপার বয়স হইয়াছে। তাঁহার ডাক আসিয়াছে। জন্ম নিলেই মরিতে হইবে। তিনি প্রস্তুত। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাইতে আনন্দই বোধ করে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার মন অন্তর্মুখীন হইল। তিনি নিরন্তর মাতৃচিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। কখনও কখনও এত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন যে দেহের হুঁশ থাকিত না। একদিন সত্যই শুভ দিন আসিল। ১৯১১ সালের শ্রাবণ মাসে পুণ্য দিনে বামাক্ষেপা মহাসমাধিতে লীন হইলেন। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ভক্তবৃন্দের দুঃখের সীমা রহিল না। তারাপীঠের জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। আধ্যাত্মিক জগতে অন্ধকার দেখা দিল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

॥ আটাশ ॥

রাজা রামকৃষ্ণ

মুরিয়েল লিস্টার একজন দরদী। জাতিতে ইংরেজ দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহার ভাল জানা আছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যে এত দুঃখ দেখা যায় তাহার কারণ ভগবানে অবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। অবিশ্বাস যত গভীর দুঃখ তত বেশী। বিশ্বাসেই আধ্যাত্মিক শক্তি জাগে, আত্মার শক্তি বাড়ে। দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি জন্মে, মনের শান্তি আনে। ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হয়। অবশ্য বিশ্বাস থাকিলেও যে দুঃখের হাত হইতে একেবারে রক্ষা পাওয়া যায় তা নয়, তবে দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সাময়িক দুঃখ পাইলেও অন্তিমে আনন্দ পাওয়া যায়। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যায়—জরা, ব্যাধি, মরণাদি দুঃখের কারণ, জন্ম জরাদির কারণ, বাসনা জন্মের কারণ, সুতরাং বাসনাই দুঃখের মূল কারণ, কারণের বিনাশে কার্য থাকে না। বাসনার নিবৃত্তিতে জন্মের নিরোধ, জন্মের নিরোধে জরাদির নিরোধ, জরাদির নিরোধে দুঃখের নিরোধ সুতরাং বাসনার নিবৃত্তিতে তজ্জনিত দুঃখেরও অবসান ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় গগনে একখানা গাঢ় কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। একদিকে নবাবের অত্যাচার, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকের দল বিজাতীয় বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশের সর্বনাশ সাধনে ব্যস্ত। জনগণের মনে দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, ভয়। কোথাও আনন্দ নাই। জীবনের স্পন্দন যেন স্তিমিত হইয়াছে। দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনেও নাটোরের রাজবাড়ীতে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিক বাজনার শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদ সাজানো হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে তোরণ নির্মাণ করা হইয়াছে। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভোজনের মণ্ডপে নিরন্তর দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দ শুনা যাইতেছে। দীন দুঃখীদের পরিতোষপূর্বক খাওয়ানো হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে অকাতরে দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আনন্দোৎসবের কারণ নিরানন্দ দূর করা। নাটোরের মহারাণী রাণী ভবানীর কোন পুত্রসন্তান নাই। পুত্রই পিণ্ড দান করিয়া পিতৃপুরুষদের পুং নামক নরক হইতে উদ্ধার করে। রাণীর বিরাট জমিদারি, কোন উত্তরাধিকারী নাই। পুত্রহীনের দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। পুত্রবানেরও দুঃখ আছে, কারণ দেখা

যায় যাহারা দরিদ্র, সন্তান-সন্ততিদের অন্নবস্ত্র যোগাড় করিতে পারে না, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না তাহাদেরও দুঃখ কম নয়। স্থানবিশেষে পুত্র থাকা সুখের এবং স্থান বিশেষে দুঃখের, সুতরাং পুত্র থাকা সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে। রাণীর পক্ষে পুত্রের অভাব অত্যন্ত দুঃখের কারণ ছিল। উত্তরাধিকারী না থাকিলে জমিদারি ছারেখারে যাইবে। তাই তিনি স্থির করিয়াছেন, উপযুক্ত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করিবেন। বংশ রক্ষা পাইলে জমিদারিও রক্ষা পাইবে। পোষ্য গ্রহণ করিতে হইলে স্বজাতি হইতে নেওয়াই ভাল, জ্ঞাতি হইলে উত্তম। রাণী ভবানীর পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয়েরই জমিদারি আছে। শ্বশুরকুলের রাজা উপাধি। রাণী নিজে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, উদারস্বভাবা, ধর্মপরায়ণা, তেজস্বী। দেশের দুর্দিনে বিশ্বাসঘাতকের দল যখন নবাবের বিরুদ্ধে ধূর্ত বিদেশীর সঙ্গে অন্যায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তখন একমাত্র তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। খাল কেটে কুমীর আনার বিপদ সম্বন্ধে তাহাদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সৎকার্যে তিনি অজস্র দান করেন। পুণ্যতীর্থ কাশীক্ষেত্রে তিনি তিন শত পঁয়ষট্টি খানি বাড়ী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া বহু গরীবের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তাহা ব্যতীত শিক্ষা, দীক্ষা এবং অন্যান্য সেবাকার্যে বিপুল অর্থ দান করিয়া দেশের এবং দশের উপকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়াছে। পোষ্য মনোনীত করিবার জন্য সুলক্ষণ-যুক্ত বহু ব্রাহ্মণ সন্তান আনা হইয়াছে। দয়ারাম খুবই সুদক্ষ দেওয়ান। তাঁহার পরিচালনায় জমিদারি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোক-ব্যবহারে তিনি যেমন কুশল, লোকচরিত্র নির্ণয়ে তেমন অদ্বিতীয়। সমবেত ব্রাহ্মণ-সন্তানদের প্রত্যেকের নাম-ধাম, চালচলন, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সব খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে সুলক্ষণযুক্ত এক বালককে উপযুক্ত মনে করিয়া রাণীর নিকট লইয়া গেলেন। উক্ত বালকের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকেরা ভোজন করিবার জন্য ডাক পড়িলে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কিন্তু বালকটি কিছুতেই গেল না। না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সাহসের সহিত বলিল যে জুতা পরাইয়া দেওয়ার লোক নাই। জুতা না পরিয়া সে যাইবে না। আর নিজ হাতে জুতা পরা অসম্মানজনক। বালকের আভিজাত্য বোধ দেখিয়া দেওয়ান দয়ারাম অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া নিজেই বালকের পায়ে জুতা পরাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কোলে নিয়া রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাণীও বালকের ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন এবং দেওয়ানের মনোনয়ন সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলেন। এই বালকই ভবিষ্যতে আভিজাত্য রক্ষা করিয়া

চলিবে, সুষ্ঠুভাবে জমিদারি পরিচালনা করিবে, বহু লোকের আশ্রয়দাতা হইবে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল। বালককে বিধিপূর্বক পোষ্য গ্রহণ করা হইল। নাটোর রাজ-দরবারের জাঁক-জমক এইভাবে শেষ হইল।

পুত্রহীনা রাণী ভবানী পুত্র পাইয়া আশায় বুক বাঁধিলেন। তখন খেয়ালী নবাবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার জমিদারির উপর পড়িয়াছে। সুযোগ পাইলে উহা কাড়িয়া লইয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। রাণী যেমন বুদ্ধিমতী তেমন সতর্ক। পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার ভার নিজ হাতে নিলেন যাতে পুত্র জমিদারি রক্ষা বিষয়ে খুব দৃঢ়তা দেখাইতে পারে এবং শক্তিশালী রাজারূপে পরিগণিত হইয়া দেশের এবং দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। রাণীর মনে আর একটা প্রবল বাসনা ছিল—পুত্র উপযুক্ত হইয়া যখন জমিদারি রক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিবে তখন তিনি পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে গিয়া বাস করিবেন এবং বাকী জীবন ধর্মে-কর্মে, জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিবেন। পুত্রের মন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় আশঙ্কা করিয়া তিনি উচ্চ বংশোদ্ভব এক অপরূপ সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিলেন।

এই পোষ্যপুত্র আর কেহ নন। তিনিই প্রবন্ধোক্ত রাজা রামকৃষ্ণ। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত আটগ্রামের অধিবাসী হরিহর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। রাণী-ভবানীর বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। মায়ের নিকট যথাযথ শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি (রামকৃষ্ণ) যথাসময়ে নাটোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাণী-ভবানীর নিকট তিনি যে শুধু জমিদারি সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজীবন যাপন করিবার উৎসাহও পাইয়াছেন। রাণীর প্রভাব যে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অন্তরে অন্তরে ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিলেন। শরীর, মন ও বুদ্ধির পরিণতিতে ভাবী জীবনের আভাস স্পষ্ট হইয়া আসিল। শুভ সংস্কার স্ফুরণোন্মুখ হইল, তাঁহার চিন্তা এবং কার্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় ভগবান যাঁহাকে খুব আপন মনে করেন তাঁহাকে অনেক সময় রাজ্যসুখ দেন না। দিলেও তাহা কণ্টকময় করিয়া তুলেন। সর্ব বিষয়ের বাসনা নষ্ট করিয়া, তপস্যার আগুনে দগ্ধ করিয়া নিকটে নিয়া আসেন। মধুর ভক্তিরসে ডুবাইয়া পরমার্থ লাভে সাহায্য করেন। বিশ্বজননী তাঁহার সম্মুখে এমন একটা আদর্শ স্থাপন করেন যাহার জন্য তিনি রাজ্যসুখ তুচ্ছ মনে করিতে পারেন। সব ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভের জন্যও ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন। ঘটনাও তাহাই

ঘটিল। এত বিরাট জমিদারি, মান, সম্মান রাজা রামকৃষ্ণের নিকট তুচ্ছ মনে হইল। বিষয়াদি ভগবৎ পথের প্রতিবন্ধক। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হইয়াছে। ভগবান লাভই যে জীবনের উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়া কোন বন্ধনের মধ্যে পড়িতে রাজী নহেন। শিকল শিকলই, শিকল হিসাবে লোহা আর সোনার পার্থক্য নাই, উভয়ই বন্ধন। এই সব বুঝিয়া তিনি ক্রমশঃ মনকে গুটাইয়া ইষ্ট পদে নিযুক্ত রাখিলেন। মা কালী তাঁহার ইষ্ট। শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট থাকিয়া প্রায়ই মার নিকট আবেদন জানাইতেন 'আমার মন যদি যায় ভুলে বালির শয্যায়, কালীর নাম দিও কর্ণমূলে'। মায়ের পূজা এবং ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। যেমন সাধন তেমন সিদ্ধি। যিনি যে মতে সাধন করেন তিনি সেই মতের শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া সহজে ফল লাভ করেন। রাজা রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্রমতে সাধনা করিবার জন্য নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে চারিদিকে চারিটি মৃত মানুষ, বানর, শৃগাল, নেউলের মুণ্ড এবং মধ্যখানে একটি সর্পমুণ্ড পুঁতিয়া বেদী নির্মাণ করিয়া তার উপর পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিলেন এবং সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। শক্তি সাধনার বিস্তারকল্পে তিনি জমিদারির একটা বড় অংশ ভবানীপুর পীঠে দেবীর সেবার জন্য দান করিলেন। উক্ত দেবী অপর্ণারূপে পূজিত হন। শক্তিআগমে উহার বর্ণনা আছে। উক্ত দেবীর স্থান প্রসিদ্ধ পীঠরূপে পরিণত হইয়াছে।

রাজা রামকৃষ্ণের সাধনা চলিতেছে। একদিন অমাবস্যার গভীর রাত্রে সাধনায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তিনি (রামকৃষ্ণ) এখনও কেন সংসারে আবদ্ধ হইয়া আছেন তাহার জন্য অনুযোগ করিলেন। সন্ন্যাসী কে, কোথায় থাকেন, কেন তাঁহাকে সাবধান করিলেন তাহার রহস্য কিছুই ভেদ করিতে পারিলেন না। তবে সাবধান বাণীর একটা ফল ফলিল। এই ঘটনার পর রাজা রামকৃষ্ণের সংসারে আসক্তি অনেক কমিয়া আসিল। পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় মাতৃনামে ডুবিয়া থাকিবার জন্য মনকে দৃঢ় করিলেন, এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে নবাব সুযোগ বুঝিয়া অন্যায়ভাবে তাঁহার জমিদারির অনেকখানি কাড়িয়া লইলেন। এই সময়ে আর এক নূতন বিপদ ঘটিল। পূর্বে কোন অসহায় বন্ধুকে তিনি বিপদের সময় সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়াছিলন। এখন সুময় বুঝিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করিলেন। স্বার্থপরতার মধ্যে বন্ধুত্বের স্থান নাই। ইহাতে উদার আহ্বান এবং উপকারীর উপকার স্বীকৃতি মিলে না, কৃতজ্ঞতা কৃতঘ্নতার রূপ নেয়। অনেক-খানি জমিদারি খোয়াইয়া রাজা রামকৃষ্ণ উদার মনোভাব পোষণের প্রায়শ্চিত্ত

করিলেন। এত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি ধৈর্য হারাইলেন না। ক্ষয় ক্ষতি সত্ত্বেও মনকে মায়ের সাধনায় লিপ্ত রাখিলেন।

রাজা রামকৃষ্ণের মন এত কোমল ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিত তিনি কিছুতেই 'না' বলিতে পারিতেন না। নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। একবার কোন ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অর্থসাহায্য দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন, এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বাঁচাইলেন। রাজা রামকৃষ্ণ সংসারে আসক্ত হইয়া পড়েন আশঙ্কা করিয়া পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী আবার একদিন তাঁহার নিকট সংক্ষেপে সাবধান বাণী প্রেরণ করিলেন। সাধকজীবনে এরূপ ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটিতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক সনাতন গোস্বামীর নিকট তাঁহার আপন ভাই রূপ গোস্বামী অনুরূপ সংক্ষেপে সাবধান বাণী পাঠাইয়া তাঁহাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং লীলা সহচর। এই ক্ষেত্রেও উক্ত সন্ন্যাসী রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগসূত্রে যে আবদ্ধ ছিলেন তাহা পরে প্রমাণিত হইবে। সন্ন্যাসী জানিলেও রাজা রামকৃষ্ণ তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

রাজা রামকৃষ্ণ যতই দেবীর সাধনায় ডুবিয়া গেলেন ততই তাঁহার মন বিষয় হইতে উঠিয়া গেল। দত্ত বস্তুর গ্রহণ চলে না। যে মন দেবীর পাদপদ্মে দিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া বিষয়ে দিতে পারেন না। ফলে জমিদারির অবস্থা ভয়ঙ্কর হইতে চলিল, জমিদারি তখন যায়-যায়। রাণী ভবানী তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বাকী জীবন ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবৎ ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিবেন সংকল্প করিয়া বারাণসীতে বাস করিতেছিলেন। দেশের এবং জমিদারির দুরবস্থা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। একেবারে দেউলিয়া হইয়া ভিখারীর মত পথে দাঁড়াইতে হইবে আশঙ্কা করিয়া রাণী অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বিপদ হইতে সকলকে মুক্ত করিলেন। পুত্র রামকৃষ্ণকে সংসারে অধিকতর মনোযোগ দিবার উপদেশ দিয়া পুনরায় শান্তিতে বাস করিবার জন্য বারাণসী ফিরিলেন। কিন্তু রাণীর উপদেশে বিশেষ কিছু কাজ হইল না। রাজা রামকৃষ্ণ সাধনভজনে আনন্দ পাইয়াছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন, এখন আর ফিরিতে পারেন না। ভবানীপুর পীঠে পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া পূর্বে যেমন ধ্যান অভ্যাস করিতেছিলেন এখনও তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি দেবীর

দর্শন পাইলেন। তাহাতে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আরও বাড়িয়া গেল। অন্য এক উৎসবের রাত্রে উক্ত পীঠে দেবীপূজা উপলক্ষে শত শত ভক্ত ও দর্শকের ভিড় জমিয়াছে। হঠাৎ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া ডাকাতের দল পীঠে উপস্থিত হইয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। চারিদিকে ক্রন্দনরোল উঠিল। ভয়ে যে যেদিকে পারে পলাইবার চেষ্টা করিল। আর্ত ভক্তদের দুরবস্থা দেখিয়া দেবীর দয়া হইল। তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে উপস্থিত হইয়া ডাকাতদের তাড়া করিলেন। ডাকাতের দল পলাইয়া গেল, উপস্থিত ভক্ত ও দর্শনার্থীর বিপদ কমিয়া গেল। এই ঘটনার পর রাজা রামকৃষ্ণ দেবীর প্রিয় পুত্র বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিল। এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িল। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি দেবীর ধ্যান পূজায় অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা রামকৃষ্ণ কোন কার্য উপলক্ষে হাতীর পিঠে করিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা রামকৃষ্ণ হাতীর পিঠ হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরস্পর আলাপ আলোচনায় উভয়ের খুব আনন্দ হইল। কথা বলিতে বলিতে উক্ত সন্ন্যাসী হঠাৎ রাজা রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক বেটারী লাগিলে মানুষের যেমন হয় সেরূপ আলোড়ন হইল, এবং জন্মান্তরের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন ঐ সন্ন্যাসী তাঁহার অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার নাম শ্রীজী। বুদ্ধি রাজার বংশধর। বহুকাল পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়া মহাযোগী হইয়াছেন। পূর্বজন্মে তিনি এবং শ্রীজী একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। উভয়েই হরিদ্বারে কোন গুহায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছেন। অমরত্ব লাভ করিবার জন্য আরও কিছু তপস্যা বাকী ছিল। তাই উভয়ে দুই রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার তপস্যায় লিপ্ত হইয়াছেন। শ্রীজী তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া গুরুভাই রামকৃষ্ণকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছেন। পূর্বস্মৃতির আনন্দে রাজা রামকৃষ্ণের মন পূর্ণ হইল। চক্ষের নিমেষে সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর রাজা রামকৃষ্ণ জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইলেন। পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় দেবীর ধ্যানে মনকে লিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিলেন। মনকে সংসার হইতে গুটাইয়া নিলেন। ছেলেদের স্ত্রীর হেপাজতে রাখিয়া সংসার হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীর নিকট বিদায় নিলেন। দিনরাত মায়ের ধ্যানে কাটান। পূর্বে মাঝে মাঝে মা কালীর দর্শন পাইতেন, এখন নিরন্তর হৃদয়ে মা কালীকে দর্শন করিতে চান, কিন্তু একটা প্রতিবন্ধক দেখা

দিল, রাণী ভবানী বহু আশায় তাঁহাকে লালন-পালন শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া মানুষ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছেন। জমিদারি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া মাতার মনে কষ্ট দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া তাঁহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাতা ক্ষমা না করিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবে, সিদ্ধি সুদূর পরাহত থাকিবে। তখন মাতা রাণী ভবানী বারাণসীতে আছেন। রাজা রামকৃষ্ণ মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি নিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাণীমাতা ধর্ম্মপরায়ণা, ব্রাহ্মণ বিধবা পুত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সিদ্ধিলাভে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলেন না বরং প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এইভাবে সর্ব বাধা সরিয়া গেল। রাজা রামকৃষ্ণ গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। ১৭৯৫ সালে শুভদিনে যোগাসনে বসিয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। গুরুভাই শ্রীজীর সাহায্য কাজে লাগিল। পূর্ব-জন্মে গুরু শিষ্যদ্বয়কে দীক্ষা দিয়া যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইল। উভয় শিষ্যই পরম বস্তু লাভ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়া ধন্য হইলেন। ভগবান লাভই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।

॥ উনত্রিশ ॥

শর্ব্বানন্দ

যিনি কর্ম্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে জানেন এবং মানেন তিনি সুনিপুণ কর্ম্মী। কর্ম্মের কৌশল বুঝেন। তিনি যোগী, তাঁহার জীবন অসাধারণ সরল, সংযত, সুন্দর, চিন্তা বিশুদ্ধ এবং উন্নত। সত্যের কবাট তাঁহার নিকট উন্মুক্ত, তিনি সত্যসেবী, প্রেমিক। প্রেম দ্বারা ভগবানকে বাঁধেন। প্রেমের স্বভাব স্বতন্ত্র। গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়। যথার্থ প্রেম কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া যায় না বরং বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম, তিনি আলোর রূপ এবং অন্ধকারের মর্ম্ম বুঝেন, ভাঁটার নদীতে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনেন। প্রেম কখন কাহার মধ্যে কি ভাবে উদয় হইবে বলা যায় না।

পূর্বস্থলী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বাসুদেবে ভট্টাচার্য এই গ্রামের অধিবাসী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। সৎ, চরিত্রবান্, এবং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খুব সুনাম, তিনি শক্তির উপাসক। ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিয়া আনন্দ পান। নিত্য দেবীর পূজা করেন। একদিন রাত্রে তাঁহার ইষ্ট দেবীরূপে দর্শন দিয়া আদেশ

করেন, 'ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকট মেহের নামক সিদ্ধপীঠে তপস্যা কর, সিদ্ধিলাভ হইবে।' ইষ্টের আদেশে বাসুদেব ভট্টাচার্য সপরিবারে মেহেরে আসিয়া নিয়ত দেবীর জপ, ধ্যান এবং পূজায় রত থাকেন। বিশ্বাসী ভৃত্য পূর্ণানন্দও সঙ্গে ছিল। তাঁহার তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া স্থানীয় জমিদার জটাধর তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন এবং ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কিছু নিষ্কর জমি দান করেন। শিষ্যের উদারতায় অর্থের সংস্থান হওয়াতে গুরুকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাতৃসাধনায় ডুবিয়া গেলেন। তান্ত্রিক বিধিমত কয়েক বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি বিশ্বাসী ভৃত্য পূর্ণানন্দকে লইয়া প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে উপস্থিত হইলেন। কামাখ্যা প্রসিদ্ধ একান্ন পীঠের অন্যতম। হিন্দুতীর্থ শক্তি সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। বহু সাধক বহুকাল যাবৎ কঠোর সাধনায় রত থাকিয়া শক্তি পীঠের পীঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কয়েক বৎসর তপস্যার পর একদিন তিনি দৈববাণী শুনিতে পান 'পরজন্মে তোমার তপস্যা পূর্ণ হইবে। তুমি পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। শর্বানন্দ নামে পরিচিত হইবে। মেহেরে মাতঙ্গ মুনি শক্তির আরাধনা করিয়াছেন। তুমি সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধপীঠের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবে'। দৈবাদেশ শুনিবার কিছুকাল পরে বাসুদেব ভট্টাচার্যের দেহরক্ষা হইল। বিশ্বাসী ভৃত্য পূর্ণানন্দ দৈবাদেশের কথা জানিত। প্রভুর রক্ষিত বীজাক্ষর যুক্ত কবচ লইয়া মেহেরে ফিরিয়া আসিল এবং অতি যত্নে উক্ত কবচ রক্ষা করিল।

প্রবন্ধোক্ত শর্বানন্দ উক্ত বাসুদেব ভট্টাচার্যের পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসাল ঠিক ঠিক জানা যায় না। কাহারও মতে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সার জন উড্রপ বলেন, শর্বানন্দ ১৪২৬ সালে পৌষ সংক্রান্তির দিন অমাবস্যা রাত্রে মেহেরে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। শর্বানন্দের পুত্র শিবনাথ রচিত গ্রন্থে দেখা যায় যে শর্বানন্দ পূর্ব পূর্ব সাতজন্মে নীলাচল, বিন্ধ্যগিরি, সিন্ধুশৈল, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাসাগর, বারাণসী এবং কামাখ্যা প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে শক্তি সাধনা করিয়া শেষ জন্মে মেহেরে সিদ্ধিলাভ করেন এবং দেবীর দর্শন পান। তাঁহার সিদ্ধিলাভের পর মাতঙ্গ মুনির তপস্যা ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে এবং শক্তিপীঠ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জানা যায়, ছোটবেলায় বল্লভা দেবীর সঙ্গে শর্বানন্দের বিবাহ হয়। তিনি অত্যন্ত রূপবান ছিলেন, রূপ উছলিয়া পড়িত। লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়া

থাকিত। কিন্তু সংসারে শুধু রূপের বিশেষ মূল্য নাই। রূপের সঙ্গে গুণের সমাবেশ হইলে তবে লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। যদিও তিনি অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান তথাপি বংশের ধারা পান নাই। তিনি ধর্মপরায়ণ, সরল কিন্তু বিদ্যার সেবা করেন নাই। মনে হয় মা সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার প্রতি ছিল না এবং তিনি নিজেও সরস্বতীর আরাধনা করেন নাই। বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে মূর্খ সন্তান বড় বিসদৃশ দেখায়। বিদ্বৎ সমাজেও মূর্খের উপস্থিতি অপ্রিয় ব্যাপার সৃষ্টি করে। ঘটনাও সেরূপ দাঁড়াইল। একদিন জমিদারের বিদ্বৎসভায় শর্বানন্দ বসিয়া আছেন। স্থানীয় জমিদার কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে সেই দিন কি তিথি জিজ্ঞাসা করিলেন। শর্বানন্দ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া জবাব দিলেন যে ঐ দিন পূর্ণিমা তিথি। কিন্তু ঐ দিন প্রকৃতপক্ষে অমাবস্যা ছিল। জমিদার, সমবেত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী এবং অন্যান্য সকলে তাহা জানিতেন। শর্বানন্দের কথা শুনিয়া ‘পণ্ডিতের ঘরে একটা আস্ত গোমূর্খ জন্মিয়াছে’ বলিয়া সকলে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। একের বিদ্রূপ অন্যের মর্মশেল। শর্বানন্দের অভিমানে ভীষণ ঘা পড়িল। অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। সম্ভবতঃ প্রকাশ্য সভায় অপমানিত হওয়ার কথা বাড়ীতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী বল্লভাদেবীর নিকট পৌঁছিয়াছে। মূর্খ স্বামীর স্ত্রী হইয়া জীবন যাপন দুঃসহ। অন্যান্য স্ত্রীলোকদের নিকট হেয় হইয়া থাকিতে হয়। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে পতি পরম গুরু, স্বামীর অপমানে স্ত্রীর অপমান, স্বামীনিন্দা শুনিতে নাই। স্বামীনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বল্লভাদেবীর মতিভ্রম ঘটিল, তিনি নিজ স্বামীর উপরেই প্রতিশোধ নিলেন। স্বামী বাড়ী ফিরিলে তাঁহার উপর একচোট নিলেন। স্বামীভক্তি কোথায় উবিয়া গেল। মুখরা স্ত্রীর মত স্বামীকে ‘মূর্খ’ বলিয়া যথেচ্ছ তিরস্কার করিলেন। মানুষ বাহিরে বিদ্রূপ, অপমান সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিজ গৃহে গৃহিণীর অবহেলা সহ্য করিতে পারে না। স্ত্রীর তিরস্কার এবং নির্যাতন শর্বানন্দকে অত্যন্ত মর্মাহত করিল। তাঁহাকে বাঁচিতে হইলে পৌরুষ দেখাইতে হইবে। জড়পিণ্ডের মত থাকিলে চলিবে না। মূর্খ হইয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র, যে কোন উপায়ে বিদ্যার্জন করিতে হইবে। পৌরুষ দেখাইতে পারিলে তবে সমাজে স্থান হইবে, নিজ গৃহিণীর অপমান সহ্য করিতে হইবে না। কিন্তু বিদ্যার্জনের সময় চলিয়া গিয়াছে। মার কৃপা থাকিলে বিলম্বেও বিদ্যার্জন করা যায়, অদ্বিতীয় কবি কালিদাসও আকাট মূর্খ ছিলেন। মা সরস্বতীর কৃপায় বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। একরোখা শর্বানন্দের যেমন সংকল্প তেমন কাজ। যে সময়ের কথা

বলিতেছি সে সময়ে কাগজের প্রচলন হয় নাই। লোকে তালপাতাতেই লিখিত। লেখাপড়া শিখিবার জন্ম তৎপর হইয়া শর্বানন্দ তালপাতা সংগ্রহের জন্ম গাছে উঠিয়া পাতা কাটিতেছেন এমন সময় একটা বিষধর সর্পের সম্মুখীন হইলেন; উহা ফণা তুলিয়া আছে। সাধারণ লোক হইলে ভয়ে গাছ হইতে লাফাইয়া হয়ত প্রাণ হারাইত। কিন্তু শর্বানন্দ দুর্জয় সাহসী এবং ভয়ানক একরোখা। মূর্খ হইলেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অবিলম্বে সাপের মাথাটি ধরিয়া ধারাল তালপাতায় ঘষিতে লাগিলেন। সাপটি লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল। তাহাতেও ধৈর্য না হারাইয়া তিনি প্রথমে সাপের মাথাটি দেহ হইতে পৃথক করিয়া বাকী অংশটি ধীরে ধীরে খুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। দেহ রক্তাক্ত হইল। তালপাতা সংগ্রহ করিয়া তিনি আস্তে আস্তে নীচে নামিলেন। এমন সময়ে সামনে এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরার্থেই সন্ন্যাসীর জীবন। গভীর উদ্দেশ্য নিয়া তিনি আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন শর্বানন্দ শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে বহু তপস্যা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার শেষ জন্ম, তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া বিশ্বজননীর কৃপায় অমরত্ব লাভ করিবেন, এবং শক্তিপীঠের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া দেবীর ইচ্ছায় জনকল্যাণ সাধন করিবেন। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া শর্বানন্দকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। প্রকাশ্য সভায় জমিদার কর্তৃক অপমান, গৃহে গৃহিণীর গঞ্জনা শর্বানন্দের মনকে তিক্ত বিরক্ত করিয়াছে। তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। উহার প্রতিকারার্থ বর চাহিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে তুচ্ছ বিষয়ে মন না দিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। কথাটা শর্বানন্দের মনে রেখাপাত করিল, তবে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার কিছু সংশয় রহিল বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসী মনস্তত্ত্ববিদ্, শর্বানন্দের সংশয় দূর করিবার জন্ম মৃত সাপটিকে বাঁচাইয়া দিলেন। পুনর্জীবন লাভ করিয়া সর্পটি চলিয়া গেল, শর্বানন্দের সন্দেহ কাটিয়া গেল। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মিল, সন্ন্যাসী অতঃপর তাঁহাকে নিকটে ডাকাতিয়া নদীর তীরে গিয়া স্নান সারিয়া নিতে আদেশ দিলেন। স্নানান্তে তাঁহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং কিভাবে অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাত্রে শবসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয় তাহার উপদেশ দিলেন। সাধনার রহস্য প্রয়োজন, উপায় এবং ফল সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে তাহাদের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য পূর্ণানন্দ সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে, এবং সাহায্য করিবে। যথাযথ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসী নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তাঁহাকে আর দেখা গেল না। শর্বানন্দ পুরাতন ভৃত্য পূর্ণানন্দের খোঁজে চলিলেন।

গৃহিণী কর্তৃক অপমানিত হইয়া উদ্ধত যুবক শর্বানন্দ কোথায় চলিয়া গিয়াছে বাড়ীতে কেহ জানে না। মূর্খ হইলেও ঘরের ছেলে। সকলেই চিন্তিত হইলেন। চারিদিকে খোঁজ আরম্ভ হইল। তাঁহার নিরুদ্দেশে সবচেয়ে মর্মাহত হইল পুরানো ভৃত্য পূর্ণানন্দ। সে তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল। সে জানিত তাহার পূর্ব প্রভু বাসুদেব ভট্টাচার্য পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইবে। তাঁহার গচ্ছিত রক্ষাকবচ উপযুক্ত বংশধরকে ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গচ্ছিত ধন ফেরত দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার (পূর্ণানন্দের) দায়িত্ব শেষ হইবে না। শর্বানন্দের খোঁজে বাহির হইয়া তাঁহাকে জঙ্গলের মধ্যে পাইল। শর্বানন্দ তখন পূর্ণানন্দের নিকট সন্ন্যাসীর দীক্ষা, শবসাধনার উপদেশ প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন এবং পূর্ণানন্দ পূর্ব মনিবের গচ্ছিত কবচ ফিরাইয়া দিল।

সময় প্রতিকূল হইলে যেমন যাবতীয় বিষয়ে বিপর্যয় ঘটে, অনুকূল হইলে তেমন সব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হয়। সময় এখন শর্বানন্দের অনুকূলে। পূর্ণানন্দ শবসাধনার প্রয়োজনীয় উপচারাদি যোগাড় করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। সব যোগাড় হইয়াছে। একটি মাত্র উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই এবং সেটাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এখনও শব যোগাড় হয় নাই। অথচ আজই অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে শর্বানন্দকে শবের বুকের উপর বসিয়া গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। সময় নাই। শবের জন্য দেরি করিলে চলিবে না। পূর্ণানন্দ জানে আত্মাহুতির এই উপযুক্ত সময়। মহান্ উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন গৌরবের। নিজে আত্মবিসর্জন দিয়া মনিবের সাধনার সাহায্যে অগ্রসর হইল। শর্বানন্দ মানুষ, সাধক, পুরানো বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্যের জীবন বিনিময়ে সিদ্ধি চান না। পূর্ণানন্দের বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে রাজী হইলেন। এদিকে সময় চলিয়া যায়, পূর্ণানন্দ নিশ্বাস রোধ করিয়া অত্মাবিসর্জন দিবার সংকল্প করিল। তার পূর্বে শর্বানন্দকে দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিল যে সাধনকালে চারিদিকে ভীষণ বিভীষিকা দেখা যায়। তখন সাধক ভয় পাইয়া সাধনা হইতে বিরত হয়, কখনও কখনও ভয়ে সাধকের মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। বিভীষিকা ব্যতীত ভয়ের অন্য কারণও থাকে। নানা রকম প্রলোভন আসে। সুন্দরী রমণী, বিপুল সাম্রাজ্য এবং নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির আশায় সাধক প্রলুব্ধ হয়, ইহাতে

তাহার সিদ্ধি ব্যাহত হয়। বিভীষিকা এবং প্রলোভন হইতে সাবধান হইতে হইবে। আরও একটা বিষয়ে তাঁহাকে হুঁশিয়ার হইতে বলিয়াছিল। উপরি-উক্ত বিপদ কাটিয়া গেলে সিদ্ধি আসে। তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া যদি কোন বর দিতে চান তবে শর্বানন্দ যেন বলে 'পূর্ণানন্দ সব জানে আমি কিছুই জানি না'। এই উপদেশের মধ্যে পূর্ণানন্দের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ণানন্দ শ্বাস রোধ করিয়া আত্মাহুতি দিল। শবাসনে বসিয়া শর্বানন্দ সংগৃহীত উপচারাদি দিয়া ভক্তিভরে মায়ের পূজা শেষ করিয়া জপান্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। একে একে পূর্ণানন্দের সাবধান বাণী ফলিতে লাগিল। প্রথমে বিভীষিকা উপস্থিত হইল। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। শর্বানন্দের মনে হইল ভীষণ আকারের দৈত্য দানব তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইল। পূর্ণানন্দের সাবধান বাণী তাঁহার মনে আছে। তিনি জপ ধ্যান হইতে বিরত হইলেন না। সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন। হঠাৎ বিভীষিকার পট পরিবর্তন ঘটিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উল্কাপাত এবং ভীষণ বজ্রধ্বনি আরম্ভ হইল। তাঁহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভীষণ ঝড়ে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তবুও শর্বানন্দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল না, জপ ধ্যানে অটল রহিলেন। ইহার পর আবার দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিল। নানা প্রকার প্রলোভনের বস্তু একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি কিন্নরীর মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন। অপ্সরার অঙ্গভঙ্গী নৃত্য দেখিলেন। সাধারণ সাধক হইলে হয়ত প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তপস্যা ছাড়িয়া দিত কিন্তু শর্বানন্দ কিছুতেই টলিলেন না। পূর্বের ন্যায় শবাসনে বসিয়া জপ ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। তারপর আবার দৃশ্যপট বদলাইল। তাঁহার মনে হইল রাত্রি শেষ হইয়াছে। উষার কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। পাখীরা সুমিষ্ট স্বরে সূর্যদেবের আবাহন গীতি গাহিতেছে। ইহাতেও শর্বানন্দ টলিলেন না। স্থির চিত্তে দেবীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। আবার পট পরিবর্তন ঘটিল, প্রলোভন বিভীষিকার রূপ ধারণ করিল। পূর্ণানন্দের শব নাড়া দিয়া উঠিল। সাধককে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। শর্বানন্দ তাহাতেও ভয় পাইলেন না। বিভীষিকা এবং প্রলোভনাদি রূপ নানা প্রকার পরীক্ষার মধ্য দিয়া সন্তানের ভক্তিনিষ্ঠার প্রমাণ পাইয়া অবশেষে বিশ্বজননী মা কালী ভক্তসন্তান শর্বানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলেন। শর্বানন্দ মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, 'ঐ সব পূর্ণানন্দ জানে। আমি কিছুই জানি না'। সাধকের জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সিদ্ধ হইল। দেবীর

কৃপায় মাতঙ্গ মুনির তপস্যাক্ষেত্র শক্তিপীঠে পরিণত হইল, হৃতগৌরব ফিরিয়া আসিল। পূর্ণানন্দ পুনর্জীবন লাভ করিল। প্রভুভক্তির ফল ফলিল। আত্মাহুতির পুরস্কার মিলিল, দেবীর দর্শন এবং মুক্তি সবই হইল। কিছুই অপূর্ণ রহিল না। ইহা ব্যতীত আরও অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। শর্বানন্দ জমিদারের বাড়ীতে বিদ্বান্‌দের সভায় অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'গণ্ড মূর্খ' বলিয়া অপমানিত করিয়াছিলেন। দেবী ভক্তের মুখের বাণী মিথ্যা হইতে দেন না। তাঁহার ইচ্ছায় অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাত্রিতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল। মেহেরের অধিবাসীরা, বিশেষতঃ অপমানকারী জমিদার, নির্মল আকাশে পূর্ণ চাঁদের আলো দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সিদ্ধ শক্তিপীঠ মহাতীর্থে পরিণত হইল। ইহার পর পীঠের মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এখনও মেহের কালীবাড়ীতে নিত্য শত শত ভক্ত আগমন করিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ তিথিতে সহস্র সহস্র লোকের ভিড় হয়, রীতিমত মেলা বসে। দেবীর পীঠস্থান মাতৃরবে মুখরিত হইয়া উঠে। তপস্যার প্রভাব লুপ্ত হইবার নয়। উহা ভক্তহৃদয়ে জাগরূক থাকে।

এই ঘটনার পর শর্বানন্দ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকৃতি পাইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও খ্যাতি ছড়াইল। দেবীর কৃপায় যে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূর্খ পণ্ডিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। জমিদার অনুতপ্ত হইয়া পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখন হইতে শর্বানন্দকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। একবার জমিদার শর্বানন্দকে একখানা মূল্যবান শাল উপহার দেন। বাড়ী ফিরিবার পথে একজন বেশ্যা তাঁহার নিকট শালখানি চাহিলেন। শর্বানন্দ তান্ত্রিক, কৌল, তাঁহার নিকট সকল স্ত্রীলোকই দেবীর রূপ। তিনি অবিলম্বে শালখানি প্রার্থিতকে দিলেন। দাতার মূল্যবান শাল কিভাবে হাতছাড়া হইয়াছে গোপনে খবর পাইয়া জমিদার শাল কোথায় জিজ্ঞাস করিলেন। কিছুমাত্র না ভাবিয়া শর্বানন্দ বলিলেন, উহা তাঁহার স্ত্রী বল্লভাদেবীর নিকট আছে। শালখানি আনিবার জন্য জমিদার অবিলম্বে শর্বানন্দের ভাগিনা শরানন্দকে তাহার মামীর নিকট পাঠাইলেন। ঐ সময়ে বল্লভাদেবী ঘরে ছিলেন না, কিন্তু একখানি উজ্জ্বল হাত শালখানি শরানন্দের নিকট ছুঁড়িয়া দিল। শরানন্দ শালখানি জমিদারকে দেখাইলেন এবং কি করিয়া উহা তাঁহার হাতে আসিল তাহা বলিলেন। শালখানি না পাইলে শর্বানন্দ সম্বন্ধে জমিদারের বিরূপ সন্দেহ হইত, কিন্তু উহা পাওয়াতে তাঁহার মুখ রক্ষা হইল। দেবী কখনও ভক্ত সন্তানের বাণী মিথ্যা হইতে দেন না। ইহাতে তাঁহার প্রতি জমিদারের শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল।

এই ঘটনার পর শর্বানন্দ মেহের ছাড়িয়া পূর্ণানন্দকে সঙ্গে নিয়া বারাণসীর দিকে রওনা হইলেন। পথে যশোহরে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আগমবাগীশের নিকট বাস করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে জনৈক দিগ্‌গজ পণ্ডিত যশোহর রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রাজপণ্ডিতকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন আগমবাগীশ বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে তাঁহার শারীরিক সার্মথ্য নাই বলিয়া তিনি শর্বানন্দকে তাঁহার হইয়া তর্কযুদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত পণ্ডিত স্বপ্নে জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ শর্বানন্দের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিতে হইবে। তখন তিনি 'য পলায়তি স জীবতি' পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থান ত্যাগ করিলে শর্বানন্দের কপালে বিনা তর্কে জয়মাল্য জুটিল, কিন্তু তাঁহাকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। শর্বানন্দ আগমবাগীশের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শর্বানন্দের গুরু। আগমবাগীশ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। গুরুদক্ষিণার একমাত্র শর্ত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে, তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া শর্বানন্দ আগমবাগীশের নিকট ঋণী। ঋণ শোধের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া তাঁহাকে গুরুর শর্ত স্বীকার করিতে হইল। শর্বানন্দ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। কিছুকাল শ্বশুরের সঙ্গে থাকিয়া তন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি সন্তানের জনক হইলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন যশোহর এবং কালনায় বাস করেন। ছেলে উপযুক্ত হইলে তিনি পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী বারাণসী আসিলেন। বারাণসীর পণ্ডিতমণ্ডলী শর্বানন্দের তান্ত্রিক আচার এবং পূজাপদ্ধতি পছন্দ করিতেন না কিন্তু তিনি যোগী এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতেন না, দূরে দূরে থাকিতেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি অবধূত মহারাজ নামে পরিচিত হইলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় নাই।

।। ত্রিশ ।।

লালাবাবু

বীজ পুঁতিলে গাছ হয়, ফুল ফল হয় ইহা সকলে জানে কিন্তু ভাল, এবং সুমিষ্ট ফল পাইতে হইলে তাহার জন্য যত্ন নিতে হয়। বীজ যেমন পুষ্ট হওয়া দরকার জমিও তেমন উর্বর হওয়া দরকার। তবে অনুকূল জলহাওয়ায় সুফলের আশা করা যায়। মানবজীবন মনোরম ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা ও ভক্তির জল সিঞ্চন করিলে শীঘ্র অঙ্কুরোদ্গম হয়। গুরু কৃপারূপ মলয় পবন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে শেষে মোক্ষফল মিলে। ভগবান লাভেই মোক্ষ। ইহাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, পবিত্র জীবন যাপন পন্থা।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতের বড়লাট। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার দেওয়ান। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি মহকুমার জমিদার। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা তাঁহার কর্মস্থল। দক্ষ এবং বিশ্বাসী দেওয়ান হিসাবে যেমন তাঁহার সুনাম আছে বড় জমিদার হিসাবেও তেমন প্রতিপত্তি আছে। তাঁহার সহোদর রাধাগোবিন্দ সিংহ অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার সম্পত্তি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পুত্র প্রাণগোবিন্দ সিংহকে উইল করিয়া দিয়া যান। প্রবন্ধোক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ (ওরফে, লালাবাবু) প্রাণগোবিন্দ সিংহের পুত্র এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। তাঁহার জন্ম সাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও জীবনী-লেখকগণ ১৭৭৫ সাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি বংশের দুলাল এবং বিরাট জমিদারির উত্তরাধিকারী। ঠাকুরদাদা আদর করিয়া 'লালা' ডাকিতেন। 'লালা'ই পরে লালাবাবু নামে পরিচিত হন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সত্যনিষ্ঠা, ভগবৎভক্তি, দয়া, নিঃস্বার্থ সেবা, পরদুঃখে কাতরতা প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি তাঁহার মধ্যে বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি খুব প্রখর হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী শিক্ষা করেন। সংস্কৃতের উপর তাঁহার বিশেষ টান ছিল। ভাগবত তাঁহার প্রিয় শাস্ত্র।

প্রাচুর্য, আরামের হইলেও সব সময়ে মনের শান্তি আনিতে পারে না। কৃষ্ণ-গোবিন্দ সিংহের জীবন প্রাচুর্যের মধ্যে বেশ ভাল ভাবে কাটিতেছে। এই সময়ে

এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহা তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়া দিল। বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী এবং বংশের আদরের তুলালকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচকিত করিয়া তুলিল।

কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার পিতা প্রাণগোবিন্দ সিংহের নিকট সাহায্যের আশায় কয়েকবার দেখা করিতে আসেন। প্রতিবারই দারোয়ান তাঁহাকে হাঁকাইয়া দেন। কিছুতেই জমিদারের সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘটিয়া উঠে না। একদিন ঘটনাচক্রে কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহের নিকট তিনি সকল দুঃখ নিবেদন করিবার সুযোগ পান। ব্রাহ্মণের দুরবস্থা জানিয়া তাঁহাকে এক হাজার টাকা সাহায্য দিবার জন্য কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ কর্মচারীকে হুকুম দেন। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকারী মাত্র, এখনও মালিক হন নাই। মালিকের অনুমতি ব্যতীত কর্মচারীর এক কপর্দকও কাহাকে দিবার হুকুম নাই। কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহের পিতা প্রাণগোবিন্দ সিংহই প্রকৃত মালিক, তিনি পাকা বিষয়ী। তাঁহাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। মান, যশ ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। খরচের ব্যাপারে হুঁশিয়ার না থাকিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যখন তখন যে কোন প্রার্থীকে তদন্ত না করিয়া সাহায্য দিলে অনেকে তাঁহার উদারতার সুযোগ নিয়া ঠকাইবে। সুতরাং জমিদারি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। কর্মচারীও নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তিনি অবিলম্বে বিষয়টি প্রকৃত মালিকের কানে তুলিলেন। প্রাণগোবিন্দ সিংহ পিতা হিসাবে পুত্রের সম্মান রক্ষার্থে উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এক হাজার টাকা সাহায্য দিবার জন্য কর্মচারীকে হুকুম দেন এবং পাকা বিষয়ী হিসাবে কর্মচারীর মারফতে পুত্রকে সাবধান করিয়া দেন যেন পুত্র ভবিষ্যতে কাহাকেও যখন তখন দান করিবার জন্য কর্মচারীকে অনুরূপ হুকুম না দেয়। হয়ত সাবধানবাণীর উদ্দেশ্য ছিল পুত্র জমিদারী চালইবার মত এখনও উপযুক্ত হয় নাই অথবা এখনও পিতা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বর্তমান, তিনিই জমিদারীর মালিক। হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁহারই, পুত্রের নয়। পিতার সাবধান বাণীতে পুত্রের চোখ খুলিল। কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহের মনে ভীষণ আঘাত লাগিল। তিনি নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ধনকুবেরের উত্তরাধিকারী হইয়াও সৎ বিষয়ে এক কপর্দক ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহার নাই। অভিমানী পুত্র দৃঢ় সংকল্প করিলেন জমিদারি হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করিবেন না। অর্থ উপার্জন করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবেন। তিনি ভয়ানক একরোখা ছিলেন। যেমন সংকল্প তেমন কাজ। বিরাট জমিদারির

মায়া ত্যাগ করিয়া প্রাসাদতুল্য বাড়ী ঘর ছাড়িলেন। পিতা মাতা কত চোখের জল ফেলিলেন, সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য পুত্রকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু সবই বৃথা গেল, পুত্রকে টলাইতে পারিলেন না।

গৃহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ বর্ধমান আসিলেন এবং কলেক্টরীতে সেরেস্তাদারের কর্ম স্বীকার করিলেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভাষাবিদ্ সুতরাং কর্মে কোন প্রকার অসুবিধা হইল না এবং উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে কাত্যায়নী নাম্নী এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কাত্যায়নী যথাকালে স্বামীকে এক সুলক্ষণযুক্ত সুন্দর সন্তান উপহার দেন। পুত্রের নাম নারায়ণচন্দ্র সিংহ। গভর্নমেণ্ট উড়িষ্যাকে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। নিলে কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষতাগুণে প্রধান দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি উড়িষ্যার মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হন। একবার কোন কারণবশতঃ উড়িষ্যার মহারাজ কর দিতে পারেন নাই। তখন পুরীর অফিসার মহারাজের জমিদারী নিলামে চড়ান। জমিদারীর আয়ে পুরী মন্দিরের বিগ্রহ সেবাদি চলিত। জমিদারী নিলামে চড়ার ফলে বিগ্রহ সেবার অসুবিধা হইতে লাগিল। খবর পাইয়া কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ নিজের দায়িত্বে নিলাম রদ করিয়া দিলেন। অশেষ উদারতার জন্য তিনি উড়িষ্যার মহারাজের অতিশয় প্রিয় সুহৃদ হইলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহারাজ নিজ জমিদারীর একটা অংশ কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহকে দান করিলেন। দানের অংশটি একটা বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে কারণ প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর পরে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা বিগ্রহের কলেবর পরিবর্তন হয়, তাহার জন্য যে নিম গাছের প্রয়োজন হয়, তাহা উক্ত জমিদারী হইতে আনা হয়।

এই সময়ে কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ তীর্থ উপলক্ষে বৃন্দাবন ধামে যান। তীর্থের পবিত্র আবহাওয়া, ভগবান লাভের জন্য বৈষ্ণব সাধুদের সর্বস্ব ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, ধ্যানাভ্যাস এবং ভক্তিভাব তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। বাকী জীবন ভগবৎ ধ্যানে কাটাইবার ইচ্ছা তাঁহার মধ্যে প্রবল হইল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয় না, অনেক প্রতিবন্ধক ঘটে; কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার সংকল্পে বাধা দিল। কর্মোপলক্ষে তাঁহাকে আবার উড়িষ্যায় ফিরিয়া যাইতে হইল। এই সময়ে এক মস্ত বিপর্যয় ঘটিল, পিতা প্রাণগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু সংবাদ আসিল। পুত্র গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে পিতা অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রিয় পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দকে অন্ততঃ একবার দেখিবার জন্য খুব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শেষ

ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহও পিতার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করেন নাই বলিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি সময়ে আসে না, অনেক দেরিতে আসে। যখন আসে তখন প্রতিকারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণগোবিন্দ যথা-সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য কৃত্যাদি শেষ করিলেন। কর্মস্থল উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া কখনও কলিকাতা কখনও বা কান্দিতে (মুর্শিদাবাদে) গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং জমিদারী দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ বনেদী বংশের সন্তান। পিতা, পিতামহের জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন এবং নিজেও দক্ষতাগুণে জমিদারী অর্জন করিয়াছেন। সুতরাং উহা পরিচালনা করিবার মত যথেষ্ট দক্ষতা তিনি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে জমিদারীর উন্নতিই হইতে লাগিল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা তাঁহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল। জমিদারের মান প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তাঁহাকে জাঁকজমকে থাকিতে হইত। তখনকার দিনে উন্নত যান-বাহনাদির প্রচলন হয় নাই, পাল্কীতে চড়িয়াই আভিজাত্য রক্ষা করিতে হইত। একদিন কর্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় এক গ্রামের মধ্য দিয়া আসিতে-ছিলেন। বৈকাল হইয়াছে, সূর্য ডুবিতে বেশী দেরি নাই। এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন এক ধোপার মেয়ে তাহার বাবাকে বলিতেছে 'বাবা, বেলা গেল, বাস্‌নায় কখন আগুন দেবে'। ধোপার বাড়ীতে কলাগাছের মাজা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে যে উনুন থাকে তাহাকে বাস্‌না বলে। গ্রাম্য মেয়ের কথা কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহের কানে যাওয়া মাত্র তাঁহার মধ্যে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে হইল সত্যই বাসনায় আগুন দিতে হইবে। প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র নিবিয়া যাইবে। সময় থাকিতে যদি বাসনায় আগুন দেওয়া না হয় তবে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বৃথা যাইবে। অনিত্য সংসার মানুষকে পিষিয়া মারে, সত্যের পথ রুদ্ধ করে। তুচ্ছ সুখের আশায় অমূল্য জীবন হেলায় নষ্ট করা মূঢ়তা। তাঁহার মোহ কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল সামান্য ধোপার মেয়ের মুখ দিয়া ভগবান তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। তিনি বিবেকের দংশনে জর্জরিত হইলেন, প্রিয়তমের ডাক আসিয়াছে। আর ঘরে থাকা চলে না, বিশাল জমিদারী, অপূর্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী এবং সুদর্শন প্রিয় পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনির্দিষ্টের পথে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বৃন্দাবন ধামে আসিয়া কঠোর তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন। বনেদী বংশের সন্তান এবং জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ সামান্য মাধুকরী করিয়া দিন যাপন করেন এবং ভগবৎ ধ্যানে নিযুক্ত

থাকেন। দৈন্যের জীবন যাপনের খবর পাইয়া তাঁহার ম্যানেজার অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ হইতে বৃন্দাবনে ছুটিয়া আসিলেন এবং কঠোরতা করিয়া অযথা শরীর নষ্ট না করিবার জন্য মনিবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। ম্যানেজার প্রস্তাব করিলেন পৈতৃক জমিদারী হইতে যদি টাকা গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করেন তবে অন্তত স্বোপার্জিত জমিদারী হইতে পঁচিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি (কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ) ইচ্ছা মত ইষ্টের উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন এবং সেবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার, তীর্থযাত্রীর সুবিধার্থে ঘাট নির্মাণ, বৈষ্ণব সাধু ভক্ত এবং দরিদ্রদের জন্য আহারের সংস্থান করিয়া নিজে ভগবৎ ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে পারেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। ম্যানেজারের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি তাঁহার মনে রেখাপাত করিল। তাঁহার বারংবার পীড়াপীড়িতে কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ সম্মত হইলেন এবং উপরি-উক্ত নানাবিধ সৎকাজে দানাদির ব্যবস্থা করিলেন।

সৎকার্যে অজস্র দানের জন্য কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহের সুনাম উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। এইজন্য এই দানবীর 'লালাবাবু' নামে পরিচিত। প্রত্যেক কর্মের দুইটা দিক আছে, ভাল ও মন্দ। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উভয়ই আছে। অসৎ কর্মে অনেক বন্ধু জুটে, শত্রুও জুটে। দানাদি সৎকর্মেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সৎকর্ম দ্বারা যেমন বন্ধুত্ব অর্জন করা যায় অনেকের শত্রুতাও তেমন পাওয়া যায়। লালাবাবুর মত হৃদয়বান সাধুরও শত্রু জুটিল। বৃন্দাবনে জনৈক বিখ্যাত ধনী ছিলেন, ঘাট নির্মাণ, মন্দির নির্মাণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং জীর্ণ মন্দির সংস্কার, বৈষ্ণব সাধু এবং গরীবদের জন্য দানসত্র খুলিয়া সেবা এবং অন্যান্য সৎকর্মে দান করিয়া তিনিও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন; কিন্তু লালাবাবুর নামই লোকে বেশী করিত। এই হিসাবে লালাবাবু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়ে উভয়ের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেন।

বৃন্দাবনে নিজ ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করিবার সময় পাথর সংগ্রহ করিতে লালাবাবুকে মাঝে মাঝে ভরতপুরে যাইতে হইত। ভরতপুর রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। এখানকার পাথর মন্দির নির্মাণে বিশেষ উপযোগী। ভরতপুরের মহারাজা লালাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। কর্মোপলক্ষে ভরতপুরে গেলে তিনি বন্ধুর ওখানে উঠিতেন। ঐ সময় সার চার্লস মেটকাফ ভারতের লাট্। তাঁহার পরামর্শ মত দিল্লীর রেসিডেন্ট রাজপুতনার দেশীয় রাজাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন ব্যবস্থা হইয়াছে। ভরতপুরের মহারাজা রাজন্যবর্গের

অন্যতম। সন্ধিপত্রে তিনিও স্বাক্ষর দিবেন ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেন নাই। সন্ধিসূত্রে স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির মূলে লালাবাবুর প্ররোচনা আছে সন্দেহ করিয়া মথুরার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট দিল্লী রেসিডেন্টের আদেশক্রমে তাঁহাকে (লালাবাবুকে) বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া গেলেন। ইহাতে চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহার ব্যক্তিত্বে অনেকেই মুগ্ধ। জনপ্রিয় দাতাকে (লালাবাবুকে) বিনা অপরাধে বন্দী করাতে অগণিত বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁহার পিছে পিছে দিল্লী পর্যন্ত ছুটিল। সন্ধিসূত্রে ভরতপুরের মহারাজার স্বাক্ষরদানের অস্বীকৃতিতে সত্য সত্য লালাবাবুর প্ররোচনা আছে কিনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া সার চার্লস মেটকাফ্ যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন যে বন্দী নির্দোষ তখন তাঁহাকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন। লালাবাবুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া সার চার্লস মেটকাফ্ তাঁহাকে খেতাব দেওয়ার জন্য দিল্লীর রেসিডেন্টকে অনুরোধ করিলেন। লালাবাবু সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভগবান লাভের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়া তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়োজন ভগবৎ প্রীতি, খেতাব নয়। তিনি কোন প্রকার খেতাব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না।

মন্দির নির্মাণ, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, সেবার ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে। লালাবাবু এখন অধিকাংশ সময় ইষ্টচিন্তায় মগ্ন থাকেন, দীনহীন ভাব। একদিন প্রচণ্ড শীতের সময় তিনি মন্দিরে বসিয়া আছেন। তখন বিগ্রহের সেবায় রত আছেন। লালাবাবু ভাবিলেন দেববিগ্রহ যদি হয় তবে বিগ্রহের শরীরে নিশ্চয়ই উত্তাপ থাকিবে। উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি পুরোহিতকে মাখনের ডেলাটি বিগ্রহের মাথার উপর রাখিতে বলিলেন। পুরোহিত তাহাই করিলেন। তখন বিগ্রহের দেহের উত্তাপে মাখনের ডেলা গলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার অনুরোধে পুরোহিত বিগ্রহের নাকের সম্মুখে তুলা ধরিয়া যখন দেখিলেন যে উহা নড়ে তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে বিগ্রহের মধ্যে যে ভগবানের অস্তিত্ব আছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ নানা ভাবে পরীক্ষার পর তাঁহার মন শান্ত হইল। ইষ্ট-প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িল।

শীঘ্রই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গোবর্ধনে যাইতে এবং তপস্যায় লিপ্ত থাকিয়া ভগবৎ ধ্যানে ডুবিয়া যাইবার জন্য লালাবাবু স্বপ্নে ইষ্টের আদেশ পাইলেন অবিলম্বে গোবর্ধনে আসিয়া দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়া তিনি জীবন যাপন

করেন এবং ভগবৎ ধ্যানে লিপ্ত থাকেন। যিনি অজস্র দান করিয়াছেন, অসংখ্য লোকের সেবা করিয়াছেন, অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে হয়। ভিক্ষার অন্ন, বিশেষতঃ মাধুকরী অন্ন, অতি পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ইষ্ট। ইষ্টের জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ অত্যন্ত গৌরবের। ইষ্টের ধ্যানে মন যত ডুবিতে লাগিল ততই লালাবাবুর মনে হইতে লাগিল একটা কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। গুরুকরণ হয় নাই। উচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন সদগুরুর কৃপা ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। দীক্ষাই পাসপোর্ট। তখন কৃষ্ণদাস বাবাজী গোবর্ধনে বাস করিতেন। তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা, মাথার শিরোমণি, ত্যাগ, তপস্যা এবং অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি নিরন্তর ভগবৎচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। লালাবাবুর তখন তীব্র বৈরাগ্য। একদিন কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট গিয়া দীক্ষা ভিক্ষা চাহিলেন। ভিক্ষা চাহিলে সব সময় মিলে না, দীন-ভাবে না চাহিলে দাতার দয়ার উদ্রেক হয় না। দাতাও উপযুক্ত অধিকারী না পাইলে দান করেন না। উলুবনে মুক্তা ছড়ান না। কৃষ্ণদাস বাবাজী শুধু অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ নন, তিনি মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও বটে। চোখ, মুখ, কপাল দেখিয়া মানুষের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তিনি লালাবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন যে দীক্ষার সময় এখনও হয় নাই। যখন হইবে তখন তিনি বিনা আহ্বানে নিজে প্রার্থীর দরজায় গিয়া দীক্ষা দিবেন। লালাবাবু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চোখ দিয়া অবিরল ধারা পড়িতে লাগিল। তাঁহার ধারণা হইল এত দান সেবা সব বৃথাই হইয়াছে। উহা দ্বারা নাম যশ কিনিয়াছেন আর অহমিকাকে স্ফীত করিয়াছেন মাত্র। বৈরাগ্য, দীনতা ভাব, ভক্তি, পবিত্রতা প্রভৃতি সংসার সমুদ্র পার হইবার পাথেয় সংগ্রহ করেন নাই। অথচ পাথেয় সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত মনের স্থৈর্য ও শান্তি আসিবে না।

তাঁহাকে শান্তি পাইতেই হইবে। পথ যতই দুর্গম হউক না কেন যাইতেই হইবে। যে কোন মূল্যে পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইবে। লালাবাবু পূর্বের ন্যায় কঠোর তপস্যা এবং ভগবৎ ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন, শরীর জীর্ণ, গায়ের রং ময়লা হইয়াছে। কঠোরতা অভ্যাসের ফলে দীনভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক মাস পরে আবার কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট গিয়া কৃপা ভিক্ষা করিলেন। এবারও তিনি একই কারণে লালাবাবুকে নিরাশ করিলেন। দ্বিতীয় বারের উপেক্ষা তাঁহার মনে আত্মবিশ্লেষণ আনিল।

তিনি বুঝিলেন তাঁহার তপস্যায় কোথায় যেন কি একটা ভয়ানক গলদ রহিয়া গিয়াছে। ঐ ছিদ্রপথ দিয়া তাঁহার সমুদয় ত্যাগ, তপস্যা, ভাব, ভক্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিকতার কৌটায় কিছুই জমা পড়িতেছে না। দুধের কলসীতে একবিন্দু গোমূত্র পড়িলে যেমন সব দুধ নষ্ট হইয়া যায় সেরূপ তাঁহার মনের লুক্কায়িত গলদই সব তপস্যার ফল নষ্ট করিতেছে। যে কোন মূল্যে উহা রোধ করিতে হইবে। তিনি নিজের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইলেন। ধিক্কারে মন আচ্ছন্ন হইল। তথাপি তপস্যা হইতে বিরত হইলেন না। নিত্য ধ্যান অভ্যাসের ফলে উক্ত ছিদ্রপথ কোন না কোন দিন ধরা পড়িবেই।

একদিন মাধুকরী ভিক্ষার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে একজন ধনীর প্রাসাদতুল্য বাড়ী। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জীবনের সমস্যার সমাধান হইয়াছে। অন্তরের গলদ ধরা পড়িয়াছে। দানাদি ব্যাপারে তিনি নিজেই উক্ত গৃহমালিকের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া দান করিয়াছেন অভিমানকে স্ফীত করিয়াছেন। এই অহংকারই তাঁহার মনকে অপবিত্র করিয়া অধ্যাত্ম পথের কণ্টক সৃষ্টি করিয়াছে। অগ্রসর হইতে দেয় নাই। নাম ও যশের সূক্ষ্ম বাসনা মনে দানা বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই কৃষ্ণদাস বাবাজী এতদিন তাঁহাকে কৃপায় বঞ্চিত করিয়াছেন। দীক্ষা দেন নাই। লালাবাবুর অন্তরের দ্বিধাভাব কাটিয়া গিয়াছে দীর্ঘকাল তপস্যা এবং ধ্যান অভ্যাসের ফলে মনের ময়লা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে যেটুকু বাকী আছে তাহা এখন মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ধনীর দুয়ারে আসিয়া 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিয়া মাধুকরী ভিক্ষা চাহিলেন তাঁহার গলার স্বর শুনিবামাত্র বাড়ীর সকলে চমকিয়া গেলেন। এতকালের প্রতিদ্বন্দ্বীর দুয়ারে আজ লালাবাবু অভিমান বিসর্জন দিয়া দীনভাবে মাধুকরী নিতে আসিয়াছেন। এতদিন পরে আজ প্রকৃত বৈষ্ণবের দেখা মিলিল গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি আসিয়া অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া করজোড়ে গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, আজ আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। বৈষ্ণব সেবা এবং দানাদি বিষয়ে আপনি বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই দ্বন্দ্বে আপনারই জয় এবং আমার পরাজয় ঘটিল। আপনার কাঁধে যে ভিক্ষার ঝুলি আছে তাহা উদারতায় পূর্ণ, আর আমি কাঞ্চনের বিনিময়ে পরাজয় কিনিয়াছি আপনি ধন্য। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনাকে আজ আমার সব বিষয়-সম্পত্তি অর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। সব গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। লালাবাবু যে

সম্পদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়াছেন, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন সে সম্পদের নিকট ধনীর সম্পদ্ তুচ্ছ। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। উক্ত ধনীর গৃহ হইতে মাধুকরী নিয়া নিজ কুঠিয়ায় ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁহাকে পূর্বে দুইবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তখন বলিয়াছিলেন 'সময় হইলে আমি নিজেই গিয়া প্রার্থিত বস্তু দিব'। এখন সময় হইয়াছে। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। বলিলেন, 'সব পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। দীক্ষার সময় হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় অভিমান যাহা বাকী ছিল তাহা মুছিয়া গিয়াছে। এবার স্নান সারিয়া এস এবং দীক্ষা গ্রহণ কর'।

দীক্ষা হইয়া গেল। কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুকে কৃপা করিলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত। প্রেমের বীজ পবিত্রতা, সরলতা, অভিমান রাহিত্য এবং ভক্তিজলে সিঞ্চিত হইয়া ফল প্রদান করিল। কান্দির প্রসিদ্ধ জমিদার এখন দীন বৈষ্ণব। নিত্য ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ভগবৎ কৃপায় প্রার্থিত বস্তু মিলিয়াছে। তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া মহান্ হইয়াছেন। এখনও বৃন্দাবনে তাঁহার নাম লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধ হইবার পর তাঁহার সুনাম আরও চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে বহু লোক আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। অত্যধিক ভিড়ে তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভিড় এড়াইবার জন্য পূর্বে কাহাকেও কোন প্রকার খবর না দিয়া তিনি একদিন অন্ধকার রাত্রে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঐ সময় গোয়ালিয়র হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য রাস্তা দিয়া আসিবার সময় রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে মাড়াইয়া দিল। তিনি আঘাত পাইলেন। ক্রমশঃ এই আঘাত সাংঘাতিক হইল। তাঁহাকে বৃন্দাবনে আনা হইল। অসুখ আর সারিল না। তিনি ইষ্টের পদে লীন হইলেন।

॥ একত্রিশ ॥

সন্তদাস বাবাজী

১৮৫৯ সালের ১০ই জুন শুক্রবার শুভদিন। ঐ দিন একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ এই জগতে আগমন করেন। তাঁহার নাম সন্তদাস বাবাজী। পূর্বনাম তারাকিশোর চৌধুরী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতা হরকিশোর চৌধুরী বড় জমিদার। শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বামাই গ্রামে বাস। তারা-কিশোরের মাতা গিরিজাসুন্দরী দেবী ধর্মপরায়ণা, অতিথিবৎসলা। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারাকিশোরের দিনগুলি ভালভাবেই কাটিতেছে, কিন্তু বাল্যে একটা বিপর্যয় ঘটাতে মনে খুব দুঃখ হয়। মাত্র নয় বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটাতে তিনি স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। তারাকিশোর মেধাবী ছাত্র। কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পিতা হরকিশোর চৌধুরী হরিচরণ ভট্টাচার্যের সুন্দরী কন্যা অন্নদা দেবীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় তারাকিশোর কলিকাতায় আগমন করেন। তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিপত্তি খুব বেশী। শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। ব্রাহ্মধর্ম উদার, বেদের কর্মকাণ্ড না মানিলেও জ্ঞানকাণ্ডে বিশ্বাসী। শিক্ষা দীক্ষা, সমাজ সংস্কার, স্ত্রী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মগণ অগ্রণী। ব্রাহ্মরাও হিন্দু, তবে উদারপন্থী। হিন্দু আইন দ্বারা তাঁহাদের সমাজ পরিচালিত। নানা কারণে সমাজে তাঁহাদের প্রভাব খুব বেশী। তারাকিশোর উদার। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। সমাজের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। তাঁহার পিতা হরকিশোর চৌধুরী প্রাচীনপন্থী, সনাতন ধর্মে আস্থাবান। বাপ পিতামহের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের নবীন ধর্ম গ্রহণ তিনি পছন্দ করিলেন না। পুত্রও ভয়ানক জেদী, একরোখা। যাহা একবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। বরং প্রয়োজন হইলে নূতন ধর্মের উন্নতিকল্পে সর্বস্ব পণ করিতে পারেন। এই জন্য পিতা-পুত্রে মন কষাকষি হইল।

এম. এ. পাস করিয়া তারাকিশোর সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করিলেন। তখন তাঁহার পিতা পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে বাস করেন। পিতা

তথায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন খবর পাইয়া তারাকিশোর তাঁহাকে দেখিতে যান। পুণ্যতীর্থে ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং ভাস্করানন্দ স্বামীর মত মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া এবং ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদার দর্শন করিয়া নবীন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার মোহ অনেকটা কাটিয়া যায় এবং সনাতন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। তারাকিশোর ওকালতি পাস করিয়া প্রথমে শ্রীহট্টে, পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। যাহা উপার্জন করিতেন তাহা প্রায় সমস্তই পরহিতে ব্যয় করিতেন। তিনি শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার জন্মার্জিত সৎ সংস্কার স্ফুরণোন্মুখ হইল। ভিতরের ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। ব্রাহ্মণের করণীয় সন্ধ্যাবন্দনা হইতে কখন বিরত হন না। তা সত্ত্বেও মনে যেন একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি এখন হইতে এমন শক্তিশালী পুরুষের সন্ধানে রহিলেন যিনি পথের সন্ধান দিতে পারেন। পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা চান তাহা একমাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন সদ্‌গুরুই দিতে পারেন। তিনি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে রহিলেন। কিন্তু চাহিলেই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। সময় অনুকূল হইলে তবে প্রার্থিত বস্তু মিলে। একদিন চিন্তাক্লিষ্ট মনে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন এমন সময় দেখিলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইশারা করিতেছেন। তারাকিশোর নিকটে গেলে উক্ত পুরুষ একটা মন্ত্র দিয়া নিত্য জপ করিতে উপদেশ দিলেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে শীঘ্রই তাঁহার সদ্‌গুরুর দর্শন মিলিবে। জ্যোতির্ময় মূর্তির ভবিষ্যৎ বাণী বৃথা যায় নাই। অদূর ভবিষ্যতে তাহার ফল ফলিল। তিনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু কাটিয়াবাবার কৃপা পাইলেন। কাটিয়াবাবা সিদ্ধ মহাপুরুষ।

তারাকিশোর আইনজ্ঞ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, আইনের খুঁটিনাটি ভালই বুঝেন। কোর্টে যখন সওয়াল জবাব করিতে দাঁড়ান—জজ, মক্কেল, শ্রোতৃবর্গ খুব মনোযোগ দিয়া শুনেন। প্রায়ই তাঁহার মক্কেল মোকর্দমায় জয়লাভ করেন। এই জন্ম মক্কেলের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং উপার্জনের অঙ্কও বাড়িয়া চলে। ওকালতিতে তাঁহার খুব পসার। উপার্জন যাহা করিতেন অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্র, আত্মীয়দের জন্ম ব্যয় করিতেন। তিনি যেমন উদার, দানবীর, তাঁহার পত্নী অন্নদাদেবীও সেরূপ ধর্মপরায়ণা। আশ্রিতদের খুব যত্ন নিতেন। এত কর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তারাকিশোরের অন্তরের ধর্মভাব বিন্দুমাত্র কমে নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইয়াছে। নিত্য গৃহদেবতার সামনে ধ্যান অভ্যাস করিবার কালে ভাবিতেন তিনি নিজে সম্পদের মালিক নন, ভগবান সব কিছুরই মালিক। তিনি সামান্য ট্রাষ্টি মাত্র, বিষয় সুবন্দোবস্ত করিবার অছি মাত্র। তার অধিক নন। তাঁহার ভক্তি-পরায়ণা স্ত্রী অন্নদাদেবীও অনুরূপ ভাবনা করিতেন।

তাঁহার গুরু কাটিয়াবাবা বৃন্দাবনে থাকেন। আশ্রমের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। বাড়ীঘরের অবস্থাও সেই রকম। নূতন বাড়ী ঘর তৈয়ার করিয়া এবং অর্থ সাহায্য দিয়া তারাকিশোর আশ্রমের অবস্থা সচ্ছল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। ১৮৯৭ সালে নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার মনে প্রবল বাসনা জাগিল যে সংসার ত্যাগ করিয়া চিরতরে সন্ন্যাসী হইয়া যান, এবং নিরন্তর ভগবৎ ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন কিন্তু গুরু কাটিয়াবাবা অনুমতি দিলেন না। কারণ তাঁহার সংসার ত্যাগ করিবার সময় তখনও হয় নাই। অনেক কর্তব্য বাকী রহিয়াছে। উহা শেষ করিতে হইবে। কাটিয়াবাবা আরও আশ্বাস দিলেন যে তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে ভার নিয়াছেন। গুরুর উপরে বিশ্বাস থাকিলে শিষ্যকে ভাবিতে হইবে না। তারা-কিশোরের মন কি ধাতুতে গড়া, তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসী কিনা, তাঁহার মধ্যে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে তাহা আন্তরিক কিংবা লোক দেখানো, স্থায়ী কি ক্ষণস্থায়ী তাহা দেখিবার জন্য কাটিয়াবাবা তাঁহাকে বহু পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন। কিন্তু প্রতি পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন, সদ্‌গুরু যখন শিষ্যের ভার নেন তখন তাঁহাকে বহু আপদে বিপদে রক্ষা করেন এমন কি মৃত্যুর হাত হইতেও বাঁচান।

একবার তারাকিশোর আশ্রমের সকলকে লইয়া ব্রজ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। খরচপত্র তিনিই বহন করিতেছেন। পরিক্রমাকালে ব্রজবালক-দের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে দুটি দেবকুমারের মত অপূর্ব সুন্দর বালক, একজন কালো অপরটি ফরসা, বলিল যে তাহারাই বিতরণের ব্যবস্থা করিবে। তারাকিশোর সম্মতি দিলেন। বালক দুটি বিতরণের কাজ শেষ করিয়া হঠাৎ কোথায় কোন্ দিকে কি ভাবে অদৃশ্য হইল কেহই টের পাইলেন না; তারাকিশোরের মনে হইল স্বয়ং কৃষ্ণ এবং বলরাম আসিয়া ব্রজবালকদের এইভাবে মিষ্টি বিতরণ করিয়া গেল। আর একদিন আশ্রমে সাধু ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিজ গুরু কাটিয়াবাবা এবং অন্যান্য সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া তারাকিশোর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন

এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটি অপূর্বসুন্দর বালক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে এক বাটি গরম দুধ পান করিবার জন্য দিয়া চকিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল কেহই টের পাইল না।

কয়েক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। আশ্রমের অনেক উন্নতি হইয়াছে। নূতন বাড়ীঘর হইয়াছে। অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে। কাটিয়াবাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি আশ্রমের সচ্ছল অবস্থা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তারাকিশোর এখন সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। পূর্বে গুরু আশ্বাস দিয়াছিলেন সময় হইলে বন্ধন আপনি ছুটিয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক জীবন নিরাপদ হইবে। এখন তাহা সফল হইতে চলিল। ১৯১৫ সালে তিনি আইন-ব্যবসা, বাড়ীঘর, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব ত্যাগ করিয়া আশ্রমে যোগ দিলেন। আশ্রমের নাম নিম্বার্ক আশ্রম। আচার্য নিম্বার্কের নামে হইয়াছে। তাঁহার নূতন নাম সন্তদাস বাবাজী। আশ্রমে যোগদান করিয়া তিনি নিয়মমত শাস্ত্রপাঠ, জপ, ধ্যান অভ্যাস করেন। গুরুর আদেশ মত বিগ্রহ সেবা করেন। একদিন বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি গেল। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি স্থির করিলেন রাত্রে না ঘুমাইয়া জপ, ধ্যান ও প্রার্থনায় সময় কাটাইবেন। ঐরূপ অভ্যাসের ফলে মন শান্তভাব ধারণ করিল। আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন রকমের অনুভূতি হইল, পূর্ব জীবনের স্মৃতিসকল ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিলেন। একদিন কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিম্বার্ক আশ্রমে আসিয়া ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকীল তারাকিশোর চৌধুরী কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সন্তদাস বাবাজী বলিলেন, 'তারাকিশোর চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। তাঁহার আত্মা এখন সন্তদাস বাবাজীরূপে বৃন্দাবনে নিম্বার্ক আশ্রমে থাকেন'।

নূতন পরিবেশে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। অনেক পুরাতনকে বাদ দিয়া নূতন কিছু করিতে হয়, যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহা ছাড়িতে হয় এবং যাহা প্রয়োজনীয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। আশ্রমের কাজ ঠিক মত চলে না। অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কাটিয়াবাবার দেহরক্ষার পর বিষ্ণুদাসজী আশ্রমের মোহন্ত। আশ্রম পরিচালনা বিষয়ে যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাহা তাঁহার নাই। ধৈর্যেরও অভাব। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতার অতিশয় সম্মানের পদ, দায়িত্ব অনেক। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময়ে হাজার হাজার বৈষ্ণব নিম্বার্ক আশ্রমে আশ্রয় নেন। সেই সময়ে তাঁহাদের খাওয়া-

দাওয়া, বাসস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। সন্তদাস বাবাজীর বিদ্যাবুদ্ধি, আশ্রম চালনা বিষয়ে দক্ষতা, ধৈর্য এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে যথেষ্ট অধিকার দেখিয়া সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহাকে মোহন্তের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন। ১৯২০ সালে নাসিকে কুম্ভমেলা হয়। ঐ সময়ে তিনি নিম্বার্ক আশ্রমের মোহন্ত হিসাবে স্বীকৃত হন। শ্রীসম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হৃষ্টমনে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া নেন। সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে বহু ভক্তযাত্রীর দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়ে। ইহা ব্যতীত আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব এবং ঝামেলা ত আছেই। ভগবানে অটুট বিশ্বাস থাকিলে তবে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম পরিচালনা সম্ভব হয় নইলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু গুরু এবং ইষ্টে বিশ্বাস থাকিলে এই অসুবিধা দূর হইয়া যায়। সন্তদাস বাবাজীর তত্ত্বাবধানে কাজকর্ম খুব ভালভাবে চলিয়া যাইতেছে। অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কখনও কাহারও নিকট হাত পাতিতেন না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন বলিয়া তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই। তাঁহার মতে সৃষ্টির আদি হইতে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করিয়া আসিতেছেন, তিনিই জগৎকে ধর্মপথে চালিত করিবার জন্য গুরুরূপে প্রকাশিত হন। শিষ্য যতই অহংকারমুক্ত হয় ততই তাহার মহিমা বুঝিতে পারে এবং ইহাও বুঝে যে গুরুর মধ্য দিয়া ভগবৎ-কৃপা প্রকাশ পায়।

দিন দিন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে শারীরিক উন্নতিরও খবর নিতেন। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো কঠোর কখনো কোমল হইতেন। কখনও কাহাকে অবহেলা কিংবা দুর্ব্যবহার করিতেন না। এমন কি আশ্রমের মেথরের প্রতিও তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। সাহিত্যেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভগবৎ মহিমা প্রচারের জন্য তিনি ভক্তিবাদ বিশেষতঃ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ধর্মমত সমর্থন করিতেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা, দার্শনিক বীজনাম, ব্রহ্মবাদী ঋষি প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন।

বহুদিন পর তিনি কলিকাতা এবং শ্রীহট্টে আসিয়া বন্ধু, ভক্ত এবং শিষ্যদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। কিছুকাল পরে আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। যত দিন যাইতে লাগিল তত ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইল। মন অন্তর্মুখীন হইল। ১৯৩৫ সালে ১৫ই কার্তিক তিনি পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন ধামে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

॥ বত্রিশ ॥

রামদাস কাঠিয়াবাবা

সমাজে যে ভেদ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানুষে মানুষে ভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদ, উচ্চে নীচে ভেদ, উচ্চে উচ্চে ভেদ, নীচে নীচে ভেদ, ধনীতে ধনীতে ভেদ, নির্ধনে নির্ধনে ভেদ, ধনীতে নির্ধনে ভেদ, রাজায় রাজায় ভেদ, রাজায় প্রজায় ভেদ, প্রজায় প্রজায় ভেদ, সর্বত্র ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এই ভেদসৃষ্টি মানুষের গড়া, সামাজিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় এই ভেদসৃষ্টি অবাস্তব। এক অনন্ত শক্তিমান ভগবানই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে আপনাকে চৈতন্য রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে ভেদ থাকিতে পারে না। ভেদ কাল্পনিক, সমস্তই বাস্তব। যাঁহারা মানুষের গড়া নিয়মের বেষ্টনী ছাড়িয়া গিয়াছেন, আপনাকে ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করিয়া ভগবৎ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা জীবনের মূল সূত্র জানেন। তাঁহারা মহাপুরুষ। সমদর্শিত্ব তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, তাঁহাদের নিকট ছোট বড় সব সমান। জগতের মাপকাঠি দিয়া তাঁহাদের বিচার চলে না।

পূর্ব পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর অমৃতসর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে লোনা চামারি এক বিশিষ্ট গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান। প্রবন্ধোক্ত কাটিয়াবাবা উক্ত গ্রামে কোন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সাল, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন এবং বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁহার পিতা যে ধার্মিক গৃহস্থ এবং মাতা ধর্মপরায়ণা ছিলেন ইহা অনুমান করা যায়। কারণ পিতামাতা সৎ হইলে পুত্রও সৎ হয়। রামদাস যে শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ছোটবেলা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। লোনা চামারি গ্রামের নিকটে একজন সন্ন্যাসী থাকিতেন। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রামদাস তাঁহার নিকট যখন যাইতেন তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে রামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। যিনি রামের শরণাপন্ন হন রাম তাঁহাকে কৃপা করেন। রামদাসকেও করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া রামদাস নিত্য ধ্যান অভ্যাস করিতেন। একদিন রামদাস একটা গাছের তলায় বসিয়া আছেন এমন সময় একজন ক্ষুধার্ত সন্ন্যাসী তাঁহার সামনে আসিয়া কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসীর জন্য রামদাসের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তার উপর ক্ষুধার্ত। রামদাস অবিলম্বে বাড়ীতে গিয়া পিতামাতাকে না জানাইয়া কিছু খাবার আনিয়া সন্ন্যাসীকে দিলে তিনি রামদাসকে খুব আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন যে সে কালে প্রসিদ্ধ যোগী হইবে। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ যে বিফলে যায় নাই রামদাসের পরবর্তী জীবনই তাহার সাক্ষী। সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে রামদাস প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সাধুর সংস্পর্শে আসিবার পর রামদাসের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল, ভগবান লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। গৃহস্থ সংস্পর্শ বিষবৎ বলিয়া বোধ হইল। সংসার অনিত্য বোধ হইল। যাহা অনিত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু রামদাস এখনও ছেলেমানুষ।

যথাসময়ে দশবিধ সংস্কারের অন্যতম উপনয়ন সংস্কার হইয়া গেলে রামদাস আচার্যের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলে পিতা এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন। এইবার তাঁহার অন্তরদেবতা বিদ্রোহ ঘোষণ' করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া ভগবানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রবল। তিনি কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। পিতামাতা কত বুঝাইলেন, এমন কি ভয়ও দেখাইলেন কিন্তু বিদ্রোহী সন্তান কিছুতেই বশ মানিলেন না। অধিক পীড়াপীড়ি করিলে হিতে বিপরীত হইবে আশঙ্কা করিয়া পিতামাতা অবশেষে রণে ভঙ্গ দিলেন।

একদিন রামদাস গ্রামের বাহিরে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন এমন সময় এক বাণী শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরদেবতা তাঁহাকে আদেশ করেন: 'জ্বালামুখী পবিত্র তীর্থ। একান্ন পীঠের অন্যতম, সাধনার অনুকূল স্থান। বহু সাধক এই পবিত্র তীর্থে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। ওখানে গিয়া ভগবৎ চিন্তায় ডুবিয়া থাক। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে'। রামদাস জ্বালামুখীর পথ ধরিলেন। রাস্তায় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। সন্ন্যাসীর সৌম্য মূর্তি, মাথায় জটা। রামদাসের তখনও গুরুকরণ হয় নাই। সদ্‌গুরুর কৃপাই আধ্যাত্মিক জীবনের পাসপোর্ট। রামদাস সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসীর পরার্থে জীবন। সুলক্ষণযুক্ত রামদাসকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। দীক্ষার

পর রামদাসের অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পথ খুলিয়া গেল। অমরত্ব লাভ সম্ভব এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

বাতাসেরও কান আছে, রামদাস সাধু হইয়াছে এই খবর পিতামাতার নিকট পৌঁছিতে দেরি হইল না। পুত্র সংসারে থাকিবে না, সন্ন্যাসী হইয়া পর হইবে ইহা কোন পিতামাতা সহ্য করিতে পারেন না। পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মাতা এত অধীর হইলেন যে জীবনের আশঙ্কা ঘটিল। পিতা অবিলম্বে পুত্রের নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে গুরুর অনুমতি নিয়া মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রামদাস বাড়ী আসিলেন। এই সময়ে রামদাস একটা বটগাছের তলায় বসিয়া নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতেন, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। একদিন তাঁহার এক অদ্ভুত দর্শন হইল। গায়ত্রী দেবী উজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। কিছুদিন আনন্দে কাটিবার পর আবার এক বিপর্যয় ঘটিল। তিনি নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এক অপূর্বসুন্দরী যুবতী রামদাসকে দেখিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। কু-অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকটে অসময়ে আসিয়া প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পিছনে কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচনা আছে কিনা রামদাস বুঝিতে পারিলেন না, তিনি সরল। নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইট, পাথর ছুঁড়িয়া যুবতীকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে ভাবিলেন যেখানে এরূপ প্রলোভন আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহা ত্যাগ করাই ভাল। স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ। তিনি চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গুরুকৃপা তাঁহার উপর প্রবল। তাই সহজে বিপদ মুক্ত হইলেন। যিনি মহৎ হইবেন ভগবান তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

এখন হইতে রামদাসের পরিব্রাজক জীবন আরম্ভ হইল। পরিব্রাজক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুর নিকট অনেক শুনিয়াছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যে ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন সে ভয় আবার আসিল। তবে নূতন আকারে। উক্ত দেশের মৃত রাজার বিধবা রাণী নবাগত যুবক সাধুকে (রামদাসকে) খুব সেবা করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ভগবৎ কৃপা এবং গুরুর প্রবল আশীর্বাদ থাকাতে রামদাস অবিলম্বে নূতন বিপদ কাটাইয়া উঠিলেন। রাণীর কু-অভিপ্রায় টের পাইয়া রামদাস অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিয়া একটা পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। তথায় একটা গুহা দেখিতে পান। দ্বার রুদ্ধ, ঠেলা দেওয়া মাত্র খুলিয়া গেল। দেখিলেন একজন বৃদ্ধ যোগী যোগাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁহার মাথায় জটা, চামড়া

শিথিল, দেখিলে শ্রদ্ধার উদয় হয়। পাছে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কা করিয়া রামদাস বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গের পর যোগী গুহার বাহিরে আসিয়া আগন্তুক কি চায় জিজ্ঞাসা করিলে রামদাস সবিনয়ে বলিলেন যে তিনি সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন এবং যোগী যদি তাঁহাকে শিষ্য হিসাবে সেবা করিবার অধিকার দেন তবে তিনি খুব সুখী হইবেন। শিষ্য হইবার ইচ্ছা আন্তরিক কি লোকদেখানো পরীক্ষা করিবার জন্য যোগী তাঁহাকে বলিলেন, যদি তিনি গুরুর আদেশে নিকটস্থ কুয়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন তবে তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিবেন। যোগীর কথায় রামদাস ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় যোগী হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রামদাসের পবিত্রতা এবং সরলতায় মুগ্ধ হইয়া যোগী তাঁহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে অন্যত্র গিয়া যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন।

এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রামদাসের যোগীগুরুর সন্ধান মিলে। দেবদাসজী তাঁহার গুরু। তিনি বিখ্যাত যোগী। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধু। শীতপ্রধান স্থান যোগাভ্যাসের অনুকূল। তখন শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য যোগীরা নেশা করেন। দেবদাসজীরও এই অভ্যাস ছিল। তিনি নেশা করিয়া অনেক সময় ধুনির সামনে বসিয়া দিনের পর দিন ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। যোগাভ্যাসের জন্য তাঁহার অনেক বিভূতিও হইয়াছিল। যোগশক্তির জন্য রামদাস গুরুর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন। একবার কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে গুরু দেবদাসজীর শরীর খুব গরম হইলে শরীরে ভীষণ জ্বালা আরম্ভ হয়। গাত্রদাহ নিবারণের জন্য তিনি রামদাসকে গ্রাম হইতে কিছু দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলেন। রামদাস আধমণ দুধ সংগ্রহ করেন। সমস্ত দুধ পান করিয়াও দেবদাসজীর গাত্রদাহ নিবারণ হইল না দেখিয়া তিনি আরও দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। রামদাস আবার গ্রামে গিয়া কয়েক সের দুধ সংগ্রহ করিয়া আনেন। সমস্ত দুধ পান করিয়া তবে দেবদাসজীর গাত্রদাহ কমে। আর একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ গাঁজা ফুরাইয়া যাওয়াতে দেবদাসজী রামদাসকে অবিলম্বে গাঁজা যোগাড় করিয়া আনিতে বলিলেন। তখন শীতকাল, ভীষণ কনকনে শীত, বাহিরে যাওয়া দুঃসাধ্য। পাহাড়ের কনকনে শীতে গভীর জঙ্গলের রাস্তা দিয়া চলিয়া রামদাস গুরুর জন্য গাঁজা সংগ্রহ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে শীতে তাঁহার এত কষ্ট হইল যে শরীর অবশ হইবার উপক্রম হইল। ক্লান্তি দূর করিবার জন্য রামদাস গাঁজায় দম দিলেন। সামান্য অংশ খরচ হইয়া গেল। অবশিষ্ট সব গুরুর নিকট জমা দিলেন। দেবদাসজী যোগী, মনস্তত্ত্ববিদ্। শিষ্যের

মনে কি চিন্তা চলিতেছে তাহা টের পান। গুরুর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত গাঁজা এইভাবে খরচ করার জন্য তিনি রামদাসকে খুব তিরস্কার করিলেন। শিষ্য গুরুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামদাস বুঝিলেন যে গুরুর নিকট কোন বিষয় লুকান সম্ভব নয়।

তীর্থভ্রমণ সাধু-জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য। ইহাতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। শিষ্যসহ গুরু দেবদাসজী তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। পথে এমন একটা অঘটন ঘটিল যাহা দ্বারা রামদাস নিজ গুরুর অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। লাহোরের নিকট সাধুর জমায়েত পড়িয়াছে। পথে একজন শাল মার্চেন্টের সঙ্গে দেখা হইলে দেবদাসজী তাঁহাকে সাধুসেবা করাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মার্চেন্ট তাহা করিতে অস্বীকার করিলে দেবদাসজী তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অভিশাপ দিয়া বলিলেন যে তাঁহার শালের গুদামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইবে। উক্ত মার্চেন্ট যোগীর অভিশাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে যোগীর অভিশাপ ফলিয়াছে এবং শালের গুদামে সত্য সত্যই আগুন লাগিয়াছে তখন প্রমাদ গনিলেন। একে ত গ্রাম দেশ, এমন কি শহরেও তখন দমকলের প্রবর্তন হয় নাই। তিনি অবিলম্বে যোগীর নিকট ছুটিয়া গিয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে বিপদ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। যোগী দেবদাসজীর দয়া হইল। তিনি শাল মার্চেন্টকে আশীর্বাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুদামের আগুন নিভিয়া গেল। অল্পে রক্ষা পাইল। মাত্র একখানা মূল্যবান শাল পুড়িয়াছে। বাকি সব ভালই আছে। উক্ত মার্চেন্ট প্রকৃতপক্ষে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সাময়িক লোভের বশবর্তী হইয়া অহঙ্কার বশতঃ সাধুসেবা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যোগীর অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তাঁহার শিক্ষা হইল। তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জমায়েত সাধুদের সাতদিন ভোজন করাইলেন। এই ঘটনায় রামদাস বুঝিলেন যোগীদের ক্রোধও অপরের পক্ষে মঙ্গলজনক।

গুরুর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে রামদাস মধ্যপ্রদেশের একস্থানে উপস্থিত হইলেন। উহা নবাবের এলাকা। নবাব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বে শাঁখ বাজান নিষিদ্ধ। হিন্দুরা ধর্মে-কর্মে শাঁখ বাজায়, এই ধর্মে প্রশ্রয় দেওয়া চলিতে পারে না। আইন দ্বারা হিন্দুদের শাঁখ বাজাইবার স্বাধীনতা হরণ করিলেন। তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। ঐ নিষিদ্ধ এলাকায় আসিয়া দেবদাসজী শিষ্য রামদাসকে দূরে রাখিলেন এবং নিষিদ্ধ এলাকায়

গিয়া শাঁখ ফুঁকিলেন। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। আইন-অমান্যকারীকে ধরিবার জন্য সৈন্য ছুটিল। উক্ত স্থানে সৈন্য বীভৎস কাণ্ড দেখিল। যে শাঁখ ফুঁকিয়াছিল সে নাই। কোন লোকের চিহ্ন নাই। একটা খোলা বাক্স পড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে এক মরা মানুষের দেহ, মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। চারিদিকে রক্তের ধারা বহিতেছে। আবার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। তখন মৃতদেহ নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সৈন্যগণ ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। খবর নবাবের কাছে পৌছিলে ব্যাপার স্বয়ং জানিবার জন্য তিনি যথাস্থানে গিয়া দেখিলেন একজন সাধু বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে নবাব বুঝিলেন এই ভূতুড়ে কাণ্ড সাধুরই এবং যোগশক্তির দ্বারা যে এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। অন্যের ধর্মেও সত্য থাকিতে পারে ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল। একদেশী ভাব পরিত্যাগ করিয়া নবাব পূর্বের নিষিদ্ধ হুকুম রদ করিলেন। স্থানীয় লোকেরা সাধুর দৌলতে ধর্ম আচরণে স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া নবাব উক্ত স্থানে হিন্দুর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। আবার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। যোগীর যোগশক্তির প্রভাবে মূর্তিভঙ্গকারী মন্দির নির্মাণ করিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন কালে অনেক বদলায়।

দেবদাসজীর নির্দেশমত শিষ্য রামদাস কয়েক বৎসর কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। গ্রীষ্মের রৌদ্রে ধুনির সামনে, কনকনে শীতের রাত্রে কোন প্রকার কাপড় না জড়াইয়া খোলা গায়ে ধ্যান করিতেন। দেবদাসজী শিষ্যকে অনেক রকম পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন এবং তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে আদেশ দিলেন। গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা না থাকিলেও রামদাস গুরুর আদেশ পালন করিলেন এবং সকল পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইলেন দ্বারকা ধাম হইতে ফিরিয়া গুরুর দেহরক্ষার কথা শুনিয়া রামদাস অত্যন্ত হতাশ হইলেন। দুঃখে এত ম্রিয়মাণ হইলেন যে পাগলের মত হইলেন। চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। খাওয়া নাই, রাত্রে ঘুম নাই। ছট্‌ফট করিতে করিতে ছয় দিন কাটিয়া গেল, সপ্তম দিন গুরু দিব্যদেহে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, 'দুঃখ করিবে না, দুঃখের কোন কারণ নাই। যখনই তুমি প্রয়োজন বোধ করিবে এবং গুরুর স্মরণ করিবে তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে। সাপ খোলস ছাড়িয়া যেমন নূতন খোলস নেয় সেরূপ স্থূল দেহ ত্যাগ হইলেও আমি সূক্ষ্মদেহে বর্তমান'।

রামদাস এখন কাটিয়াবাবা নামে পরিচিত। লম্বা একখানা ভারী কাঠ কোমরে জড়াইয়া রাখিতেন। গুরু দেবদাসজী উপদেশ দিয়াছেন, কঠোর জীবন যাপন করিলে অলসতা প্রশ্রয় পায় না। ভগবৎ ধ্যানে মনকে নিযুক্ত রাখা সহজ হয়। তাঁহারই আদেশে কাটিয়াবাবা পঞ্চধুনি (চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড, উপরে প্রখর সূর্যের তাপ) স্থাপন করিয়া তপস্যায় রত থাকেন, পূর্বেও তিনি ইহা অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে উহা খুব কঠিন নয়। একবার তিনি অনুরূপ পঞ্চধুনির সামনে তপস্যায় রত আছেন, এমন সময় কোন সাধু ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুটে রাখিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন, উদ্দেশ্য ঐ আগুনে কাটিয়াবাবা পুড়িয়া মরিলে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়িবে। সাধুর দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। গ্রামবাসী প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিল। মধ্যখানে ধ্যানরত কাটিয়াবাবার কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দুষ্কর্মকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্যত হইলে কাটিয়াবাবা তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'প্রকৃত দোষী যথাসময়ে শাস্তি ভোগ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই'। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইল। উক্ত অগ্নিপ্রদানকারী ঈর্ষান্বিত সাধু অন্য এক ভীষণ দুষ্কার্যের জন্য ধরা পড়িয়া জেলে গেল। চারিদিকে অগ্নিবেষ্টনের মধ্যেও কাটিয়াবাবা অক্ষত দেহে আছেন দেখিয়া লোকের ধারণা হইল যে যোগীর শরীর জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হয় না।

তখন সিপাই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, লোকের মনে শান্তি নাই। কখন কি হয় ভাবিয়া লোকে সদা শঙ্কিত। এই সময়ে কাটিয়াবাবা যমুনার তীর ধরিয়া যাইতেছিলেন। সামনে একজন সিপাই পড়িল। শত্রুর চর সন্দেহে সিপাই কাটিয়াবাবাকে লক্ষ্য করিয়া চারবার গুলি ছুঁড়িল। প্রত্যেকবারই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল দেখিয়া সিপাইর চেতনা হইল। কাটিয়াবাবার অলৌকিক যোগশক্তির পরিচয় পাইয়া মাথার টুপি খুলিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া সিপাই অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তপস্যা করিলে কোন না কোন দিন তাহার ফল মিলে। ঈশ্বরেচ্ছা এবং গুরুকৃপায় কাটিয়াবাবা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ অনেক শিষ্য জুটিতে লাগিল। ভরতপুরের ব্রাহ্মণ গরীবদাস তাঁহার প্রথম শিষ্য। পরিব্রাজক জীবন শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন ধামে বাকী জীবন ভগবৎধ্যানে কাটাইবেন মনস্থ করিয়া গঙ্গাকুঞ্জের নিকটে যমুনার

ঘাটে এক বটবৃক্ষের তলায় তিনি আসন পাতিলেন। এবং সশিষ্য বাস করিতে লাগিলেন। স্থানীয় লোকেরা কেমন সাধু পরীক্ষা করিবার জন্য রাত্রে এক বিধবা যুবতীকে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য পাঠাইলেন। কাটিয়াবাবা বিরক্ত হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিতে যাইবেন এমন সময় আত্মসংবরণ করিয়া আর কখনও যেন কোন সাধুর পতন ঘটাইবার চেষ্টা না করে বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া বিদায় দিলেন।

কাটিয়াবাবার দয়ার শরীর। পাপী-তাপী ও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইত না। গোঁসাইয়া একজন দুর্দান্ত ডাকাত। না করিয়াছে এমন কোন কাজ তাহার নাই। ১৪ বৎসর জেল খাটিবার পরও তাহার মনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। যমুনার ঘাটে বটগাছের তলায় যেখানে ধুনি জ্বালিয়া কাটিয়াবাবা বসিতেন, সেখানে অনেক লোক আসিয়া জমা হইত। ডাকাত দলের অনেকে তথায় আসিয়া আড্ডা দিত। গাঁজা, চরস্ ইত্যাদি নেশা চলিত। একদিন ডাকাত দলের সর্দার গোঁসাইয়া দলবল সহ তথায় উপস্থিত ছিল। কাটিয়াবাবা দুষ্কৃতকারী ডাকাতির জীবন পরিত্যাগ করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং এমন আশ্বাস দিলেন যে যদি সে প্রকৃতই সৎ হইবার চেষ্টা করে তবে তাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। তিনি কথাগুলি এমন স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন যে গোঁসাইয়ার হৃদয় গলিয়া গেল। দুর্ব্যবহার এবং ঘৃণা যাহা করিতে পারে না, স্নেহ-প্রীতি তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। সদয় ব্যবহার হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে আঘাত দেয়। দুষ্কৃতকারীকেও সৎ কর্মে লিপ্ত করে এবং জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে। তা ছাড়া সময়ের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দুঃসময়ে হৃদয়ের যে তন্ত্রীগুলি বেসুরে বাজে সুসময়ে সেগুলি মধুর তান ধরে। ব্যক্তিত্বের প্রভাবেরও মূল্য আছে। কাটিয়াবাবার স্নেহপূর্ণ কথাগুলি গোঁসাইয়ার হৃদয়ে নূতন স্পন্দন সৃষ্টি করিল। ডাকাতি ছাড়িয়া দিল। সাধুর প্রভাবে ডাকাতের জীবনে পরিবর্তন আসিল। দলের একজন বিশেষতঃ সর্দার কমিয়া গেল দেখিয়া দলের অন্যান্য লোক কাটিয়াবাবার উপর চটিয়া গেল। তাঁহার অনেক গুপ্ত ধন আছে সন্দেহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সামান্য ছুতা নিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল এবং তাঁহার জীবন নাশ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কাটিয়াবাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রেই পুলিস তোমাদের ধরিবে'। ঘটনাও তাহাই হইল। পূর্বকৃত কোন গুরুতর অপরাধের জন্য ডাকাতগণ সেই রাত্রেই ধরা পড়িল। তাহাদের মধ্যে দুইজন বেইলে খালাস পাইয়া কাটিয়াবাবার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তিনি

বলিলেন, যদি তাহারা আর কখনও ডাকাতি করিবে না এবং ভবিষ্যতে দুষ্কর্ম ত্যাগ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল। পরে বিচারে খালাস পাইয়া তাহারা কাটিয়াবাবার ভক্ত হইল। সাধুর সংস্পর্শে ডাকাতের জীবনে পরিবর্তন আসিল। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদের তৃতীয় ডাকাত আপন দুষ্কৃতির জন্ম মোটেই অনুতপ্ত হয় নাই। বিচারে তাহার জেল হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পর কাটিয়াবাবা উক্ত ডাকাতকে শৃঙ্খলমুক্ত কয়েদীরূপে রাস্তায় পাথর ভাঙিতে দেখিতে পাইলেন। কাটিয়াবাবাকে দেখিবামাত্র ডাকাত কয়েদী হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এবং বার বার তাঁহার কৃপা ভিক্ষা চাহিল। সাধুর রাগ জলের দাগ। হৃদয় কোমল। দয়ার বশবর্তী হইয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন যে সে তিন দিনের মধ্যে মুক্তি পাইবে। কয়েদীর আপিল ডিসমিস হইয়াছে। স্বপ্নেও মুক্তির কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, কোন অজ্ঞাত কারণে তৃতীয় দিনে কয়েদী মুক্তি পাইল। সারা জীবন সে কাটিয়াবাবার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। এই ভাবে সাধুর সংস্পর্শে ডাকাতদের জীবনে পরিবর্তন আসিল। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ —কথার সার্থকতা প্রমাণিত হইল।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় হাজার হাজার বৈষ্ণব সাধুর সমাগম হয়। অন্যান্য সাধুদের ন্যায় তাহাদেরও ছাউনি পড়ে, জমায়েত হয়। ঐ সময়ে সমস্ত বৈষ্ণবদের যথা, শ্রী সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায়, গৌড়ীয় সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সভায় কাটিয়াবাবা বৈষ্ণব সমাজের অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেক। সুষ্ঠুভাবে সম্প্রদায় পরিচালনা, বৈষ্ণবদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রচার করা প্রভৃতি দায়িত্ব তিনি ভালভাবে পালন করেন।

একবার তিনি শিষ্য গরীব দাসকে নিয়া ভরতপুর হইতে বৃন্দাবনে ফিরিতেছেন। সঙ্গে দুই সের পরিমাণে চরস ছিল। আইন অনুযায়ী এত অধিক পরিমাণ মাদক দ্রব্য সঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ। চোরাকারবারী সন্দেহে পুলিস গুরু এবং শিষ্য উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল। কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত মাদক দ্রব্য কি হইবে'? উত্তরে কাটিয়াবাবা বলিলেন, 'উহাতে মাত্র দুই দিন চলিবে'। কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ম তিনি কোর্টেই অর্ধেক পরিমাণ মুখে পুরিয়া দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়া নিঃসন্দেহ হইয়া শিষ্যসহ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন এবং ভবিষ্যতে মাদক দ্রব্য আইন তাঁহার জন্ম

প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া হুকুম জারি করিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া কাটিয়াবাবা গঙ্গাকুঞ্জের পাট উঠাইয়া দিলেন। কেমার বনে একটা বড় বাগান-বাড়িতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইল। উহা কুলিয়া আশ্রম নামে পরিচিত হইল। কাটিয়াবাবার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার ভালবাসা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আশ্রমের সাধুদের যেমন যত্ন করিতেন তেমন আশ্রমের গাইটার যত্ন নিতেও কখন ভুলিতেন না। পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহার অযত্ন হয় এইজন্য এলাহাবাদ কুম্ভে যখন যাইতেন তখন গাইটাকেও সঙ্গে নিয়া যাইতেন। এলাহাবাদের কনকনে শীতের রাতে গাইটার গায়ে নিজের কম্বলটি জড়াইয়া দিয়া নিজে খালি গায়ে রাত্রি কাটাইতেন। এই ভাবে তিনি নিজ জীবন দ্বারা শিষ্যদের দেখাইতেন যে কাহাকেও অযত্ন করিতে নাই। পশুরও শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ বোধ আছে। সুতরাং সকলকে যথাযথ সেবা করা সাধুর কর্তব্য।

কোমল হৃদয় কখন কখন কঠিন হইতেও দেখা যায়। অন্যের প্রতি তিনি কোমল ভাবাপন্ন ছিলেন সত্য কিন্তু নিজ শিষ্যের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অন্যরূপ দেখা যাইত। তিনি মনে করিতেন সন্ন্যাসের আদর্শ বজায় রাখিতে হইলে কঠোর জীবন যাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আদর্শকে কখনও ছোট করিতে নাই। অহমিকা সম্পূর্ণ দূর করিতে না পারিলে এই আদর্শের মর্ম বুঝা যায় না। আদর্শের কঠোরতা রক্ষা করিতে গিয়া কখন কখন শিষ্যদের প্রতি তাঁহার হৃদয়-হীনতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কঠোরতা এবং হৃদয়হীনতার পিছনে তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। বাহিরের কার্যকলাপ দেখিয়া মহাপুরুষের বিচার করিতে গেলে অনেক সময় ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে। দোষ গুণ নিয়া মানুষ, মহাপুরুষও মানুষ। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের কোন কার্য দোষের বলিয়া মনে হইলেও সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। শিষ্য প্রেমদাস্ গুরুর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইয়া অভিমানভরে গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন। বহু দুঃখ পাইয়া পরে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আবার ফিরিয়া আসেন। বাহিরে বৈষ্ণববিরোধী শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার মাথা বিগড়াইল, পাগল হইয়া গেলেন। অন্যান্য সাধুদের বিশেষ অনুরোধে কাটিয়াবাবা তাঁহাকে আবার আশ্রমে স্থান দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন অত্যধিক গাঁজা সেবনের ফলে প্রেমদাসের মাথা গরম হইয়া উঠে। শোধরাইবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রেমদাসকে বারো বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশবাক্য

উচ্চারিত হইবামাত্র প্রেমদাসের বাক্য বন্ধ হইল। চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিতেন না। একবার তাঁহাকে সাপে কামড়াইল। বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিলেও কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অবশ্য ভগবান এবং গুরুর কৃপায় সাপের বিষ প্রেমদাসের শরীরে গেল না। তিনি সারিয়া উঠিলেন। বারো বৎসর গত হইলে শিষ্যের মৌনব্রত উদ্‌যাপনের সাফল্যের জন্য গুরু কাটিয়াবাবা এক বিরাট ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করিলেন। প্রেমদাসের মুখে কথা ফুটিল। এই ঘটনার পর প্রেমদাস সকলের নিকট মৌনীজি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

কাটিয়াবাবার বহু শিষ্য ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তিনিই পরে সাধু হইয়া সন্তদাস বাবাজী নামে বিখ্যাত হন এবং বৈষ্ণব সমাজের নেতা হন। গুরুর উপদেশমত উক্ত তারাকিশোর চৌধুরী পূর্ব অভ্যাস বশতঃ ধ্যানের প্রশস্ত সময় শেষ রাত্রে ধ্যান করিতে পারিতেন না। একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেলে তিনি শুনিতে পান কে যেন তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, 'শীঘ্র উঠ ভগবানের ধ্যান কর'। সঙ্গে সঙ্গে মশারির মধ্যে কয়েক টুকরা পাথর পাইলেন। এই ঘটনার পর তারাকিশোর চৌধুরী আব কখনও গুরুর আদেশ অমান্য করিতে সাহস পান নাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ সময়ে ধ্যানের অভ্যাস রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনাতে বুঝা যায় শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে কাটিয়াবাবা কত সচেতন ছিলেন। আর একবার তারাকিশোর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। কিছুতেই জ্বরের বিরাম হয় না। শিষ্য জানিতেন তাঁহার গুরু কাটিয়াবাবা গাঁজা সেবন করিতেন। তিনিও যদি গুরুর উদ্দেশ্যে গাঁজা নিবেদন করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করেন তবে তাঁহার রোগমুক্তি হইবে। কার্যতঃ তাহাই হইল। গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গাঁজা সেবন করিয়া তিনি সুস্থ হইলেন, জ্বর ছাড়িয়া গেল। তাঁহার ধর্মপত্নী অন্নদা দেবীর ধারণা ছিল যে গুরু তাঁহাদের চোর ডাকাত এবং শত্রুর হাত হইতে এবং সব বিপদ হইতে রক্ষা করেন। কয়েকটা এমন ঘটনা ঘটিল। যখন তাঁহারা অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই সময়ে অদ্ভুত উপায়ে বিপদমুক্ত হওয়াতে তাঁহাদের পূর্বধারণা বদ্ধমূল হইল, এবং গুরুভক্তি বৃদ্ধি পাইল।

কাটিয়াবাবা কখন কখন এমন কাজ করিতেন যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত। একদিন কোন উৎসব উপলক্ষে বহু সাধু ভোজন করাইবার পরও খাদ্য উদ্বৃত্ত হইল। পরে অনেক সাধু উপস্থিত হইলে

তিনি নির্মমভাবে তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন। শিষ্যেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ সাধুদের খাইতে দিলেন না। সাধুরা চলিয়া গেলে কাটিয়াবাবা শিষ্যদের বুঝাইলেন যে উহারা প্রকৃত সাধু নয়, রাত্রে প্রকৃত সাধু আসিবে, কাটিয়াবাবার কথা সত্য হইল। কিছুক্ষণ পরে অনেক সাধু উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন।

আশ্রমে একজন কঠিন হাঁপানী রোগগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকিতেন। কাটিয়াবাবা দয়া করিয়া তাঁহাকে একটা শর্তে আশ্রয় দিয়াছিলেন—তিনি বাকী জীবন ভগবৎ ধ্যানে কাটাইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শর্ত রক্ষা করিলেন না। আড্ডা দিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন। কাটিয়াবাবা কত বুঝাইলেন, সৎ চিন্তায় সময় অতিবাহিত না করিয়া যে বৃথা সময় নষ্ট করে এবং ইন্দ্রিয় সুখের পিছনে ঘুরে তাহার জীবন বন্ধ্যা নারীর তুল্য। ঐ রকম জীবন কাম্য নয়। কিন্তু উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংস্কার এমন যে তিনি কিছুতেই কাটিয়াবাবার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য কাটিয়াবাবা একদিন কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। সাধুর কোপও অন্যের মঙ্গলের জন্য। ফল ভালই হইল, ব্রাহ্মণের চেতনা হইল। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শোধরাইবার চেষ্টা করিলেন। কাটিয়াবাবা বলিতেন, হাতীর যেমন দুই রকম দাঁত থাকে একটা বাহিরের, একটা ভিতরের—সাধুরও তাই। একটা দেখাইবার, অন্যটা ব্যবহারের। বাহিরের ব্যবহার দ্বারা সাধুর সম্বন্ধে বিচার করিবে না।.........

......কাটিয়াবাবার বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময় মনে হইত তিনি গৃহস্থদের ন্যায় ভয়ানক কৃপণ। সব সময় লাভ-লোকসান খতান। কখন কখন অকারণে উগ্রমূর্তি ধারণ করেন, গাঁজা সেবন করেন, কখন কখন আড্ডা দেন। কিন্তু বাহিরের ব্যবহার ঐরূপ হইলেও তাঁহার হৃদয় ভক্তদের দুঃখে সদা বিচলিত হইত, এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিতে সর্বদা সচেষ্টা থাকিতেন।

কোন বিষয়ে আতিশয্য ভাল নয়। তীব্র কঠোরতা যেমন বিপদ আনে অত্যধিক দয়াও তেমন বিপদ আনে। পুষ্কর দাস আশ্রমের পাচক। বিগ্রহ সেবার ভোগ রান্না করে। মোহন্ত এবং অন্যান্য সাধুদের সেবা করে। এত সেবা করিয়াও তাহার মন পবিত্র হয় নাই, সে অত্যন্ত লোভী। তাঁহার মাথায় খেয়াল চাপিল বিষপ্রয়োগে যদি কাটিয়াবাবার জীবন নাশ করা যায় তবে ঐ টাকা তাহার হইবে। একদিন পুষ্কর দাস সত্য সত্যই কাটিয়াবাবার খাদ্যে বিষ মিশাইল।

ইহা জানাজানি হইলে আশ্রমবাসীরা পাচককে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কাটিয়াবাবার দয়ার হৃদয়। তিনি গরীব পাচক ব্রাহ্মণকে পুলিসে দিতে রাজী হইলেন না। কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তাহাকে দুইবার ক্ষমা করিলেন। কাটিয়াবাবার ধারণা মানুষ কর্মফলে কষ্ট পায় এবং ভগবৎকৃপায় রক্ষা পায়। অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাটিয়াবাবার কোমল হৃদয়ের সুযোগ নিল। পাচকের আবার দুর্বুদ্ধি ঘটিল। কাটিয়াবাবার খাদ্যে আবার সেঁকো বিষ দিল। এইবার যখন জানাজানি হইল, বাধ্য হইয়া পাচককে তাড়াইতে হইল। কাটিয়াবাবার বয়স হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে বিষের প্রক্রিয়া সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল।

সকলের কল্যাণ কামনা কাটিয়াবাবার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজাকে যেমন সম্মান দেখাইতেন সামান্য দারোয়ানকেও সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। অধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর হইতে তিনি জগৎকে দেখিতেন। তিনি মনে করিতেন সবই তাঁহার লীলা। ভাল মন্দ সবই তাঁহার চোখে সমান, শরীর অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তিনি বুঝিলেন দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তিনিও প্রস্তুত। ১৯০৯ সালের ৮ই মাঘ কাটিয়াবাবা মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

॥ তেত্রিশ ॥

ভগবানদাস বাবাজী

শুদ্ধাভক্তির বীজ যেখানে পড়ে সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে। ইহা সময় সাপেক্ষ কিন্তু শুকায় না। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে বীজ ছড়ান কালে তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া বহু সুমিষ্ট ফল প্রদান করে। বাংলা এবং উড়িষ্যার বহু উত্তরসাধক এবং মহাপুরুষ এই বৃক্ষের ফল। তাঁহারা ভক্তিপথের পথ-প্রদর্শক, বৈষ্ণব ধর্মের নেতা, ত্যাগ, তপস্যা এবং জীবন দ্বারা ভক্তির প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সমাজ তাঁহাদের নিকট ঋণী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এমন একজন মহাপুরুষের কথা জানা যায় যাহাকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রোপিত ভক্তিবৃক্ষের ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার নাম ভগবানদাস বাবাজী। উড়িষ্যা প্রদেশের কোন সুদূর পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জন্মবিবরণ, সাল, তারিখ, পিতৃপরিচয় পাওয়া কঠিন। কোন্ গ্রামে, কোন্ বংশে জন্ম, কাহার ঘরে প্রতিপালিত, কি পরিবেশে থাকিয়া শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন, এবং পূর্ব জীবনের অন্যান্য ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। সাধুরা অনেক সময় পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করিতে চান না। আবার অনেকে অতি ছোট বেলাতেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসেন বলিয়া পূর্বাশ্রমের কথা ভুলিয়া যান। তবে যে বংশেই ভগবানদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করুন না কেন তিনি যে সদ্‌বংশে শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা অনুমান করা যায়। কারণ পিতামাতা সৎ এবং ধর্মপরায়ণ হইলে সৎ পুত্র লাভ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম। কখন যে দেবতা মৃদু বাঁশী বাজাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছেন, চুপি চুপি হৃদয়ে আসন পাতিয়াছেন এবং ধর্মপথে টানিয়া আনিয়াছেন বলা কঠিন। জন্মান্তরের সুকৃতিই যে অজ্ঞাত বালককে প্রগতিশীল ভক্তিবাদের প্রবল তরঙ্গে ভাসাইয়া নিয়াছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

পথ চলিতে পাথেয় দরকার। গুরুকরণ পাথেয়, তাঁহার কৃপা পথের সম্বল, অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র, ভবসাগরে পাড়ি দিবার ভেলা, সদ্‌গুরুই ধর্ম-জীবন যাপনে প্রধান সহায়ক। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে সদ্‌গুরু মিলে। বালকের কপাল ভাল। ভক্তিনদীতে স্নান করিয়া ধন্য হইল। স্ফুরণোন্মুখ শুভ সংস্কার তাহাকে পথ দেখাইল। বৃন্দাবনে আসিয়া সদগুরুর সন্ধান পাইল। গোবর্ধনে কৃষ্ণদাস বাবাজী তখন ভগবৎ আরাধনায় ডুবিয়া থাকেন। ভক্তির মন্দাকিনিতে অবগাহন করিয়াছেন এবং তপস্যার আগুনে সিদ্ধ হইয়াছেন। মহাপুরুষ হিসাবে তাঁহার খুব নাম। মহান্ হৃদয় সাধারণতঃ কোমল হয়। ভগবৎ-সেবা এবং ভক্ত-সেবা তাঁহাদের ব্রত। আধ্যাত্মিকতা দান দ্বারা যে সেবা হয় তাহা শ্রেষ্ঠ সেবা। বিদ্যাদান অন্নদানও সেবা বটে তবে তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। শ্রেষ্ঠ সেবার অধিকারী সকলে হইতে পারে না। যিনি এই আধ্যাত্মিকতা ধনে ধনী একমাত্র তিনি এরূপ সেবা করিতে পারেন। কৃষ্ণদাস বাবজী নবাগত ধর্মপিপাসুকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আশ্রয় দিলেন। শিষ্যের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে জানিয়া তাহার জন্য আধ্যাত্মিকতার কবাট উন্মুক্ত করিলেন।

নবাগত উত্তম অধিকারী, উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। গুরুর তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে শিষ্য কঠোর তপস্যা এবং গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। নিত্য ধ্যান অভ্যাস এবং শাস্ত্রপাঠের ফল আছে। উহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি সহজ হয় এবং শাস্ত্রাদিতে

ব্যুৎপত্তি জন্মে। নবাগত প্রকৃত ধর্মপিপাসু। ঈশ্বর-ইচ্ছা এবং গুরুর কৃপায় তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ দেখা গেল। শিষ্যের চালচলন, অধ্যাত্মিক ব্যবহার. গভীর শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী অতিশয় প্রীত হইয়া শিষ্যকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনায় থাকিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। কারণ কালনা বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। শিষ্যের ত্যাগ, তপস্যা এবং আদর্শ জীবন ভক্তির ধারা অব্যাহত রাখিবে।

ভগবানদাস বাবাজীর জীবনবেদের প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও পরের অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। তিনি কালনাতে থাকিয়া নিত্য জপ, ধ্যান, শাস্ত্র পাঠাদিতে নিরত থাকেন। ধর্মানুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই। ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মধু আহরণের আশায় মৌমাছি আসিয়া জুটে। তাঁহার সুনাম ছড়াইলে ক্রমশঃ আশ্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। একদিন আশ্রমে ধ্যান শেষ করিয়া চক্ষু অর্ধ উন্মিলিত অবস্থায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বর্ধমানের মহারাজা সাধুদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে পদার্পণ করিবামাত্র স্বকর্ণে যাহা শুনিলেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বাবাজী বলিতেছেন, 'এটাকে তাড়িয়ে দাও, নির্মমভাবে প্রহার করে তাড়িয়ে দাও।' কথার তাৎপর্য মহারাজার বোধগম্য হইল না। কোথায়, কাহাকে কি জন্য তাড়াইতে আদেশ দিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনের কোণে সন্দেহ জাগিল। তিনি সংসারী লোক, হয়ত সংসারী লোকের সংস্পর্শ বাবাজীর মনঃপূত হয় নাই। সেইজন্যই কি নির্মমভাবে মেরে তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিতেছেন! কিছুক্ষণ পরে বাবাজী আবার গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। মহারাজার মনের ভাব বদলাইল। যিনি এইমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া অন্যকে তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিতেছেন তাঁহার পক্ষে পরক্ষণে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং বাবাজীর কথার তাৎপর্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। উহার রহস্য ভেদ করিতে হইবে, তিনি ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বাবাজীর মন সাধারণ ভূমিতে নামিলে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম—এটাকে মেরে তাড়িয়ে দাও—আমার আগমনের সঙ্গে এ কথার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা দয়া করিয়া বলুন।' মহারাজার কথা শুনিয়া বাবাজী বলিলেন, 'আপনি কখন আশ্রমে আসিয়াছেন জানি না। বৃন্দাবনে গোবিন্দের সেবায় তুলসী লাগে। একটা ছাগল ঐগুলি মুড়াইয়া খাইতেছে দেখিয়া আমি সেবককে ছাগলটিকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিতেছিলাম। তবে আমার ঐরূপ বলায় আপনার মনে দুঃখ

হইয়াছে জানিয়া আমি দুঃখিত হইলাম'। কথা শুনিয়া মহারাজ স্তম্ভিত হইলেন। বাবাজী কালনা আশ্রমে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন ঠিক ঐ সময়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরস্থ তুলসী ছাগলে মুড়াইয়া খাইবার দৃশ্য কি করিয়া দেখেন! ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়! হইতে পারে বাবাজীর যোগদৃষ্টি আছে। যোগদৃষ্টিতে বৃন্দাবনের কথা জানেন, যোগীর পক্ষে উহা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যোগদৃষ্টি কিংবা বাবাজীর মাথার খেয়াল কিংবা অন্য কিছু তাহা জানিবার জন্য এবং তাঁহার কথার সত্যতা নির্ধারণ করিবার জন্য মহারাজ বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট তার করিলেন। উত্তরে যখন জানিলেন যে ঘটনা সত্য তখন মহারাজের যোগশক্তিতে বিশ্বাস হইল এবং বাবাজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইল।

সিদ্ধ পুরুষের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ভগবানদাস বাবাজীর জীবনেও অনুরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। আশ্রমে নিত্য বিগ্রহ সেবা হয়। নিয়ম ছিল বিগ্রহকে ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উহা গ্রহণ করিতেন না। কাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। দেখা যাইত কোথা হইতে একটা বিষধর সর্প ধীরে ধীরে আসিয়া উক্ত প্রসাদের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আবার চুপি চুপি চলিয়া যাইত। সর্পটি চলিয়া গেলে বাবাজী উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। একদিন কোন ভক্ত বিষধর সর্পটিকে ঐরূপে চুপি চুপি আসিতে দেখিয়া লাঠি দিয়া উহাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বাবাজী ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি ভক্তকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, 'অনন্তদেবই ঐরূপ আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উহাকে তাড়ান ঠিক হয় নাই। ভবিষ্যতে কখনও উহাকে ঐরূপ তাড়া করিবে না'। অনন্তদেবকে এই ভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার মনে যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা তিনি বহুকাল যাবৎ ভুলিতে পারেন নাই। কখন কখন দেখা যাইত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বাবাজী গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন দর্শন হইত ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন। আবার কখন কখন এমন হইত, রাত্রে সকলে খাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন—ঘরে কোন প্রকার খাদ্য নাই, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। তিনি হঠাৎ ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া সেবক দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া তাঁহার সামনে রাখিতেন। বাবাজী ইষ্টকে নিবেদন করিয়া তবে উহা গ্রহণ করিতেন।

প্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ। মনে কোন প্রকার অহমিকার উদয় না হয় এই জন্য বাবাজী আপনাকে গড়িয়া তুলেন এবং বাস্তব জীবনে যাহাতে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারেন তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। একবার ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক এবং সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কালনা আশ্রম দর্শন করিতে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। বাবাজী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অন্য চক্ষে দেখেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু আশ্রমের অন্যান্য সন্তেরা বিজয়কৃষ্ণকে সে চোখে দেখিলেন না। তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইলেন না। বাবাজীর চোখে ইহা বিসদৃশ ঠেকিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে কেহ কেহ বিরূপ সমালোচনা করিতেছে দেখিয়া তিনি ঐরূপ সমালোচনা হইতে বিরত থাকিতে তাঁহাদের সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। বাবাজীর বিনয় ব্যবহারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অতিশয় চমৎকৃত হইলেন।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে। ধীরে ধীরে বাবাজীর সুনাম চারিদিকে ছড়াইল। দূর দূর দেশ হইতে বহু ভক্ত তাঁহার দর্শন এবং মধুর কথা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। তিনিও উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলীকে যথাসাধ্য সৎ উপদেশ দানে কৃতার্থ করিতেন। ভাব, ভক্তি, ত্যাগ এবং তপস্যা বলে তিনি বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং সমাজে আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

একবার আশ্রম বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি যায়। আশ্রমের অধিবাসীরা পুলিসের সাহায্য নিয়া উহা উদ্ধার করিবার জন্য বার বার বাবাজীকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই পুলিসের হাঙ্গামায় যাইতে রাজী হইলেন না এবং অন্যদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, বিগ্রহ হয়ত অলঙ্কার পরিবেন না। সেইজন্য উহা খোয়া গিয়াছে, যখন ইচ্ছা হইবে তখন আবার আসিবে এবং অলঙ্কার পরিবার সাধ মিটিবে। এখন কিছুকাল বিনা অলঙ্কারে থাকিলে বিগ্রহ অসন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি ভক্তি চান। অলঙ্কার নয়। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার সেবা করেন তাঁহার নিকট সামান্য অলঙ্কার তুচ্ছ। প্রকৃত ঘটনা অনেকের জানা ছিল না, সেইজন্য পুলিসের সাহায্যে অলঙ্কার উদ্ধার করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আশ্রমের পূজারীই লোভের বশবর্তী হইয়া অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল। অনেকদিন পরে পূজারী অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বিগ্রহের অলঙ্কার ফেরত দিয়া বাবাজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বাবাজীর মনে বিদ্বেষ

নাই, তিনি পূজারীকে ক্ষমা করিলেন। এবং পূজারীকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনেকে অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে আবার পূজারীর পদে বহাল রাখিলেন। বাবাজীর কাণ্ড দেখিয়া অনেকে অবাক হইলেন। তিনি অন্যদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'এখন বোধ হয় বিগ্রহের আবার অলঙ্কার পরিবার সাধ হইয়াছে তাই অলঙ্কার ফেরত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'।

আশ্রমের সাধু বিষ্ণুদাস একবার খুব জ্বরে আক্রান্ত হন, জ্বর বিরতির কোন লক্ষণ নাই, তিনি কিছুতেই ঔষধ খাইতে চান না, তাঁহার ধারণা ভগবৎ-ইচ্ছায় রোগ আপনি সারিয়া যাইবে, ঔষধ সেবনের কোন প্রয়োজন নাই। বাবাজী তাঁহাকে বার বার বুঝাইলেন যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিয়মমত ঔষধ এবং পথ্য গ্রহণ করা শ্রেয়। অসুখ হইলে ঔষধের দ্বারা আরোগ্যের ব্যবস্থা ভগবান যখন করিয়াছেন তখন তাঁহাকে ভক্তের রোগ সারাইবার জন্য কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া রোগীর ভাব দেখানো উচিত নয়। পরে নিয়মমত ঔষধ সেবন করিয়া তিনি সারিয়া উঠিলেন।

তাঁহার ব্যবহার কখন কখন অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হইত। একবার তাঁহার মাথায় খেয়াল চাপিল, পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার মধ্যখানে একটা উচ্চ মাচা তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর বসিয়া ধ্যান করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী পুষ্করিণী খনন প্রায় শেষ হইয়াছে। একদিন উহার মধ্যে একটি বাছুর পড়িয়া মারা গেল, খবর শুনিবামাত্র বাবাজী পুকুর ভরাট করিবার জন্য হুকুম দিলেন। আশ্রমের সাধুরা কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে জ্বালানি কাঠ কিনিতেন এবং বাজার দর অনুযায়ী তাহাকে দাম দিতেন। একদিন উক্ত মেয়েকে কাঠ বিক্রয় করিয়া অনেক পোষ্য পালন করিতে হয় জানিয়া বাবাজী মেয়েকে বাজার দরের ডবল দাম দিতে বলিলেন। অবশ্য তাঁহার আদেশ অনুযায়ী তাঁহাকে ডবল দাম দেওয়া হইল কিন্তু সব সময় ঐ মেয়েটি বাবাজীর সামনে না পড়ে তার ব্যবস্থা করিতেন।

নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী উঁচুদরের সাধক, একটা মন্দিরের নিকটে এক কুটীরায় থাকিয়া বিগ্রহ সেবা করেন, ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রত্যেকে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিয়া চলেন। একবার ভগবানদাস বাবাজী নবদ্বীপ মন্দির দর্শনে আসিলেন। মন্দির পরিষ্কার করিতে করিতে হঠাৎ দলবল সহ ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিয়া চৈতন্যদাস বাবাজীর ভয় হইল যে তাঁহারা জোর করিয়া মন্দিরের বিগ্রহ লইয়া যাইবেন। তিনি তাঁহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিলেন।

ভগবানদাস বাবাজী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মিষ্ট-কথায় বুঝাইলেন যে বিগ্রহ লইয়া যাইবার কল্পনা তাঁহার স্বপ্নেও কখন জাগে নাই। পরে টিট্‌কারি দিয়া বলিলেন যে তিনি (চৈতন্যদাস বাবাজী) যেন বিগ্রহের ভাল করিয়া সেবা করেন। সেবার ত্রুটি হইলে বিগ্রহ অভিমান করিয়া নবদ্বীপ হইতে কালনায় চলিয়া যাইবে। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার এড়ান যায়। চৈতন্যদাস বাবাজীর হৃদয় গলিয়া গেল, অবিলম্বে ভক্তিগদগদ স্বরে ভগবানদাস বাবাজীকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অনর্গল ধারা বহিতে লাগিল। সমবেত ভক্তেরা দুই বাবাজীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইলেন। উভয়ের মধ্যে যে কি ভাবের আদান-প্রদান হইল তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করিবার জন্য কালনা আশ্রমে গমন করেন। তখন তিনি খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন, শয্যাগত থাকেন। মহাপুরুষের আগমনে আশ্রমে একটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে অনুভব করিয়া বাবাজী বলিলেন, 'আশ্রমে কোন মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে'। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল, ভাবের আদান-প্রদান হইল। বাবাজীর বয়স হইয়াছে। শরীরও জীর্ণ হইয়াছে। পারের ডাক আসিয়াছে। তিনি প্রস্তুত, এক শুভদিনে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্মরণার্থ এখন কালনা আশ্রমে তাঁহার ফটো রাখা হইয়াছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

জীব গোস্বামী

জীবনের শ্রেয়বোধের দিকে মনকে আকর্ষণ করা প্রতিভার ধর্ম, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সাধারণতঃ বিশ্বমনা হন, ত্যাগ তাঁহার আদর্শ। দেশ-কালের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ছাড়াইয়া তিনি সকলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেন। ত্যাগের মূলমন্ত্র যিনি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করেন তিনি বিশিষ্ট নায়ক, লোকোত্তর মহাপুরুষ। তাঁহার শিক্ষায় থাকে প্রগাঢ় জীবনবোধ, অকপট আদর্শানুরাগ, স্বচ্ছ সরলতা, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, এবং গভীর সত্যপ্রীতি। তিনি দেশের, ধর্মের, সমাজের গৌরব। তিনি নমস্য।

চন্দ্রদ্বীপ রাজা কন্দর্পনারায়ণের জমিদারির অন্তর্গত। বরিশাল জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপ্রধান এই বিখ্যাত স্থানটি শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। রূপ, সনাতন এবং বল্লভদেব তিন সহোদর এই স্থানের বিশিষ্ট অধিবাসী। শুধু বিদ্যা এবং বুদ্ধির জন্য যে এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের খ্যাতি ছিল তা-নয়, তাঁহারা গৌড়ের নবাবের অধীনে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পার্থিব জগতে প্রতিপত্তি ব্যতীত ধর্মজগতেও তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ পায়। তাঁহারা প্রেম-ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সব রকম সুযোগ-সুবিধা, অর্থ, সম্পদ, রাজ-সম্মান তাঁহাদের ছিল। এত প্রাচুর্যের মধ্যে বর্ধিত হইয়াও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রেম ভক্তি ভালবাসা মনুষ্যত্ব হইতে তাঁহারা কখনও চ্যুত হন নাই। ভক্তি-জগতে তাঁহাদের অবদান অপরিমেয়। প্রবন্ধোক্ত জীব গোস্বামী এই সম্ভ্রান্ত বংশের সুযোগ্য সন্তান। পিতা বল্লভদেব নবাবের খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত। তাঁহারাও মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ এবং ভক্তিবাদের শক্তিশালী স্তম্ভ। তাঁহাদের অবদান অপরিমেয়। পিতা বল্লভদেব শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। অন্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি তাঁহার ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনা ছাড়েন নাই। এরূপ অনন্য ভক্তির তুলনা মিলে না। সেইজন্য তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার নাম অনুপম রাখেন। পিতা অনুপম গৌড় দেশ হইতে পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে যান। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাভূমি হইতে ফিরিবার পথে তিনি মারা যান। তখন পুত্র জীবের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। নিতান্ত বালক হইলেও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা অনুপমের বৈশিষ্ট্য এবং জ্যেষ্ঠতাত রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর সদ্‌গুণরাশি প্রাপ্ত হন। তাঁহার মধ্যে যে বৈষ্ণব ধর্মের সুপ্ত নেতৃত্ব এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটবেলা হইতে তাঁহার ভক্তিধারার স্ফুরণ দেখা যায়। খেলাধূলা, কাপড় পরা, এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে বৈষ্ণব ভাব প্রকাশ পাইত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন সাধক যেমন আপনাকে উপযুক্ত করিয়া তুলেন তিনিও সেইরূপ আপনাকে গড়িয়া তুলিলেন। ইহাতে মনে হয় তিনি ছোটবেলা হইতে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহার শারীরিক গঠন, রং, চেহারা এত সুন্দর ছিল যে লোকে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহার ভাসা-ভাসা চোখ, উন্নত নাসা সবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিত। অল্পবয়সে স্বাধীন চিন্তা তাঁহার ভাবী মহত্বের পরিচায়ক। জীবের মহা সৌভাগ্য যে তিনি যখন দুই বৎসরের শিশু ছিলেন তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে

কোলে করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে যান। মহাপ্রভু বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া আশ্বাস দেন এবং খুব আশীর্বাদ করেন। সম্ভবতঃ অবতারের আশীর্বাদে জীব গোস্বামী কালে স্বনামধন্য হন।

ব্রাহ্মণ সন্তান। বিদ্যাভ্যাস অবশ্য করণীয়, সংস্কৃত টোলে ভর্তি হইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্র শেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপ আসিলেন। নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ বিদ্যার কেন্দ্র, মা সরস্বতীর লীলাস্থান। উচ্চ সংস্কৃতির গবেষণাগার। মহপ্রভুর জন্মস্থান, ভক্তিধারার উৎস। জীব শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। অধ্যাত্ম জ্ঞান দ্বারা জীবনের পূর্ণতা লাভ করিবেন, আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া ত্যাগ ব্রত অবলম্বন করিবেন এবং জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ তাহার জন্য মন প্রাণ ঢালিয়া দিবেন সংকল্প করিলেন।

সংকল্প কার্যে পরিণত করার সুযোগও জুটিয়া গেল, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দ তখন দলবল নিয়া খড়দহ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীবাস জীবকে নিত্যানন্দের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। অতঃপর গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়া জীব মহাপ্রভুর আদিলীলার স্থানসমূহ দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলেন এবং তীর্থ পরিক্রমা শেষ করিয়া তাঁহার অন্ত্যলীলার স্থান দর্শন মানসে নীলাচলে গেলেন। এইখানে মহাপ্রভু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভগবৎ ভাবে বিভোর ছিলেন। এই তীর্থ পরিক্রমা যেমন তাঁহার ব্যক্তিজীবনে অধ্যাত্ম জীবনের সহায়ক হইয়াছিল সেরকম বৈষ্ণবদের সমাজ জীবনের জন্যও নূতন জ্ঞানের আলো আনিয়াছিল। ইহার পর জীব অবধূত নিত্যানন্দের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন এবং মহাপ্রভুর মধ্যলীলার স্থান বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। তীর্থ দর্শন ব্যতীত হয়ত অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। উত্তর ভারতে মহাপ্রভুর ভাব বিস্তারের জন্য উহাই উপযুক্ত স্থান। তীর্থস্থানে থাকিয়া মহান দায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাঁহাকেও উপযুক্ততা অর্জন করিতে হইবে। ভবিষ্যতে বৈষ্ণব সমাজের পথিকৃৎ হইবার সম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। ঐ সম্ভাবনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে পথের কণ্টক দূর করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তই দ্বৈত দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাপ্রভুর প্রচারিত দ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ সম্যক্ যুক্তি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে হইবে। উহা না জানিলে তাহাকে নিরস্ত করা এবং নিজমত (দ্বৈত মত) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

সেইজন্য জীব অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য পবিত্র তীর্থ বারাণসীতে আসিলেন। বারাণসী শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র—অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার ক্ষেত্র। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শিরোমণি, অদ্বৈত সিদ্ধিগ্রন্থ প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতীর নিকট জীব পাঁচ বৎসর অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন। অবশ্য গুরুর নিকট শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডন এবং দ্বৈত মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুরু মধুসূদন উদার, শিষ্যের গোপন উদ্দেশ্য জানিয়াও তাঁহাকে শিক্ষা দিতে বিরত হন নাই। ইহাতে তাঁহার স্বমতে দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অসাধারণ ধৈর্য সহকারে অদ্বৈত বেদান্ত আয়ত্ত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্র তৈয়ার হইলে জীব মানসতীর্থ বৃন্দাবনে পৌছিলেন। তখনকার দিনে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি। মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার এবং বৈষ্ণব আদর্শ স্থাপনের জন্য অশেষ শ্রম স্বীকার এবং কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের খুব সুনাম। জীব অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্জনের জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বংশের দুলাল ভগবান লাভের মহান্ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্নেহবশতঃ যথাসাধ্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

নবাগত যুবকের ভক্তি, ত্যাগ, তপস্যা, শাস্ত্রে প্রীতি, ইষ্টনিষ্ঠা, মধুর ব্যবহার, শ্রীকৃষ্ণ সেবায় অশেষ আগ্রহ, মনোমুগ্ধকর রূপ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস গোস্বামী এবং অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব জীবের পাণ্ডিত্যে এবং ভক্তিনিষ্ঠায় চমৎকৃত হন। ঐ সময়টা বৈষ্ণব সমাজের স্বর্ণযুগ। এত অধিক সংখ্যক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের সমাবেশ আর কখন হয় নাই। বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র এই বৃন্দাবন হইতে ভক্তি ও জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

সনাতন গোস্বামীর পরামর্শ অনুসারে রূপ গোস্বামী, যুবক বৈষ্ণব জীবের শিক্ষা-দীক্ষার ভার নেন। রূপ গোস্বামী সিদ্ধ মহাপুরুষ। নিরন্তর ভক্তিরসে ডুবিয়া থাকিয়া ভগবৎ আনন্দ অনুভব করা তাঁহার লক্ষ্য। এইজন্য তিনি ইহার প্রতিকূল অবস্থা এড়াইয়া চলিতেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আসিলে তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মনের প্রশান্ত ভাব নষ্ট হয় সেইজন্য তিনি যথাসাধ্য তর্কযুদ্ধ এড়াইয়া চলিতেন। তা সত্ত্বেও কখন কখন প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিতে হইত। কখন কখন তিনি ইচ্ছা করিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া

প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় জয়-তিলক পরাইয়া দিতেন। জয়-পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া ভগবৎ আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে হইলে ইহাই প্রকৃষ্ট নীতি।

এরূপ শান্তভাব যুবক জীবনের পছন্দ হইত না। আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে প্রবল। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার তাঁহার ধাতে সয় না, অকারণে প্রতিদ্বন্দ্বীর কপালে জয়-তিলক শোভা পাইবে ইহা অসহ্য। জীব বৈষ্ণব হইয়াছেন, দীনভাব বৈষ্ণবের পাথেয়। যুদ্ধং দেহি মনোভাব পোষণ করিয়া রাখা বৈষ্ণবের পক্ষে হানিকর। এই বৈষ্ণব বিরোধী মনোভাবের জন্য জীবকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে নামিলেন। রূপ গোস্বামী কৃত ভক্তিরসামৃত গ্রন্থই তর্কের বিষয়বস্তু। ঐ গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কতকগুলি ভুল হইয়াছে বলিয়া বল্লভ ভট্ট গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে রূপ গোস্বামী বৃদ্ধ আচার্যের নিকট বিনয়ভাবে বলিলেন যে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। যদি ঐরূপ প্রকৃতই হইয়া থাকে তবে তিনি তাহার জন্য দুঃখিত। উভয়ের আলোচনার সময় জীব কাছে ছিলেন। তিনি বিনা তর্কে ঐরূপ হীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে উহা প্রকাশ করিতে পারেন না, করিলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, যেখানে ঔদ্ধত্য সেখানে দুষ্প্রবৃত্তি, অবিনয়ের আধিপত্য। বিদ্যায় বুদ্ধি বিমল হয় কিন্তু যৌবনে কখন কখন সেই বুদ্ধি আবিল হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠতাতের সামনে ঔদ্ধত্য না দেখাইয়া জীব সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। রূপ গোস্বামী স্নানে চলিয়া গেলে জীব বৃদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বল্লভ ভট্টের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা তিনি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি নির্ভুল প্রমাণ করিলেন। বৃদ্ধ আচার্য যুবক জীবের তর্কজাল ছিন্ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার যুক্তি খণ্ডন না করিতে পারিয়া উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। মানিয়া লওয়া পরাজয় স্বীকারের সামিল। তর্কের সময় জীব তাঁহাকে কটূক্তি করিতে ছাড়েন নাই। যুবকের শ্লেষবাক্য বৃদ্ধ আচার্য বল্লভ ভট্টের প্রাণে খুব আঘাত করিয়াছে। রূপ গোস্বামী স্নান সারিয়া ফিরিয়া বৃদ্ধ আচার্যের অপমান এবং জীবের ঔদ্ধত্যের কথা শুনিলেন। সংযম রাহিত্য, দীনতার অভাব ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ত্যাগীর পক্ষে এরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করা স্বেচ্ছায় বিষ পান করার সামিল। শুধু পাণ্ডিত্য অর্জন বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রের কচকচি লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে জীবন বৃথা যায়। বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিয়া দীনতা, সংযমাদির অনুশীলন না করিলে ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নানা কারণে বিরক্ত

হইয়া তিনি জীবকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন যাপন করিবার উপযুক্ততা অর্জন করিতে বলিলেন এবং খাওয়াপরার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের তিরস্কারে জীবের চোখ খুলিল, অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। নির্জনে গিয়া জীব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। খাওয়াপরার ঠিক নাই। দেহসুখের প্রতি দৃষ্টি নাই। তীব্র কঠোরতার ফলে শরীর এমন জীর্ণ হইয়া পড়িল, জীব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার মনেও তখন ভীষণ অশান্তি। দীর্ঘকাল পরে একদিন সৌভাগ্যবশতঃ জ্যেষ্ঠতাত সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তিনি জীবকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বহুদিন তপস্যায় মনও কিছু স্থির হইয়াছে। এদিকে রূপ গোস্বামীর রাগও শান্ত হইয়াছে। তিনি তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত একজন উপযুক্ত শাস্ত্রবিদ বৈষ্ণব নিকটে থাকা দরকার। তিনি খবর পাইয়াছেন বহু তপস্যার ফলে জীবের ঔদ্ধত্য কমিয়াছে, দীনতায় অন্তর বিশুদ্ধ হইয়াছে। তিনি জীবকে আসিতে বলিলেন। জীব আসিয়া রাধামাধবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠতাতকে গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিলেন। রূপের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি এখনও বৃন্দাবনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে রক্ষিত আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব সমাজের মাথার মণি। উভয়ের দেহরক্ষা হইলে বৈষ্ণব সমাজ নেতৃহীন হইল, বৈষ্ণব আদর্শ অবিকৃত রাখিতে হইলে উপযুক্ত বিদ্বান, ভক্তিবান্ সিদ্ধপুরুষের প্রয়োজন। এদিকে লোকনাথ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং মহারক্ষীগণ বৃদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রদায় পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তাঁহাদের পক্ষে বহন করা কঠিন। তখন সকলে জীব গোস্বামীকে অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন কিংবা প্রকাশের প্রয়োজন হইলে জীব গোস্বামীর অনুমোদনের উপর নির্ভর করিত। গ্রন্থের বিষয়, প্রয়োজন, আলোচনা তত্ত্বনির্ণয়, উপসংহার ইত্যাদি ঠিক হইয়াছে কিনা জীব গোস্বামীর সহিত আলোচনা করিয়া স্থির হইত। জীব গোস্বামীও বৈষ্ণব আদর্শ বজায় রাখিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও গুরুতর বিষয়ে তাঁহাকে কখন কখন লিপ্ত হইয়া থাকিতে হইত। বাহিরে কোন ধুরন্ধর পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলে তাঁহাকেই অগ্রণী হইতে হইত। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে অনেকে টিকিতে পারিতেন না, তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিয়া ক্ষুণ্ণমনে বিদায় লইতেন।

জীব গোস্বামীর সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের কানে পৌছিলে তিনি জীব গোস্বামীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন। বৈষ্ণব সমাজের মুখপাত্ররূপে তিনি বাদশার সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল বাদশার হুকুম ব্যতীত বৃন্দাবনে কোন নূতন মন্দির উঠিতে পারিবে না। জীব গোস্বামীর সঙ্গে আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া বাদশা পূর্ব হুকুম রদ করিলেন। এইভাবে জীব গোস্বামী ধর্মের লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেন।

পূর্বে কোন গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে তালপাতায় লিখিতে হইত। ইহাতে গ্রন্থের প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হইত। জীব গোস্বামী দিল্লী হইতে কাগজ আনাইয়া ঐ অসুবিধা দূর করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে বৈষ্ণব ধর্মে নূতন আলোড়ন আসিল। অভিনব কাব্য সৃষ্টি, দার্শনিক দূরদর্শিতা দেখা দিল। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইল। উদার দৃষ্টিভঙ্গী, দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাধুর্যের জন্য তাঁহার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের উন্নতিকল্পে তিনি দীর্ঘ ৬০ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। দার্শনিকতার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতিভা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহার ভাগবতের ষট্সন্দর্ভের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভগবৎ মাহাত্ম্য সম্বলিত গোলাপচম্পু, দেবদেবী সম্বন্ধীয় স্তোত্রাদি, ব্যাকরণ এবং বহু শাস্ত্রের টীকা তিনি লিখিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিনি বহু বিদ্বানের সাহায্য পাইয়াছেন। বর্ধমান জিলার কালনার অন্তর্গত চিকন্দির শ্রীনিবাস আচার্য, উড়িষ্যার শ্যামাদাস গোস্বামী, গরানহাটার জমিদারের পুত্র নরোত্তম প্রভৃতি মনিষীগণ তাঁহাদের অন্যতম। মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং ভাব প্রচারের জন্য তিনি বহু বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান বৈষ্ণব বাংলা এবং উড়িষ্যায় পাঠান। বৈষ্ণব সমাজ পুনর্গঠনে তাঁহার অদ্ভুত দূরদর্শিতা এবং সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিরন্তর প্রচারের ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে একটা জাগরণের ভাব দেখা দেয়। ধর্মপিপাসা বৃদ্ধি পায়।

তাঁহার প্রচারকার্যের অনেক বিঘ্ন ঘটিল। প্রচারকগণ যখন সিন্দুক ভর্তি শাস্ত্র গ্রন্থ নিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া বাংলা এবং উড়িষ্যায় যাইতেছিলেন তখন ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হইল। সিন্দুকের মধ্যে হীরা জহরত আছে মনে করিয়া তাহারা সিন্দুকটি লুঠ করিয়া নিল, পথিমধ্যে মূল্যবান গ্রন্থাদি হারাইয়া প্রচারকগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। শ্রীনিবাস বাংলা দেশের বৈষ্ণব দলের অগ্রণী ছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজা বৈষ্ণব ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। শ্রীনিবাসের বৈষ্ণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। পথে সিন্দুকস্থ শাস্ত্রগ্রন্থাদি লুণ্ঠনের কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় ব্যথিত হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থের সিন্দুক উদ্ধার করিয়া

প্রচারকদের হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহাতে ধর্মপ্রচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল।

জীব গোস্বামী বৃন্দাবনকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র করিলেন। বাংলা, উড়িষ্যা এবং সুদূর রাজস্থান পর্যন্ত ইহার কর্ম ছড়াইয়া পড়িল। তিনি নিজে শাস্ত্রব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। রাজা মানসিংহ তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

জীব গোস্বামীর দিন ফুরাইয়াছে, এখন যাইবার ডাক পড়িয়াছে। ১৫৫৬ সালে শুভদিনে ৮৪ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরম ধামে চলিয়া যান। তাঁহার শরীর রাধা মন্দিরের চাতালে সমাহিত করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের উন্নতিকল্পে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের ফলে বৈষ্ণব সমাজে প্রাণসঞ্চার হয়। ভক্তির ধারা অব্যাহত থাকে।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

চরণদাস বাবাজী

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনেকে বিশ্বাস করেন আবার অনেকে করেন না। শাস্ত্র হিসাবে ইহার খুব মূল্য আছে, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতি এই শাস্ত্রানুযায়ী নির্ণয় করা হয়। কোষ্ঠীবিচার ইহার অন্তর্গত। এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন জ্যোতিষী যদি গ্রহ, নক্ষত্র, বার, তিথি প্রভৃতি সঠিক জানিয়া কোষ্ঠী তৈয়ার করেন তাহা ফলিয়া যায়। যদি কোন ক্ষেত্রে না ফলে তবে মনে করিতে হইবে উহা শাস্ত্রের দোষ নহে। গণনাকারীর অজ্ঞতা কিংবা গ্রহ, নক্ষত্র, বার, তিথি প্রভৃতি জ্ঞানের অভাব। তাহা দ্বারা শাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না। কোষ্ঠীর ফল যে মিলে বহু ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবন্ধোক্ত মহাপুরুষের জীবনে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

রায়চরণ ঘোষ জাতিতে কায়স্থ। পিতা মোহনচন্দ্র ঘোষ বিত্তবান। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত মহেশখোলা গ্রামে তাঁর বসতি। রায়চরণের জন্ম, সন, তারিখ সঠিক জানা যায় না, তবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইবে। জীবনের প্রারম্ভেই রায়চরণের জীবনে বিপর্যয় ঘটে। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা কনকসুন্দরীর স্নেহে এবং খুল্লতাত ঈশানচন্দ্রের

যত্নে রায়চরণ লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। যৌবনে অপূর্ব সুন্দরী কন্যা স্বর্ণময়ীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। সংসার সুখেই চলে।

রায়চরণ যশোহর জমিদারের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পরিচালনায় জমিদারির দিন দিন উন্নতি হয় বলিয়া জমিদার তাঁহার উপর অত্যন্ত খুশী। অতিশয় নিপুণ চালক এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী বলিয়া তাঁহার খুব সুনাম। যখনই জমিদারির কোন স্থানে প্রজারা গোলমাল করিত তখনই রায়চরণের ডাক পড়িত। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি প্রজাদের বিদ্রোহ দমন করিতেন। একবার জমিদারির কোন একটা অংশে প্রজারা বিগড়াইল। অজন্মাজনিত দারিদ্র্যের জন্য তাঁহারা জমিদারের নিকট নিজেদের দুর্দশার কথা জানাইল। কোন ফল হইল না, বরং তাহাদের ভয় দেখান হইল। নিষ্পেষিত প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিল। চাষের জমিতে দেয় ধানও বন্ধ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই রকম সমস্যা উপস্থিত হইলে রায়চরণের ডাক পড়িত। রায়চরণ গিয়া সশস্ত্র লাঠিয়ালের সাহায্যে প্রজাদের বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করিলেন। সুদ সহ খাজনা ত আদায় করিলেনই, চাষের সমস্ত ধান কাড়িয়া লইলেন। দরিদ্র প্রজারা ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইল। স্ত্রী-পুত্র সংবৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে সেই চিন্তায় জর্জরিত হইল। হা-হুতাশ করা ছাড়া তাহাদের কিছু করিবার নাই। চোখের জল একমাত্র সম্বল হইল। হয়ত মনে মনে রায়চরণকে অভিশাপ দিল। প্রকাশ্যে কিছু করিবার নাই। প্রত্যেক কিছুর সীমা আছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকে। নির্মম নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। রায়চরণের মনে ধিক্কার আসিল। তিনি কোন্ পথে চলিতেছেন! প্রজাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া জমিদারের পেট ভরাইতেছেন। অন্যদিকে প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছে। জমিদারের পৌষ মাস, প্রজার সর্বনাশ। শিল-নোড়ার ঘষাঘষিতে লঙ্কার সর্বনাশ। প্রজার বিদ্রোহ দমনের জন্য জমিদারের নিকট বাহবা পাইবেন সত্য কিন্তু বাহবা পাওয়ার জন্যই কি তাঁহার জীবন? মাঝখানে তিনি নিজে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া দিন দিন পশুত্বের ধাপে নামিতেছেন। কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে? ইহাতে তাঁহার কি লাভ? মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া পশুত্ব অর্জন করিবার জন্যই কি তাঁহার জন্ম? অন্তরের নিভৃত স্থান হইতে যেন উত্তর আসিল, 'নিশ্চয়ই নয়, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। হেলায় নষ্ট করিবার জন্য নয়। জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ। অন্তরে দেবত্ব সুপ্ত আছে। দেবত্ব জাগিলে জীবন মধুময় হইবে। সাবধান! এখনও সময় আছে'। রায়চরণ স্থির করিলেন এইখানেই পশুজীবনের ছেদ টানিতে হইবে।

আর নয়, এতকাল সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া কি ভুলই করিয়াছেন। এখন ভুলের মাশুল দিতে হইবে। সংসার তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইল। অনুশোচনার আগুনে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অন্তরে বৈরাগ্য বাসা বাঁধিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। ইহা মর্কট বৈরাগ্য নয়, প্রকৃত বৈরাগ্য। শাস্ত্রে বিধান আছে, যখনই প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনই গৃহ ত্যাগ করিবে।

পথ চলিতে চলিতে রায়চরণ ভাবিলেন, কি করিবেন, কোথায় যাইবেন! হঠাৎ তাঁহার কোষ্ঠীর কথা মনে পড়িল। এতদিন অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভে মত্ত ছিলেন বলিয়া ইহার কথা ভাবেন নাই। কোষ্ঠীতে লেখা আছে তিনি সংসার ত্যাগ করিবেন, আদর্শ জীবন যাপন করিবেন এবং গুরু পদবীতে আরূঢ় হইবেন। হয়ত সময় আসে নাই তাই কোষ্ঠীর ফল ফলে নাই; সবই সময়সাপেক্ষ। পথশ্রান্ত হইয়া একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করিলেন। নিদ্রাদেবী তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন মা ভগবতী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'উত্তর বঙ্গে ভবানীপুর শক্তিপীঠ আছে। তুমি ওখানে গিয়া তপস্যা কর। পথের সন্ধান মিলিবে'। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া রায়চরণ ভবানীপুর শক্তিপীঠে উপস্থিত হইয়া নিত্য প্রার্থনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। অমাবস্যা তিথিতে পুণ্য সূর্যগ্রহণের দিনে শক্তিপীঠে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'সরযুর পুণ্যতটে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যায় যাও। সেখানে সদ্‌গুরু মিলিবে। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন'। দেবীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া রায়চরণ চলিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। বিখ্যাত শঙ্করানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পূর্ব নাম যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। খড়দহের একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব, সরযূতীরে নির্জন কুটীয়ায় থাকেন। স্বাস্থ্য ভাল, সুগোল, দোহারা চেহারা, বর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দময় পুরুষ, নদীতে স্নান সারিয়া হাতে কাঠের কমণ্ডলু নিয়া ফিরিবার সময় রায়চরণকে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি রায়চরণকে চিনেন, রায়চরণ দীক্ষার জন্য আসিবে জানিতেন এবং তিনি সেজন্য এতকাল অপেক্ষা করিয়া আছেন।

শঙ্করানন্দজীর অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে রায়চরণ মুগ্ধ হইলেন। যথাসময়ে তিনি রায়চরণকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিয়া ভেক দিলেন। গলায় তুলসীমালা, কপালে তিলক পরাইলেন। নূতন নাম রাখিলেন চরণদাস বাবাজী। বৈষ্ণবের ভেকে কি বিমোহিনী শক্তি আছে বলা কঠিন। ভেক ধারণ করিবামাত্র নবীন বৈষ্ণবের

ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি নূতন মানুষ হইলেন, অত্যাচারী রায়চরণ প্রেমিক চরণদাস বাবাজী হইলেন। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন। শিষ্যের উন্নত দিব্যভাব লক্ষ্য করিয়া শঙ্করানন্দ বুঝিলেন উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত বীজ রোপণ করা হইয়াছে। হাসি, কান্না, পুলক, নৃত্য, রোমাঞ্চ ইত্যাদি ভাব সাধারণ আধারে ফুটে না। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাই নামসংকীর্তন দ্বারা জনসাধারণেব মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রাচরে করিবার জন্য শিষ্যকে আদেশ করিলেন।····· গুরুর আদেশে চরণদাস বাবাজী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুর সঙ্গ এবং আশ্রম ছাড়িয়া প্রেমভক্তির অবতার মহাপ্রভুর লীলাভূমি পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে আসেন। শ্রীবাসের বাড়ীর নিকটে জগদানন্দ বাবাজীর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি নিত্য জপধ্যান, স্তোত্রপাঠ, নাম সংকীর্তন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন।

চরণদাস বাবাজীর মধুর ব্যবহার, চালচলন, ভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার শিষ্য হইলেন। নবদ্বীপ দাস তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সংকীর্তন পার্টির পাণ্ডা হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে চরণদাস বাবাজী দলবল নিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে সাক্ষীগোপাল পৌছিলে তাঁহার অদ্ভুত দর্শন হয়। মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। নিত্যানন্দ অবধূত স্বপ্নে দীক্ষা দিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে অদৃশ্য হইলেন। সংকীর্তনের দল নিয়া জগন্নাথ ধামে পৌছিলে সকলের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। বেশভূষাতে তাঁহার মন নাই। জীর্ণ মলিন বস্ত্র দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে টিটকারি দিতে লাগিলেন। আবার অনেকে তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং ভাবভক্তিতে মুগ্ধ হইলেন। বিখ্যাত ভগবানদাস বাবাজী এবং জগন্নাথ ভট্ট তখন পুরীতে বাস করেন। চরণদাস বাবাজীর ভাবভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জগন্নাথ ভট্ট তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

পুরীর জগন্নাথ ধাম বিখ্যাত চার ধামের অন্যতম। দেশ-দেশান্তরের অগণিত ভক্ত এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করিতে আসেন। রথযাত্রার সময় ভীষণ ভিড় হয় বলিয়া যান-বাহনের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই স্থান মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার ক্ষেত্র। তিনি যেখানে মন্দিরের এক স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন সেখানে তাঁহার পদচিহ্ন রক্ষিত ছিল। চরণদাস বাবাজী লক্ষ্য করিলেন কীর্তনের সময় অনেকে মাড়াইয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করে। ইহা তো তাঁহার প্রাণে লাগে। পুরীর মহারাজা মন্দিরের সেবক রক্ষক। তাঁহার অনুমতি নিয়া চরণদাস বাবাজী উক্ত পবিত্রপদ চিহ্নটি মূল মন্দিরের কোণে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পুরীতে গুরু

দীক্ষা মার্জনা উৎসব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। রথের সময় এই উৎসব হয়, রথ চলিবার পূর্বে রাস্তায় সুবাসিত জল ছড়াইয়া ঝাঁট দেওয়া হইত, মহাপ্রভু নিজে রাস্তা ঝাঁট দিতেন। পুরীর রাজাও সেবক হিসাবে ঝাঁট দিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, উৎসবের উৎসাহ কমিয়া আসিল। উহা যাহাতে দ্বিগুণ উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয় চরণদাস বাবাজী তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তখন হইতে উহা সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে।

চরণদাস বাবাজী এখন নবদ্বীপে আছেন। নামকীর্তনে দিন ভালই কাটিতেছে, একবার চরণদাস বাবাজী কোন কারণ বশতঃ পূর্ব আশ্রমের আত্মীয় কোন বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধককে কটূক্তি করিলেন। উহাতে বৃদ্ধ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণব, প্রতিকার নীতিবিরুদ্ধ। চুপ করিয়া সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু উহা বৃথা গেল না। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। চরণদাস বাবাজী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। নিজের ভুল বুঝিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বৈষ্ণব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তাঁহার নিকট ভেকদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। জনৈক যুবক স্বপ্নে চরণদাস বাবাজীকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করেন। তিনি নবাগতকে সানন্দে শিষ্যত্বে বরণ করেন। এই যুবকই পরে চৈতন্যদাস বাবাজীরূপে বিখ্যাত হন। একদিন মন্দিরে কীর্তন শেষ করিয়া চরণদাস বাবাজী গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময় একটি কুকুরী তাঁহার পিছু নিয়া আশ্রমে আশ্রয় পাইল। চরণদাস বাবাজী তাহাকে ভক্তিমা নাম দিলেন। ঐ নামে ডাকিতেন, আদর করিতেন, খাবার দিতেন। কিছুকাল পরে কুকুরীটি মারা গেলে চরণদাস বাবাজী তাহার সৎকার করেন এবং তাহার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে তিনি বৈষ্ণব সাধু ভোজনের ব্যবস্থা করেন এবং অনেক কুকুরকেও নিমন্ত্রণ করেন। ইহাতে বৈষ্ণব সাধুগণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া সদলে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চরণদাস বাবাজী তাঁহাদের অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইলেন যে ভগবান যদি অচেতন স্তম্ভের মধ্যে থাকিতে পারেন তবে কুকুর জাতীয় নিম্নচেতন প্রাণীর মধ্যেও থাকিতে পারেন। বৈষ্ণব সাধুরা তাঁহার যুক্তি নিলেন না। চরণদাস বাবাজী নিমন্ত্রিত কুকুরদের পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। আর মাঝে মাঝে 'জয় নিত্যানন্দের জয়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভোজনশেষে কুকুরগুলি নিঃশব্দে শৃঙ্খলার সহিত একে একে চলিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া বৈষ্ণব সাধুরা নিজ ভুল বুঝিতে

পারিলেন এবং চরণদাস বাবাজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ভাণ্ডারা খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

সশিষ্য চরণদাস বাবাজী কৃষ্ণনগরের বাহিরে গ্রামের একটা পুরনো বটগাছের তলায় সমবেত হইয়া কীর্তন করিতেন। কয়েকজন স্থানীয় বিধর্মী গুণ্ডা পৌত্তলিক অপবাদ দিয়া হিন্দুদের জব্দ করিবার জন্য ঐ গাছের অনেক ডাল কাটিয়া দিল। খবর পাইয়া চরণদাস বাবাজী নিজের দল নিয়া উক্ত বটগাছের তলায় সমবেত হইয়া নাচিতে নাচিতে কীর্তন শুরু করিলেন। অনেক বিধর্মীও দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে গাছের অবশিষ্ট ডালগুলি যেন কীর্তনের তালে তালে দুলিতেছে এবং পাতাগুলি হইতে জল ঝরিতেছে। গাছের মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। এই ঘটনার পর হইতে লোকে ঐ পুরনো বটগাছটিকে কল্পবৃক্ষ বলিত, কামনা সিদ্ধির জন্য গোড়ায় জল ঢালিত এবং ফুল, ফল দিয়া পূজা করিত।

একবার শিষ্য নবদ্বীপ দাসের কঠিন পীড়া হইল, আরোগ্য হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চরণদাস বাবাজী নামকীর্তন করিতে করিতে হঠাৎ মুমূর্ষু রোগীকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যে নবদ্বীপ দাস চোখ মেলিয়া চাহিলেন। শিষ্য সারিয়া উঠিলেন বটে কিন্তু কর্মফল গুরুকে ভুগিতে হইল। চরণদাসবাবাজী কঠিন নিমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, রাত্রে কলিকাতা হইতে জনৈক ভক্ত আসিলেন। আসিবার সময় তিনি আশ্রমের জন্য অনেক পরিমাণ চাটনি আনিয়াছিলেন। চরণদাস বাবাজী ভাবাবস্থায় সমস্ত চাটনি খাইয়া ফেলিলেন। ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। শীঘ্রই বাবাজীর শরীর যাইবে আশঙ্কায় সকলে উদ্বিগ্ন রহিলেন কিন্তু পরের দিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া নিয়মিত ভোজন করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

বহুলোক তাঁহার ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার রামদাস নামে একজন যুবক তাঁহাদের অন্যতম। সুলক্ষণযুক্ত যুবকের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুক্কায়িত দেখিয়া চরণদাস বাবাজী তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিলেন এবং নাম রাখিলেন রামদাস বাবাজী। জয়গোপাল নামে আর একজন ভক্ত ছিল, বিগ্রহ এবং ভক্তসেবায় তাহার খুব আনন্দ। কীর্তনে যোগ দিত না, দূরে দূরে থাকিত। তাহার সখির ভাব। গোপীদের যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ তাহারও সেই রকম। চরণদাস বাবাজী একদিন তাহাকে কীর্তনে টানিয়া নিলেন

এবং নাম রাখিলেন ললিতা সখী। আর একদিন নামকীর্তন চলিতেছিল এমন সময় লাঠিতে ভর করিয়া একজন কালা এবং রুগ্ন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িল। চরণদাস বাবাজী তাহাকে স্পর্শ করেন এবং তাহার কানে একটা মন্ত্র প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ কালা রুগ্ন ব্যক্তি লাফাইয়া উঠিল এবং খুব উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। তাহার শরীর ও মনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল। বধিরতা সারিয়া গেল, স্বাভাবিক লোকের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। চরণদাস বাবাজী তাহার নাম রাখিলেন কুঞ্জদাস এবং তাহাকে জগন্নাথের নিকটে মহাপ্রভুর মন্দিরে বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

চরণদাস বাবাজী অনেক সময় পুরীতে থাকিতেন বটে কিন্তু তাঁহার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। যখন যেখানে সুবিধা হইত থাকিতেন। যতই দিন যাইতে লাগিল তত ভক্ত ও শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এখন একটা নিজের আশ্রম থাকিলে ভাল। সুযোগও আসিয়া জুটিল। পুরীতে বিরক্ত সিদ্ধ আশ্রম নামে একটা মঠ ছিল। মঠে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। তখন মঠের দুরবস্থা, উপযুক্ত লোকের অভাবে বিগ্রহ সেবায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মঠও যায়-যায়। মঠের বিষয়-সম্পত্তি নীলামে উঠিবার উপক্রম হইল। ভক্তদের একান্ত অনুরোধে চরণদাস বাবাজী মঠের এবং বিগ্রহ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। আশ্রম হাতে আসার পর প্রচারকার্যের সুবিধা হইল, কীর্তন দল নিয়া তিনি প্রচারার্থে উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। একদিন সদলে কোন একটা গ্রামে পৌছিলেন; তখন শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। উভয় দল তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিল। উভয় পক্ষকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে প্রকৃতপক্ষে কোন ঝগড়া থাকিতে পারে না। কারণ শক্তি এবং বিষ্ণু পৃথক নন; অগ্নি আর দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, একটা অপরটা হইতে পৃথক করা চলে না। শক্তি ও বিষ্ণুর মধ্যেও অনুরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। বৈষ্ণব বিষ্ণুকে যেমন উপাসনা করেন সেরকম লক্ষ্মীকেও উপাসনা করেন। লক্ষ্মী শক্তিই, অন্যদিকে শিব রামনামে নৃত্য করেন। এই সব চিন্তা করিয়া বেশ বুঝা যায় বিষ্ণু আর শক্তির মধ্যে ভেদ কাল্পনিক, বাস্তব নয়। যাঁহার যেরূপ ভাল লাগে তিনি একই ঈশ্বরকে বিভিন্নরূপে উপাসনা করেন। তাঁহার কথার সারবত্তা বুঝিয়া উভয় দল ঝগড়া হইতে বিরত হইল। বন্ধুভাবে নিজ নিজ কর্মে চলিয়া গেল। অনুভূতিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষই সমন্বয়ের ভাব আনিতে পারেন, অন্যে নয়।

গঙ্গাধর দাস নামে জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সর্পাঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। চরণদাস

বাবাজী ভাবাবস্থায় তাঁহাকে নির্মম ভাবে লাথি মারেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সাপের বিষ চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। অন্য একদিন জনৈক যুবক বৈষ্ণবের বিসূচিকা রোগ হইল। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইল, জীবনের আশা নাই। তখন ললিতাসখি নামক বৈষ্ণব বলিলেন যদি এই যুবক এইভাবে মারা যায় তবে তিনি নিজে ভেক ছাড়িয়া সর্বসমক্ষে প্রচার করিবেন যে বৈষ্ণব ধর্মের কোন মাহাত্ম্য নাই। উহা ভণ্ডামি। চরণদাস বাবাজী তখন যোগাসনে বসিয়া ধ্যানরত। ধ্যান ভঙ্গ হইলে কলেরা রোগীকে স্পর্শ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রোগীর চোখ-মুখের মধ্যে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুমূর্ষু মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইল। এরূপ আরও অনেক ঘটনা আছে যাহার দ্বারা চরণদাস বাবাজীর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে কোন বাগানে অবস্থানকালে এক উড়িয়া ছেলে সর্পাঘাতে বেহুঁশ হইলে চরণদাস বাবাজী অলৌকিক শক্তিবলে তাহাকে বাঁচান। অন্য একদিন উত্তর কলিকাতার কোন মাড়োয়ারী বৃদ্ধ মহিলার মৃত্যু ঘটিলে আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে নিমতলার শ্মশানে দাহ করিবার জন্য নিয়া যান। পথে চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি উক্ত মহিলার আত্মীয়দের বলিলেন যে তিনি না আসা পর্যন্ত যেন মহিলার মুখে আগুন দেওয়া না হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে চরণদাস বাবাজী সদলে শ্মশানে আসিয়া উক্ত মৃতদেহের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকবার ঘুরিয়া কীর্তন করার পর চরণদাস বাবাজী মৃতদেহের পায়ের আঙুল স্পর্শ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি চোখ মেলিলেন। আত্মীয়স্বজনদের চিনিতে পারিলেন, কিন্তু বাবাজী যখন আর স্পর্শ করিলেন না তখন বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধাকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য আত্মীয়গণ বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন। চরণদাস বাবাজী তাঁহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ চলে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিতে পারে না। তাঁহার বিধান মানিতে হইবে।

চরণদাস বাবাজী মঠের অধ্যক্ষ, কিন্তু মঠের আর্থিক অবস্থা খারাপ। কাহারও নিকট হইতে কিছু চাওয়া বাবাজীর ধাতে নাই। তাঁহার ভাব, যদি চাইতেই হয় তবে ভগবানের নিকট চাওয়াই ভাল। তিনি মালিক, তাঁহার ইচ্ছা হইলে অর্থকষ্ট কমিবে। ভগবৎ নির্ভরতার মূল্য আছে। কিছু দিনের মধ্যে কোন ভক্ত মঠের বিগ্রহ-সেবা এবং সাধু-সেবার জন্য অনেক টাকা দিল। সেবা বিষয়ে তিনি নিষ্ঠা ও

পবিত্রতার উপর খুব জোর দিতেন। একদিন পা ধুইবার সময় ললিতাসখির পায়ের ছিটা জল অতর্কিতে বিগ্রহের সেবার জন্ত রাখা উপচারের উপর পড়িল। ইহার পর তাঁহার (ললিতাসখির) পায়ের ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ডাক্তার দেখান হইল, কিন্তু ডাক্তার যন্ত্রণার কারণ কিছুই নির্দেশ করিতে পারিলেন না। যন্ত্রণা বাড়িয়া চলিল। হঠাৎ পায়ের ছিটা জল বিগ্রহ সেবার উপচারের উপর পড়িবার কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মনে অনুতাপ আরম্ভ হইল। শিষ্যের কষ্টের কারণ চরণদাস বাবাজী জানিতেন কিন্তু তিনি উহা শিষ্যের নিকট ভাঙেন নাই। নিবেদিত বস্তু চিন্ময় সুতরাং নিবেদনের পূর্বে যদি উপচারের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সতর্ক না হওয়া যায় তবে সেবা অপরাধে কষ্ট পাইতেই হইবে।

প্রসিদ্ধ ভক্ত, লেখক, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ চরণদাস বাবাজীর সমসাময়িক। মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে আভাস পাওয়া যায় যে বৃন্দাবনলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই বরং কর্মজীবনের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। চরণদাস বাবাজীর সংস্পর্শে আসার পর তাঁহার অভিমত অন্যরূপ হইল। চরণদাস বাবাজী মনে করিতেন ভক্তের নিকট ভগবানের প্রত্যেক কর্মই প্রিয়। কি বাল্য কি যৌবন সর্বত্র তাঁহার জীবনের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। ভগবানের প্রত্যেক কার্যই ভক্তের আদর্শ। যিনি স্বয়ং পূর্ণ তাঁহার কোন কার্যই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং অপূর্ণ নয়।

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার ভগবৎ-নিষ্ঠা দৃঢ় হইল। ইষ্টচিন্তায় নিরন্তর ডুবিয়া থাকেন। এবার ডাক পড়িয়াছে, যাইতে হইবে। শিষ্যদের নিকটে ডাকিয়া সকলকে ভগবৎ মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বলিলেন, নাম নামী অভেদ, একমাত্র ভগবান সত্য, নিত্য, তিনি ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সনাতন ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দিলেন। একদিন শুভ মুহূর্তে তিনি মহা সমাধিতে লীন হইলেন, অত্যাচারী রায়চরণ চরণদাস বাবাজী হইয়াছেন, কোষ্টীর ফল ফলিয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কোষ্টীর ফলানুযায়ী তিনি সন্ন্যাসী এবং গুরু হইয়াছেন এবং অগণিত ভক্তের প্রাণে শান্তির বারি ঢালিয়াছেন।

॥ ছত্রিশ ॥

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস

যিনি ভগবানের শরণাপন্ন হন কিংবা ভগবান যাঁহাকে কৃপা করেন তিনি সত্য লাভ করেন। ইহা শাস্ত্রবাক্য। সত্যলাভ করিবার জন্য শরণাগতি যেমন দরকার, ভগবৎ-কৃপাও তেমন দরকার। শরনাপন্ন হইলেই যে তিনি কৃপা করিবেন এমন কোন কথা নাই। কৃপা করা তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ইচ্ছাময়। আবার শরণাপন্ন না হইলে তিনি কৃপা করেন না। সত্যলাভের জন্য উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। শরণাগতির ভাব দৃঢ় হইলে তবে কৃপা আসে। কৃপা লাভই সিদ্ধি। সিদ্ধাবস্থায় সাধক নিজেকে কৃষ্ণের দাস ভাবেন। প্রবন্ধোক্ত কৃষ্ণদাস তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া নিজেকে কৃষ্ণের দাস ভাবনা করিতেন।

উড়িষ্যার কোন গ্রামে সনাতন কানুনগো বাস করিতেন। তিনি বেশ ধনী ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত জমিদার, জাতিতে কায়স্থ। জমিদার হইলেই সকলের উপর কর্তৃত্ব করা চলে না, অন্ততঃ কালের উপর নয়। বরং কালই তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলেই কালের অধীনে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে কাল সনাতনকে সংসার হইতে সরাইয়া নেন। সনাতনের সাধ্বী স্ত্রী ঝড়ী দাসী স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় সহ-মরণে যাইবার সংকল্প করেন। সংসারের মায়া কাটাইয়া চিতায় উঠিবার পূর্বে প্রথম দুই পুত্রকে আশীর্বাদ করেন এবং সংসারে থাকিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র বটকৃষ্ণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন। কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহের টান অধিক। তাঁহাকে বলিলেন যে সে যেন অবিলম্বে বৃন্দাবনে চলিয়া যায় এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পথ অনুসরণ করে এবং কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎ আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করে। সাধারণতঃ দেখা যায় মাতৃস্নেহের আকর্ষণ পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করে, বৈরাগী কিংবা সন্ন্যাসী হইতে দেয় না। পুত্র পর হইয়া যাইবে ইহা সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই মা পুত্রকে স্নেহের ডোরে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মা নিজেই পুত্রকে ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। এই রকম মা জগতে দুর্লভ, কালে দুই-একজন মিলিতে পারে। মায়ের শেষ কথাগুলি বটকৃষ্ণের মনে গভীর রেখাপাত করে।

বটকৃষ্ণের বয়স অল্প, মাত্র ষোল বৎসর। স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া করেন। মায়ের শেষ কথাগুলি জীবনে পরিণত করিতে তিনি কৃতসংকল্প। শুভ সংস্কার ভিতর হইতে প্রেরণা যোগাইল। বৃন্দাবনে আসিয়া বটকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর কৃপা প্রার্থনা করেন। চরণদাস বাবাজী সিদ্ধ মহাপুরুষ। নবাগতের মধ্যে যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তাহা তিনি জানেন। তিনি নবাগতকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আশ্রয় দেন। নূতন নাম রাখিলেন কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। এখানে শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া থাকাই ভাল, বটকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস হইলেন। গুরুর উপদেশ মত কৃষ্ণদাস বহু বৎসর কঠোর তপস্যায় কাটান। তাঁহার দেহরক্ষার পর তিনি (কৃষ্ণদাস) জয়পুরের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোবিন্দজীকে দর্শন করিতে আসেন। এখানেও কয়েক বৎসর ধ্যান, ভজন, তপস্যায় কাটান। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল তাঁহার ইষ্ট চলাফেরা করিতেছেন, হাসিতেছেন, খেলা করিতেছেন, কথা কহিতেছেন। মন আনন্দে ভরপুর। ঐ বিগ্রহের পূজা-সেবা করিবার জন্য তাঁহার মনে বাসনা জন্মিল। অসম্ভাব্য উপায়ে তাহাও পূর্ণ হইল। তিনি সেবার অধিকার পান। একবার জয়পুরের মহারাজার সঙ্গে দৈবক্রমে কৃষ্ণদাসের দেখা হয়। তাঁহার ভাব, ভক্তি ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজা তাঁহাকে বিগ্রহ সেবার অনুমতি দিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাপ্ত অধিকার তিনি পুরোপুরিভাবে সদ্ব্যবহার করেন। ভাব, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত দশ বৎসর সেবা করিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

একদিন বিগ্রহের বিশেষ পূজা হইল। নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার পর তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিলেন। এরূপ অস্বস্তিবোধ পূর্বে কখনও হয় নাই। মনে ভীষণ কামভাব জাগিল। উহার বেগ এত প্রবল যে নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হইল। ইহা ভগবানের পরীক্ষা কিনা কে জানে। ভগবান যাহাকে কোলে স্থান দেন তাঁহাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে নিকটে স্থান দেন। কৃষ্ণদাস কখনও এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নাই। সংযমের সব চেষ্টা বৃথা যায় আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণদাস জয়পুর হইতে পলাইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন এবং জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার উপদেশে আবার কঠোর তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন। দিনে তিনবার স্নান করেন, কনকনে শীতেও বাদ দেন না। খালিগায়ে মাটিতে শয়ন করিয়া থাকেন। অন্য শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন, ভূমিই শয্যা হইয়াছে। খাওয়া একরকম ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। কোন উপাদেয় কিংবা রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য গ্রহণ করেন না। যাহা না হইলে জীবন ধারণ সম্ভব নয়

মাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। দিনরাত্রি ভগবৎ চিন্তায় নিরত থাকেন। প্রত্যেক কিছুর সীমা আছে, কঠোরতারও সীমা আছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ নেয়। স্বাস্থ্যের প্রতি তীব্র উদাসীনতার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইল, এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে চলাফেরা করিতে কষ্ট হইত। রাধারাণী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন। কৃষ্ণদাস নিত্য রাধারাণীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানান। একদিন ইষ্ট রমণীবেশে কৃষ্ণদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিছু প্রসাদ খাইতে দিলেন এবং চোখে কিছু অঞ্জন লাগাইতে দিলেন। অঞ্জনের অলৌকিক শক্তি, ব্যবহারে কৃষ্ণদাসের চোখ সারিয়া গেল। প্রসাদ গ্রহণ করিবার পর তাঁহার শরীর সুস্থ হইল। তিনি চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইলেন। কে তাঁহাকে প্রসাদ এবং অঞ্জন দিলেন তাহা ক্ষীণদৃষ্টির জন্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। উহার রহস্য ভেদ করিবার জন্য তিনি আবার প্রার্থনা এবং উপবাস আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় দিন রাত্রে রাধারাণী স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন যে তিনিই প্রসাদ এবং অঞ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে কৃষ্ণদাস যখনই ইষ্টের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবেন তখন দেখা পাইবেন। গোবর্ধনে গিয়া তপস্যা করিবার জন্য উপদেশ দিয়া তিনি পলকে অন্তর্হিত হইলেন। এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় কৃষ্ণদাসের জীবন কত কঠোরতার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই কঠোরতার পুরস্কার কত মহান্।

কৃষ্ণদাস গোবর্ধনে এক পর্ণকুটীরে থাকিয়া নিয়মমত জপ, ধ্যান করেন। বিদ্বান্ ও ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি বেশী লেখাপড়া শিখেন নাই। মায়ের আদেশে অল্প বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া সাধু হন। এখন তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে শাস্ত্র বুঝা কঠিন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আরম্ভ করিয়া দেখিলেন উহাতে তাঁহার অধিকাংশ সময় চলিয়া যায়। জপ, ধ্যান করিবার সময় মিলে না। নিজের উপর ধিক্কার আসিল। অতিশয় হতাশ হইলেন। একদিন তিনি পাগলের মত ক্ষেপিয়া নিকটে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় তাঁহার ইষ্ট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন যে শাস্ত্রের রহস্য ভগবৎ কৃপায় ভিতর হইতে উদ্ঘাটিত হইবে। শাস্ত্রের তর্ক-যুক্তির মধ্যে না গেলেও মর্ম জানা সহজ হইবে। ভগবৎ কৃপা থাকিলে কষ্ট করিয়া ব্যাকরণ পড়িয়া ভাষাবিদ্ না হইলেও চলিবে। অবিলম্বে ইষ্ট অদৃষ্ট হইয়া গেলেন।

ইষ্টের আশীর্বাদ যে তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়। একবার দক্ষিণ দেশ হইতে আগত কোন ধুরন্ধর পণ্ডিত কৃষ্ণদাসকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জপ-ধ্যানের ক্ষতি হইবে আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণদাস উহা এড়াইতে চাহিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছাড়িবার পাত্র নন। পাণ্ডিত্য দেখইবার জন্য তিনি সামবেদের কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণদাসের শাস্ত্রজ্ঞান নাই পাণ্ডিত্য নাই, আছে মাত্র ভগবৎ-নির্ভরতা, বিশ্বাস। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও একমাত্র ইষ্টের কৃপায় উক্ত পণ্ডিতের উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যার ভুল ধরিয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কৃষ্ণদাসের মত সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কত বোকামি তাহা টের পাইয়া পণ্ডিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর হইতে বহু যুবক এবং বৃদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্ম জানিবার জন্য কৃষ্ণদাসের নিকট আসিতেন। কৃষ্ণদাসও ইষ্টের কৃপায় শাস্ত্রের নিহিত মর্ম তাঁহাদের নিকট বলিতেন। নানা বৈষ্ণব শাস্ত্র ঘাঁটিয়া তিনি বৈষ্ণবদের উপাসনা পদ্ধতি রচনা করিলেন। এইরূপ পদ্ধতি রচিত হওয়াতে বহু ভক্তের সুবিধা হইল। দলে দলে দীক্ষার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে বিখ্যাত হইয়াছেন। কালনার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানদাস বাবাজী, বৃন্দাবনের লালাবাবু তাঁহাদের অন্যতম।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রেমিক ভক্ত। প্রায়ই তাঁহার অলৌকিক দর্শনাদি হইত। একদিন উৎসবরতা রাধারাণীর দর্শন পাইলেন। ঐ সময়ে সমবেত ভক্তেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাঁহার দেহে আবীর লাগান, সুবাসিত গন্ধে চারিদিক আমোদিত। দেখিয়া মনে হয় তিনি হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আর একদিন মানস গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের ধ্যানে তাঁহার মন এত মাতোয়ারা ছিল যে দেহ ভুল হইয়া গেল, তিনি জলে পড়িয়া গেলেন। সাতদিন পর্যন্ত জলে ইষ্টধ্যানে বেহুঁশ হইয়া রহিলেন। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকে জলে স্থলে সর্বত্র খোঁজ করিলেন কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহারা হতাশ হইলেন, সপ্তম দিবসে তাঁহাকে নদী হইতে স্নান সারিয়া ফিরিতে দেখিয়া ভক্তেরা আনন্দিত হইলেন।

ভরতপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। কৃষ্ণদাস বাবাজীর সংস্পর্শে, আসিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি একদিন বাবাজীকে বিনীতভাবে বলিলেন যদি তাঁহাকে (বাবাজীকে) সেবা করিবার অধিকার পান তবে নিজেকে ধন্য মনে

করিবেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী সাধু। তাঁহার কোন প্রকার সেবার প্রয়োজন নাই। তিনি রাজাকে বলিলেন যে বৃন্দাবনে গরীবদের সেবা করিলে তিনি সুখী হইবেন। উহাতে তাঁহার সেবা হইবে। রাজা গরীবদের সেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বার বার বাবাজীকে সেবা করিবার অধিকার দানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ বাবাজীকে ঐহিক ধনের দ্বারা সেবা করিবার প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজী রাজাকে পারলৌকিক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। রাজার মন পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজাকে বলিলেন যে যদি মহারাণী আসিয়া দেখা করেন তবে ভাল হয়। মহারাণী পর্দানসীন, অন্তঃপুরেই থাকেন। তথাপি রাজা বাবাজীর কথায় সম্মত হইলেন। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, পরিচারিকা সহ রাণী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজীর ভাবান্তর হইল, তাঁহার মনে হইল তাঁহার ইষ্ট রাধারাণী সম্মুখে। ইষ্টের দর্শন হইলে ভক্তের যেমন ভাবান্তর হয় বাবাজীরও তাহাই হইল, এদিকে রাণীর পরিচারিকাগণও রাণীর ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ভক্ত ও ইষ্টের মধ্যে প্রাণের সংযোগ না হইলে এরূপ সম্ভব হয় না। এই ঘটনার পর রাণী নূতন মানুষ হইলেন। তিনি কৃষ্ণের ভক্ত হইলেন, বাকী জীবন ভগবৎ-ধ্যান এবং দানধ্যানে কাটাইলেন।

জীবননাট্যে কৃষ্ণদাস বাবাজীর ভূমিকা শেষ হইয়াছে। তাঁহার ইষ্ট সন্নিধানে যাইবার ডাক আসিয়াছে। শুভদিনে তিনি মহা সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ভাস্করানন্দ সরস্বতী

উত্তর প্রদেশের রাজধানী না হইলেও কানপুর প্রসিদ্ধ শহর। গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে বিশেষ স্থানলাভ করিয়াছে। মিথেলপুর তাহার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান। মিশ্রলাল এই গ্রামেরই অধিবাসী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, উদার। ১৮৩৩ সালে শুভদিনে এক মহাপুরুষ তাঁহার ঘর আলোকিত করেন। নবজাত শিশুর নাম মতিরাম। তাঁহার জন্মের পর কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কালে মহাপুরুষ হইবে বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী করেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বিফল হয় নাই। শিশু কালে বিশ্ববিখ্যাত

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। বহু ভক্ত এবং মুক্তিকামী তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বাল্যেই মতিরামের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রখর মেধা, উদার মনোভাবে বহু লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট এবং বন্ধুভাবাপন্ন হয়। সমবয়সী আত্মীয়স্বজনও তাহার প্রতি সমবেদনাশীল। অল্পবয়সে পুত্রের সংসারের প্রতি উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া পিতা মিশ্রলাল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলের গলায় একটা বন্ধন ঝুলাইয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অভিসন্ধি পূর্ণ হইল। কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার সহিত মতিরামের বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিলেন। পিতামাতার অভিসন্ধি আংশিক পরিপূর্ণ হইলেও একেবারে পূর্ণ হয় নাই। কারণ বিবাহের পরও মতিরামের ধর্মভাব বিন্দুমাত্র কমে নাই। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী বিফলে যাইবার নয়।

ব্রাহ্মণসন্তান, শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে মূর্খ হইয়া থাকার অপবাদ সহ্য করিতে হইবে। তাহা মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। মতিরাম শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে বারাণসী আসিলেন। বারাণসী পুণ্যতীর্থ, ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার প্রিয় স্থান। কতকাল ধরিয়া অগণিত সাধক, সন্ন্যাসী, ভক্ত কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই তীর্থের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তার উপর কল-কল নাদিনী গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই প্রাচীন শহরটিকে বেষ্টন করিয়া ইহার মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য উভয়ই বাড়াইয়াছে। শুধু যে তীর্থ হিসাবে বারাণসীর সুনাম আছে তাহা নয়; অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণাগার। উচ্চ শিক্ষা করিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে বহু মেধাবী ছাত্র এখানে আসিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজে ধন্য হন এবং অন্যকেও ধন্য করেন।

কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া মতিরাম শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার অন্তরের সুপ্ত ধর্মভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। বিবাহ-বন্ধন মন হইতে উদাসীন ভাব দূর করিতে পারে নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল সংসারের অনিত্যত্ব ততই দৃঢ় হইল। এবং মুক্তিকামনা প্রবল হইল। জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান্ লাভ তাহা যতদিন পর্যন্ত না সফল হইতেছে ততদিন শান্তি নাই। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন, নাম, যশ, সম্পদ যাবতীয় ভোগ্যবস্তু মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে মাত্র, শান্তি যে আনিতে পারে

না এই বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। যাহা শান্তি আনে তাহার মূল্য ভোগ্য বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী। ভগবৎ প্রেমই মুক্তি, তথা শান্তি আসে, অতএব তাহাই একমাত্র কাম্য। একদিন সুযোগ আসিল। তাঁহার বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। যে শুভ রাত্রে তাঁহার সন্তান জন্মগ্রহণ করিল সেই রাত্রেই মতিরাম চিরতরে গৃহত্যাগ করিলেন। নবজাত পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বিষয়-সম্পদ সব পড়িয়া রহিল। সংসার তুচ্ছ হইল।

গৃহত্যাগ করিয়া মতিরাম উজ্জয়িনীতে আসিলেন। উজ্জয়িনী হিন্দুদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র, শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। বারো বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা বসে, অগণিত সাধু, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, ভক্ত, গৃহী কুম্ভের স্নানে ধন্য হন। নিকটেই মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। শিপ্রা নদীর তীরে বহু দেব-দেবীর মন্দির এবং স্নানের ঘাট, পবিত্র আবহাওয়া, মন্দিরে মন্দিরে নিত্য পূজা, আরতি, প্রার্থনা, মনে বিমল আনন্দ আনে। মতিরাম সুন্দর পরিবেশে তপস্যার স্থান নির্বাচন করিয়াছেন। এখানে তিনি বহু তান্ত্রিক যোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন। এত অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও তাঁহার একটা প্রধান জিনিসের অভাব রহিয়াছে। এখনও পথের হদিস মিলে নাই। মুক্তির চাবিকাঠি পাওয়া যায় নাই। গুরুকরণ হয় নাই। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত অধ্যাত্ম রাজত্বে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলে না। মতিরাম আবার তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এবার সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বারকায় আসিলেন। দ্বারকা প্রসিদ্ধ চারিধামের অন্যতম। রণছোড়জী (শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম) এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। বহু প্রাচীন মন্দির সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। মন্দিরের দৃশ্য যেমন মনোরম তেমন তার পবিত্র আবহাওয়া। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কত সাধু-সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যা করিয়া ইহার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর দিন এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। নিকটেই শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ। ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ইহার উদ্ভব। এই পুণ্যতীর্থে মতিরাম একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইহার পর মতিরাম আবার উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসেন। বেদান্ত অধ্যয়ন তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। এখন তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হইল। যে অভাবের জন্য তিনি তীব্র বৈরাগ্য সত্ত্বেও ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না এবার তাহা পূর্ণ হইল। তিনি গুরুকৃপা লাভ করিলেন সাতাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্র

গ্রহণ করিলেন। নূতন নাম হইল ভাস্করানন্দ সরস্বতী। কানপুরের অন্তর্গত মিথেলপুরের ব্রাহ্মণ মতিরাম ব্রাহ্মণত্বের দাবি ছাড়িয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। নিরন্তর তপস্যায় ডুবিয়া থাকিবার জন্য শ্মশানের নিকট এক নির্জন স্থান বাছিয়া নিলেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল তপস্যায় কাটাইলেন।

দ্বাদশ বৎসর পর সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে স্বদেশে ফিরিয়া জন্মভূমি দর্শন করিতে পারেন বিধি আছে। ভাস্করানন্দ স্বামী একবার জন্মভূমি মিথেলপুরে আসিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রসন্তান ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুত্রস্নেহে জড়াইয়া পড়িবেন আশংকা করিয়াই পুত্রের জন্মদিন রাত্রেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন সে আশংকা নাই, প্রতিবন্ধক চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর ভাস্করানন্দ সরস্বতী বহু দেশ ঘুরিয়া পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আসেন। হরিদ্বারের অপর নাম হরদ্বার অর্থাৎ হরির বা হরের দরজা। এখানেও দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভ এবং ছয় বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ হয়। অগণিত সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভক্ত, গৃহী নির্দিষ্ট তিথিতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ধন্য হন। মেলা ব্যতীত অন্য সময়ে নিত্য দেশ-দেশান্তরের অগণিত সাধু ভক্ত স্নান করিয়া থাকেন। গঙ্গার ধারে বহু দেব-দেবীর মন্দির। স্নানের বহু ঘাট, সন্ধ্যার সময় যখন আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, প্রার্থনা ও ভজন গানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। ঠোঙায় ফুল সাজাইয়া তার মধ্যে দীপ জ্বালাইয়া ভক্তেরা জলে ভাসাইয়া দেন। নদীর মৃদু তরঙ্গে দীপযুক্ত ফুলের ঠোঙা যখন হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে তখন অপূর্ব ভাবে মন আন্দোলিত হইতে থাকে। হিমালয়ের কোল দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার ধারা ভক্তের মনে ধর্মভাব জাগাইয়া তুলে। হরিদ্বার শুধু যে তীর্থক্ষেত্র তা নয়। শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেও ইহার মূল্য যথেষ্ট। ভাস্করানন্দ সরস্বতী এই তীর্থক্ষেত্রে আচার্য অনন্তরামের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

শিব ত্যাগের দেবতা, সন্ন্যাসীর ইষ্ট। সব ত্যাগ করিয়া মানুষ সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের ভক্ত, শিবের প্রতি বিশেষতঃ কাশীর ৺বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণার প্রতি টান হিন্দু মাত্রেরই আছে। সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দ সরস্বতীও র থাকিবে ইহা স্বাভাবিক, তিনি বারাণসী আসিলেন। এখানে তাঁহার তপস্যার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। গঙ্গাতীরে আসন করিয়া নিরন্তন ধ্যানে ডুবিয়া থাকেন। দেহের প্রতি দৃষ্টি নাই। আহার জুটিল ভাল, না জুটিলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে ভগবানের উপর যিনি নির্ভর করেন ভগবান তাঁহার ভার নেন। যোগক্ষেম বহন করেন।

মা অন্নপূর্ণার রাজত্বে কেহ অভুক্ত থাকে না। সময়ে হউক বা দেরিতে হউক আহার মিলিবেই ইহা লোকের বিশ্বাস। ভাস্করানন্দ সরস্বতী গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই গঙ্গাতীরে আসনে বসিয়া ধ্যানে নিরত থাকিতেন, তাঁহার তপস্যায় ইহাই বিশেষত্ব। প্রত্যেক কিছুরই সীমা আছে। কঠোরতারও সীমা আছে। দেহ প্রকৃতির বশে, প্রকৃতিকে অবহেলা করিলে প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ নেয়। সাধু, যোগী, ভক্ত বলিয়া কাহাকেও রেহাই দেয় না। ভাস্করানন্দ সরস্বতীকেও ছাড়ে নাই। অতিরিক্ত কঠোরতার ফলে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া গেল। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। চলচ্ছক্তিহীন হইবার উপক্রম হইল। এদিকে তাঁহার ত্যাগ, তপস্যার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে তাঁহাকে দেখিবার এবং শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। ভিড় এড়াইবার জন্য তিনি সাঁতরাইয়া গঙ্গার অপর পার রামনগর (ব্যাসকাশী) যান এবং সাধনভজন করিয়া দিন কাটান।

ইহার পর ভাস্করানন্দ সরস্বতীর জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। বারাণসী দুর্গাবাড়ীর নিকটে আমেঠীর রাজার একটা সুন্দর বাগান আছে। স্থানটি সুন্দর, নির্জন, গঙ্গা হইতে বেশী দূরে নয়, আদিঘাটের নিকটেই। বাগানে মাটির নীচে একটি গুহা আছে, ধ্যান, ভজন, যোগাভ্যাসের অনুকূল। আমেঠীর রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি উক্ত বাগানে একটিমাত্র শর্তে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শর্তটি এই যে তাঁহার ধ্যান, ভজন এবং যোগাভ্যাসের কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাগানে যখন তখন যাকে তাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। আমেঠীর রাজা উক্ত শর্তে রাজী হইলেন। ভিড় এড়াইবার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় জমিত তিনি স্বেচ্ছায় গুহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতেন, লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী কি রকম সাধু, তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির দৌড় কতদূর তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ কিংবা মহাপুরুষের ভান করিতেছেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমেঠীর রাজার মাথায় খেয়াল চাপিল। সন্ন্যাসীকে প্রলোভিত করিবার জন্য তিনি কয়েকজন সুন্দরী যুবতীকে রাত্রে ঐ বাগানে পাঠাইলেন এবং নিজে গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে নিয়ত রক্ষা করেন যাঁহার জন্য সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখেন, সুন্দরী যুবতীর রূপ কি করিয়া তাঁহার পতন ঘটাইয়া তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিবে? যে ঘটনা সে সময় ঘটিল তাহাতে স্প

বুঝা যায় ভগবানের অদৃশ্য হস্ত সকল সময়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হঠাৎ কোথা হইতে একটা বিষধর সর্প উপরিউক্ত রূপবতী যুবতীগণের প্রথমটির পায়ে বেড় দিল। সর্পটি স্থবিধা পাইয়াও যুবতীকে কামড়াইল না কিন্তু এমনভাবে বেড় দিল যে যুবতী এক পাও এদিক ওদিক নড়িতে পারিল না। ভয়ে তাহার শরীর অসাড় হইয়া আসিল। বিপদ দেখিয়া অন্যান্য রূপসীরা এবং গাছের আড়ালে লুক্কায়িত রাজা যে যেদিক পারিল ভয়ে পলায়ন করিল। রাত শেষ হইলে সকালে সর্পটি যুবতীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া আপন ভাবে চলিয়া গেল। এই ঘটনায় যুবতীর মনে ভীষণ পরিবর্তন আসিল; ধর্মজীবন যাপন করিয়া সে সুখী এবং ধন্য হইল।

দিন দিন বিখ্যাত যোগী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। সমাজের নানা স্তর হইতে বড়, ছোট, ধনী, দুঃখী, বিদ্বান্, মূর্খ তাঁহাকে দেখিবার কিংবা তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য ভিড় করিতে লাগিল। তিনি সর্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া তাহাদের শান্তির বাণী শুনাইতেন। তিনি সব সময়ে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। তাঁহার কঠোরতা কখনও শিথিল হয় নাই। কি গ্রীষ্ম, কি শীত সব সময়ে মাটির উপর শুইয়া থাকিতেন। ধরিত্রীকে যিনি মাতৃজ্ঞান করেন তাঁহার নিকট মাতৃকোল ব্যতীত অন্য সুখকর শয্যা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার নিকট নানা রকমের ভক্ত আসিতেন। কোন কোন ভক্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল আনিতেন, কোন ভক্ত উপাদেয় দুর্লভ মিষ্ট খাবার নিয়া আসিতেন, আবার কোন কোন ভক্ত ফল মিষ্টির লোভে আসিতেন। তাঁহার নিজস্ব প্রয়োজন কিছুই নাই। ফল, মিষ্টি যাহা আসিত তাহা সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। একবার কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিলেন। তিনি সন্ন্যাসী, অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি প্রণামী ফেরত দিলেন।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী আমেঠীর বাগানে থাকেন। তেওয়ারী তাঁহার দেখাশুনা করে। তেওয়ারীর উপর তাঁহার নির্দেশ ছিল যে ফলমূলাদি যাহা আসিবে তাহা ভক্তদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, কিছুই রাখা হইবে না। একদিন বারাণসীর মহারাজা তাঁহার সেবার জন্য অনেক ফল পাঠাইলেন। তেওয়ারী তাঁহার সেবার জন্য কিছু ফল আলাদা রাখিয়া দিল। খবর ভাস্করানন্দ সরস্বতীর কানে পৌঁছিলে তিনি তেওয়ারীকে খুব তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ভুল না হয় তার জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। তিরস্কারে তেওয়ারীর মনে দুঃখ হইয়াছে বুঝিয়া পরে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে তিনি ভক্তদের মুখে

ঐ ফল গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জন্য ফল আলাদা রাখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার নিকট ধনী, দারিদ্র, উচ্চ, নীচ অনেকেই আসিত। কাহাকেও বিমুখ করা তাঁহার নীতি নয়। দরিদ্র তাঁহার নিকট সমাদর পায় না, এই ধারণা যাতে তাহাদের মনে না হয় সেজন্য দরিদ্রদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। যেদিন তাহাদের জন্য দিন নির্দিষ্ট থাকিত সেদিন বড়দের সঙ্গে দেখা করিতেন না। বড়দের সুখী করিবার জন্য কখনও দরিদ্রদের অসম্মান করিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন মানী ব্যক্তি কিংবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও আসিতেন, তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এমন কি রাশিয়ার রাজবংশের নিকোলাস কিংবা ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম লকহার্ট প্রভৃতির ন্যায় মানী লোকেরও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইত। যার যাহা প্রাপ্য তিনি তাহাকে তাহা দিতেন। বড় এবং বিশিষ্ট লোককে যেমন সম্মান করিয়া চলিতেন, সহায় তেলির মত অস্পৃশ্য ঘৃণ্য সাধারণ নিঃসম্বল দরিদ্র আসিলেও অনুরূপ সম্মান দেখাইতেন। যেদিন মানী, বড় এবং বিশিষ্ট লোকেদের জন্য দিন নির্দিষ্ট ছিল সেদিন গরীবরা আসিত না। বহু বিশিষ্ট লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। আমেরিকার বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়াইন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করিয়া যে ধারণা পোষণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার 'মোর ট্রায়াম এব্রড' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহার ভাস্করানন্দ সরস্বতীর) নিকট মান, যশ অতি তুচ্ছ বিষয়। এই প্রসিদ্ধ যোগীর নিকট বড় ছোট সকলেই সমান ব্যবহার পাইতেন। আগ্রার তাজমহল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ইহা সর্ববাদীসম্মত কিন্তু এই মহাপুরুষের অন্তর তাজের মহিমাকে ম্লান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত সুন্দর এবং পবিত্র যে ইহার তুলনা মিলে না। খৃষ্টধর্মের জনৈক প্রসিদ্ধ নেতা ডাক্তার ফেয়ার বার্ণ ভাস্করানন্দ সরস্বতীর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া বলেন 'তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া পবিত্রতার স্বরূপ কি বুঝিতে পারিয়াছি। জগতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন আধ্যাত্মিক আবহাওয়া আর কোথাও অনুভব করি নাই। অন্য স্থানের অনুভব ইহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।'

বারাণসীর বিখ্যাত সাধু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম জানেন না এরকম লোক অল্পই আছে। তিনি প্রকৃতির প্রিয় সন্তান, ব্রহ্মজ্ঞ, সদানন্দ পুরুষ। অনেকে তাঁহাকে সচল বিশ্বনাথ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। প্রসিদ্ধ বেদান্তী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গেও অনুরূপ সৌহার্দ্য ভাব ছিল। বহু বিখ্যাত লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য,

নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাহাদের অন্যতম, আধ্যাত্মিক উন্নত মহাপুরুষদের তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে অনুরূপ সম্মান দেখাইতেন। ছোট, বড় সকলের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পাইতেন। ঈশ্বরের মধ্যে ছোট-বড় থাকিতে পারে না। একবার কোন দেশীয় রাজা তাঁহার সম্মুখে এক থালা স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভাস্করানন্দ সরস্বতী তৎক্ষণাৎ তাহা ফেরত দিলেন। তীর্থস্থানে বহু পাণ্ডা থাকে, তাহাদের অনেকেই গুণ্ডা প্রকৃতির। চাল-চলন ভাল নয়। যাত্রীদের ঠকায়, ধনী এবং সুন্দরী যুবতী পাইলে তাহাদেরও প্রবঞ্চনা করিয়া সর্বনাশ করে। ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পাণ্ডার জীবনে পরিবর্তন হইয়াছে। দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিয়াছে; সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ, ইহা শাস্ত্রবাক্য।

একবার কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট জজ, লেখক এবং মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে আসেন। আলোচ্য বিষয় ছিল জগৎ নিত্য কি অনিত্য। এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কিছু সন্দেহ ছিল। আলোচনার সময় দেখা গেল হঠাৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী অদৃশ্য হইয়াছেন। এইভাবে অন্তর্ধান হইয়া তিনি দেখাইলেন যে জগৎ এই আছে এই নাই; জগতের নিত্যত্ব ধারণা ভুল, দৃশ্যজগৎ ভ্রমাত্মক। নাম-রূপ বিনাশশীল। সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিয়া দত্ত মহাশয়ের ধারণা বদলাইল। আর একদিন ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আফ্রিদিদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি কিভাবে জয়লাভ করেন তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি খুব আত্মশ্লাঘা করেন। ভাস্করানন্দ সরস্বতী মনস্তত্ত্ববিদ্। অন্যের মনোভাব সহজে বুঝিতে পারেন। প্রধান সেনাধ্যক্ষের অহঙ্কারে ঘা দেওয়ার জন্য তাঁহার সম্মুখে একটি পেন্সিল রাখিয়া উহা তুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এত বিরাট্ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যিনি শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সামান্য একটা পেন্সিল উঠান তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়াও যখন তিনি পেন্সিল তুলিতে পারিলেন না, তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। তখন তাঁহার ভুল ভাঙিবার জন্য ভাস্করানন্দ সরস্বতী বলিলেন যে ভগবানের ইচ্ছাতেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে, প্রধান সেনাপতির শক্তিতে নয়। তাঁহার ইচ্ছাতে জগৎ চলে, তিনি ইছাময়। সুতরাং আত্মশ্লাঘা করা ভাল নয়। প্রধান সেনাধ্যক্ষের নূতন শিক্ষা হইল।

আর একবার বারাণসীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের কঠিন অসুখ হয়। বাঁচিবার কোন লক্ষণ নাই। ঔষধে কোন

ফল হয় নাই। তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতীর শরণাপন্ন হইলেন এবং পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিলেন। সাধুর দয়ার হৃদয়, তিনি ডাক্তারের হাতে একটা ফল দিলেন। পুত্র ফল প্রসাদ খাইয়া ভগবৎ কৃপায় সুস্থ হইয়া উঠিল। সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ডাক্তারেয় মন ভরিয়া উঠিল। অন্য একদিন পূর্ববঙ্গের এক ভদ্রলোক ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন এমন সময় তিনি বাধা দিয়া প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন কারণ পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার অশৌচ হইয়াছে, গৃহে ফিরিয়া তিনি দেশের টেলিগ্রামে জানিলেন যে স্বামীজীর কথা সত্য। তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ঢাকার চণ্ডীচরণ বসু বয়স্ক অফিসার। বহুদিন যাবৎ বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন, বহু চিকিৎসাতেও কিছু ফল হয় নাই। নিতান্ত হতাশ হইয়া ভাস্করানন্দ সরস্বতীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভাস্করানন্দ সরস্বতী অভিমত প্রকাশ করিলেন যে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাই ভাল। তিনি উপযুক্ত লোক। তবে দীক্ষা লইবার জন্য ঢাকায় যাইবার প্রয়োজন হইবে না, কোন কারণ বশতঃ তিনি (উক্ত কুলগুরু) বারাণসীতে আসিয়াছেন। যথাসময়ে চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়ের দীক্ষা হইয়া গেল। চণ্ডীচরণ দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগ হইতে মুক্তি পাইলেন। ইহা ভগবৎ কৃপা কিংবা গুরুদীক্ষা কিংবা স্বামীজীর যোগশক্তির প্রভাব বুঝা কঠিন।

ভাস্করানন্দ স্বামীর বহু বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। অযোধ্যার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি একদিন ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে দেখিতে আসিলেন। উভয়ে পায়চারি করিতেছেন, হঠাৎ স্বামীজী মহারাজের হীরার আংটিটি দেখিতে চাহিলেন। মহারাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ আংটিটি তাঁহার হাতে দিলে তিনি অবিলম্বে খেলার ছলে দুর্গাকুণ্ডে (দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার বাসস্থানের ধারে পুকুরে) ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর যোগশক্তির কথা বিশেষভাবে জানেন। হীরার আংটি পুকুরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন বলিয়া তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার প্রশান্ত মুখ দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন যে জলের নীচে হাত দিলেই উহা পাওয়া যাইবে। মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ দুর্গাকুণ্ডের জলে হাত দেওয়া মাত্র অনেকগুলি হীরার আংটি পাইলেন, সবগুলিই এক রকম, কোনটা তাঁহার নিজের তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। স্বামীজী প্রকৃত আংটিটি বাছিয়া মহারাজার হাতে দিলেন। স্বামীজীর যোগবিভূতি দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। ইহার পর মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ অন্যান্য আংটিগুলি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। অন্য একদিন মহারাজ স্বামীজীর নিকট

বসিয়া আছেন। এমন সময় তিনি মন্ত্রীর নিকট হইতে জরুরী টেলিগ্রাম পাইলেন যে তিনি (মহারাজা) যেন পরের ট্রেনে অবশ্য অবশ্য চলিয়া আসেন। যোগীরা ভবিষ্যতের আভাস পান, স্বামীজী মহারাজাকে পরের ট্রেনে যাইতে নিষেধ করিলেন। স্বামীজীর কথায় প্রতাপনারায়ণ সিংহের অগাধ বিশ্বাস, তিনি উক্ত ট্রেনে গেলেন না। পরে জানিতে পারিলেন যে, যে ট্রেনে তাঁহার যাওয়ায় কথা ছিল তাহা লাইনচ্যুত হইয়াছে। দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। স্বামীজীর উপর বিশ্বাস থাকায় মহারাজার প্রাণ রক্ষা পাইল।

একদিন বহু সাধু ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট সৎপ্রসঙ্গ করিতে আসিলেন। প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চলিল। কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল কাহারও হুঁশ নাই। তখন স্বামীজীর মনে হইল এত সাধু এত বেলায় অভুক্ত চলিয়া যাইবে ইহা ঠিক নয়। তিনি সাধুদের ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধুরা ভোজনে বসিলে তিনি প্রত্যেক সাধুকে কে কি খাইতে চান জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুরা ক্ষীর, ছানা, দধি, সন্দেশ, রসগোল্লা, আম, কমলা যাহা প্রাণ চায় খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধুরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে প্রত্যেকের প্রার্থিত খাবার তাঁহার সম্মুখে মিলিয়াছে এবং তাহা খাইয়া প্রত্যেকে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। যোগশক্তি দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়।

জীবনের শেষভাগে তিনি একবার জন্মভূমি মিথেলপুর দর্শন করিতে অসিলেন। তিনি পূর্বে সংবাদ দিয়া আসেন নাই। তথাপি বহু বৎসর পরে স্থানীয় লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া খুব সম্মান দেখাইলেন। প্রতিবেশীরা তাঁহার নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটা উঁচু প্ল্যাটফরম নির্মিত হইল। প্ল্যাটফরমে উঠিবার পূর্বে তিনি লছমন মালা নামক একজন সামান্য জেলেকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং প্ল্যাটফরমের উপরে তাহাকে পাশে বসাইয়া খুব সম্মান দেখাইলেন। জনতাকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন যে লছমন মালা ভক্ত, জ্ঞানী, সামান্য জেলে হইলেও তাহার অন্তরে ধর্মের অমূল্য খনি লুক্কায়িত আছে। মহৎ ব্যক্তি অমানীকে মান দিয়া থাকেন। সমদর্শিত্ব তাহাদের প্রাণের ধর্ম।

কিছুদিনের মধ্যে ভাস্করানন্দ সরস্বতী বারাণসী ফিরিয়া আসিলেন। সাধুসঙ্গে দিন ভালই কাটিতেছে। শেষের দিকে তাঁহার পেটে একটা যন্ত্রণা হইল। উহা ক্রমশ অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরিল না। ১৮৯৯ সালের ২৫শে আষাঢ় তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

॥ আটত্রিশ ॥

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি ত্যাগ, তপস্যা যোগ, ভক্তি জ্ঞান দ্বারা উহা লাভ করেন তিনি ধন্য, তিনি দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করেন। তিনি জাগরণের পুরোহিত, ভারতের চির আচরিত একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ অবলম্বন করিয়া সর্বযুগের সর্বমানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকল দেশের সকল মানবের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে। তিনি প্রতিভাবান, বিশ্বমনা। যোগশক্তির প্রভাবে বিশ্বমনে অলক্ষ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁহার ভাবময় জীবনের উচ্চ আদর্শ মানুষের নিত্য নূতন প্রেরণা যোগায়। তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে, পথের নির্দেশ দেয়, সত্যের দিকে মনকে ধাবিত করে ; তিনি মহাপুরুষ, সিদ্ধ যোগী, তিনি ধন্য।

অন্ধ্রপ্রদেশে ভিজিয়ানাগ্রামের অন্তর্গত হোলিয়া একটি বিশিষ্ট গ্রাম। নরসিংহ রাও এই গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, স্ত্রী বিদ্যাবতীও স্বামীর মত ধর্মপরায়ণা, অবস্থা ভাল, অর্থের ভাবনা নাই, ভগবৎসেবা, সাধুসেবা এবং ধর্ম আচরণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিন যায়। কিন্তু তবুও তাঁহাদের মনে শান্তি নাই, অশান্তির কারণ তাঁহারা অপুত্রক। মা-ষষ্ঠীর কৃপায় বঞ্চিত। যে গৃহস্থের বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নাই তাঁহাদের মনে যে কত দুঃখ তাহা একমাত্র তাঁহারাই জানেন। বংশে বাতি দিবার কেহ নাই, পিণ্ড লোপ পাইবে, বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিবার কেহ নাই ইহার অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে। আবার দেখা যায় যাহার ঘরে অন্ন নাই, জমিজমা নাই—তাঁহাদের উপর মা ষষ্ঠীর অজস্র কৃপা, গণ্ডা গণ্ডা ছেলেমেয়ে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না বিদ্যাশিক্ষার সুযোগের অভাবে ছেলেগুলি অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে ; তাহাদের দুঃখও কম নয়, তাহারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। সুতরাং সন্তান না থাকিলে যেমন কষ্ট তেমনি থাকিলেও কষ্ট। নরসিংহ রাও শিবের উপাসক, শিব তাঁহার গৃহদেবতা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পুত্রকামনায় নিয়ত শিবের নিকট প্রার্থনা করেন। শিবের অপর নাম আশুতোষ। সহজে তুষ্ট হন, স্বামী-স্ত্রীর অনন্ত ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাদের

প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার কৃপায় নরসিংহ রাওয়ের এক পুত্রসন্তান জন্মিল। বিদ্যাবতীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়া গেল। মাতৃত্বের স্বাদ মিটিল, ঘর আলো হইল। শিবের দান বলিয়া নবজাত বালকের নাম রাখা হইল শিবরাম। এই বালকই পরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। পরেও নরসিংহ রাওয়ের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম শ্রীধর। শিবের কৃপায় মনের অশান্তি দূর হইয়াছে। পিণ্ড লোপ পাইবে না।

শৈশব অবস্থাতেই শিবরামের উপর শিবের কৃপাদৃষ্টি দেখা যায়। একদিন খেলিতে খেলিতে শিবরাম ঘুমাইয়া পড়ে, হঠাৎ একটা জ্যোতি তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাতা বিদ্যাবতী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ছেলের অকল্যাণ হইবে আশংকা করিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। বালকের বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ অন্যান্য ব্যাপারেও প্রকাশ পাইতে থাকে। শিব ত্যাগী, সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রভাব ভক্তের উপর পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। শিবরাম শিবের দান। তাহার মধ্যে ছোটবেলা হইতে সংসারে অনাসক্তি, বিষয়ে বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহার মাত্রা বাড়িয়া চলিল। যৌবনের উন্মেষে পিতা বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। শিবরাম জীবনের মূল সমস্যা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। বিবাহ করিতে রাজী নন। ধর্মজীবন যাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ধর্মপরায়ণা মাতা পুত্রকে সংকল্পে অবিচলিত থাকিতে প্রেরণা যোগান। বিবাহ লইয়া যখন শিবরামের সঙ্গে মতবিরোধ হইত তখন মাতা বিদ্যাবতী পুত্রের পক্ষে ওকালতি করিতেন। মাতা পুত্র একপক্ষ অবলম্বন করাতে পিতা নরসিংহ রাওয়ের পরাজয় ঘটিত। তখন নিরুপায় হইয়া পিতা চুপ করিয়া থাকিতেন। এইভাবে পুত্রের বিবাহ চেষ্টা বার বার বিফল হয়। মাতার প্রেরণায় পুত্রের মধ্যে ধর্মভাবের উন্মেষ হয়। জগতের অনিত্যত্ব বোধ দৃঢ় হয় এবং সৎপথের কণ্টক একে একে দূরীভূত হয়। মাতার আশীর্বাদে কালে পুত্র বিশ্ববিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামী হন।

শিবরামের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ভাবী সন্ন্যাস জীবনের প্রথম বাধা বিদূরিত হইল। বারো বৎসর পরে মাতা বিদ্যাবতীরও দেহত্যাগ হইলে দ্বিতীয় বাধা দূর হইল। পিতামাতা জীবিত থাকিতেও শিবরাম বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। কোন নির্জন স্থানে, কিংবা শ্মশানে কিংবা নদীর তীরে গিয়া নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতেন। পিতামাতার দেহত্যাগের পরও নিত্য অনুরূপ ধ্যানাভ্যাস করিয়া ভাবী সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পূর্বেই

বলা হইয়াছে বিষয়ের প্রতি শিবরামের বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। ছোট ভাই শ্রীধরের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজ সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। বিপুল সম্পত্তির নিজের অংশ ভাইয়ের নামে লিখিয়া দিলেন। ভাইয়ের চোখের জল, আত্মীয়-স্বজনের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। মাতৃবিয়োগের পরও বিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি গৃহে থাকিয়া নির্জনে ধ্যানাভ্যাস করিতেন। একদিনের জন্যও ইহা হইতে বিরত হন নাই। এই সময়ে পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ যোগী ভাগীরথানন্দ সরস্বতী ঘুরিতে ঘুরিতে হোলিয়া গ্রামে আসেন। সৌভাগ্যবশতঃ শিবরামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শিবরামকে যোগধর্মে দীক্ষিত করিলেন। গুরুর আদেশে শিবরাম চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ পুস্করতীর্থে আসেন। এই তীর্থে যখন তাঁহার সন্ন্যাস দীক্ষা হয়, তখন তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর। তাঁহার নূতন নাম হইল গণপতি সরস্বতী। হোলিয়া গ্রামের জমিদার নরসিংহ রাওয়ের প্রথম সন্তান শিবরাম এখন হইতে এই নামে পরিচিত হন। তেলেগু দেশে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি সকলের নিকট তেলেঙ্গ বা ত্রৈলঙ্গ স্বামী (অপভ্রংশ) নামে পরিচিত। পুস্করে দশ বৎসর যাবৎ কঠিন যোগাভ্যাসে রত থাকিয়া তিনি গুরুর দেহরক্ষার পর তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইলেন।

গণপতি সরস্বতী তথা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর এখন ৮৮ বৎসর বয়স। শরীরে বার্ধক্যের কোন চিহ্ন নাই। বহুকাল যোগাভ্যাসে রত থাকার ফলে তাঁহার শরীর খুব হাল্কা হইয়াছে। শরীর স্থূল হইলেও কর্মক্ষমতা অটুট, সিদ্ধি করতলগত। অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী; উহার নিষ্কাম প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট জনকল্যাণ সাধনে সমর্থ। তীর্থভ্রমণকালে রামেশ্বরের পথে হঠাৎ এক জনাকীর্ণ মেলার নিকটে কান্নার শব্দ শুনিয়া তিনি থামেন। নিকটে আসিয়া দেখেন একজন মৃত ব্রাহ্মণ বালককে ঘেরিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন কান্নাকাটি করিতেছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দয়ার হৃদয়। শান্তভাবে ভিড়ের মধ্যে বালকের নিকট আসিয়া বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার গায়ে হস্তস্থিত কমণ্ডলুর কিছু জল ছিটাইয়া দিয়া তিনি নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে বালকের দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। উঠিয়া চারিদিকে চোখ মেলিয়া আছে। চারিদিকে খোঁজ করিয়াও সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

নেপালের রাজবংশের রাণা উপাধি। তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধবিদ্যা এবং শিকারে তাঁহাদের হাত পাকা। শিকার উদ্দেশ্যে রাজপরিবারের জনৈক যুবক একদিন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটা বাঘকে লক্ষ্য করিয়া বার বার গুলি ছুঁড়িলেন।

নিজের কৃতিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও তাঁহার গুলিতে যে বাঘ বিদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না। বাঘের অবস্থা নিজে পরীক্ষা করিবার জন্ম শিকারী আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকাইয়া গেলেন। অবিলম্বে তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাঁহার একটি গুলিও বাঘের গায়ে লাগে নাই, সবগুলিই ফস্‌কাইয়াছে। তিনি দেখিলেন বাঘটি একজন যোগীর সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আর ভীষণ ভাবে গোঁ গোঁ করিতেছে। মনে হয় যোগীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রাণরক্ষার্থ আবেদন জানাইতেছে। আর যোগী হিংস্র জানোয়ারের পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা এবং অভয় দান করিতেছেন। এই ভাবে লুটাইয়া পড়া শরণাগতের আত্মনিবেদন কিনা বুঝা কঠিন। জানোয়ারের ভাষা এক, মানুষের ভাষা অন্য। কিন্তু উভয়ের প্রাণের ভাষা এক। প্রাণের যোগাযোগ থাকিলে ভাষা প্রতিবন্ধক হয় না। মানুষের ভাষা জানোয়ার এবং জানোয়ারের ভাষা মানুষ বুঝিতে পারে। যোগী জ্ঞানী, তিনি সর্ব প্রাণীতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব প্রাণীকে অনুভব করেন। তাঁহার পক্ষে প্রাণের যোগাযোগ বুঝা সম্ভব, অন্যের পক্ষে নয়। রাণাকে দেখিয়া যোগী নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, রাণা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন যে শুধু মনের খেয়াল মিটাইবার জন্ম প্রাণী বধ করা ঠিক নয়। শিকার হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। ভগবান যেমন মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন সেরূপ জানোয়ারও সৃষ্টি করিয়াছেন। ভালবাসা দ্বারাই সম্বন্ধ নিরূপণ হয়। ভগবানকে ভালবাসিলে তাঁহার সৃষ্ট জীব-জানোয়ারকেও ভালবাসা যায়। জানোয়ারকে ভালবাসিতে শিখিলে জানোয়ারও মানুষকে ভালবাসিবে। মানুষ হিংস্রভাব পরিত্যাগ করিলে জানোয়ারও হিংস্রভাব পরিত্যাগ কবিবে। ভালবাসায় অসম্ভব সম্ভব হয়। ভালবাসাই প্রাণের যোগসূত্র। যোগীর প্রেম যুবক রাণাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই যোগী আর কেহ নন। আমাদের পূর্ব পরিচিত ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তিনি যখন নেপালের গভীর জঙ্গলে নির্জনে ধ্যানাভ্যাসে রত ছিলেন তখন এই ঘটনাটি ঘটে, রাজবংশের যুবক শিকারীর মুখে খবর পাইয়া নেপালের মন্ত্রী স্বয়ং জঙ্গলে গিয়া যোগীকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ইহার পর যোগীর সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দূর দূর দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জঙ্গলে ভিড় করিতে লাগিল। নির্জনতা ভঙ্গ হইল। যোগী নির্জনপ্রিয়, সব সময়ে ভিড় এড়াইয়া চলেন। ভিড়ে যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বাধ্য হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ইহার পর নেপালের বহু তীর্থ, তিব্বত, মানস-সরোবর এবং হিমালয়ের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। হিমালয়ে ভ্রমণকালে একদিন পথে দেখিতে পাইলেন এক বিধবা মহিলা সাত বৎসরের মৃত পুত্রকে কোলো নিয়াক রুণ চীৎকার করিতেছেন। পুত্র-বিরহে কাতর মহিলার ক্রন্দন কিছুতেই থামে না দেখিয়া যোগীর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া তিনি মৃত বালকটিকে স্পর্শ করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি আওড়াইয়া কমণ্ডলু হইতে কিছু জল ছিটাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বালকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, পুত্রের জীবন পাইয়া মাতা শান্ত হইলেন। খবর পাইয়া চারিদিক হইতে লোক জড় হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে যোগী কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন তাঁহার কোন খবর পাওয়া গেল না।

ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নর্মদাতীরে আসিলেন। এখানে বহু সাধু, যোগী, মহাপুরুষ যোগসাধনে মগ্ন থাকেন। বিখ্যাত মার্কণ্ডের আশ্রমের অন্তর্গত এক নিভৃত স্থানে থাকিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামী আট বৎসর যোগাসনে রত থাকেন। এই আশ্রমে কাকিবাবা নামে আর একজন যোগী থাকেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী নর্মদার জলে নুইয়া জল পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর নর্মদার জলে দুধের স্রোত বহিতেছে; তিনি প্রাণ ভরিয়া দুধ পান করিতেছেন। দুধ পান করিবার প্রবল ইচ্ছা নিয়া কাকিবাবা নর্মদায় নামিয়া স্পর্শ করিবামাত্র দুধের স্রোত আবার জলের স্রোতে পরিণত হইল। এই খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে চারিদিক হইতে অগণিত লোক আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। ইহা এড়াইবার জন্য ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর (গুপ্ত) সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন। ইহা মহাতীর্থ, বারো বৎসর অন্তর পূর্ণ কুম্ভ, ছয় বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ বসে। কুম্ভ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু ভক্ত গৃহী আসিয়া পুণ্যস্নান ধন্য হন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসেও এখানে বহু সাধু ভক্ত বসবাস করেন এবং জপ, ধ্যান, স্নানাদি করিয়া পুণ্য অর্জন করেন। এইখানে থাকিবার কালেও তাঁহার অলৌকিক শক্তি কিছু প্রকাশ পায়। একদিন রামতরণ ভট্টাচার্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একটা নির্জন স্থানে অপেক্ষা করিতে দেখিতে পাইয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইয়া আমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময় ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, একখানা যাত্রীভর্তি নৌকা নদীর মাঝে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। নৌকা ভীষণ ঢেউএ হেলিতেছে দুলিতেছে, ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে। যাত্রীদের অনেকেই ভয়ে কাতর ক্রন্দন করিতেছে। এমন সময়ে

নৌকার মাঝি এবং যাত্রীদের অলক্ষে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নৌকায় প্রবেশ করিলেন। নৌকা যাত্রীসহ নিরাপদে তীরে পৌছিল। যাত্রীদের দৃঢ় ধারণা হইল যোগীর অলৌকিক শক্তিতেই তাঁহারা বিপদমুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া ভক্ত রামতারণ ভট্টাচার্য অলৌকিক ঘটনার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে প্রত্যেকের মধ্যে দেবত্ব সুপ্তভাবে আছে। সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইলে সকলই সম্ভব হয়। যাহা আপাত-অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে সুপ্ত শক্তির বিকাশ মাত্র।

এলাহাবাদ হইতে তিনি ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার প্রিয় স্থান বারাণসী আসিলেন। তাঁহার বাকী জীবন এইখানেই কাটিল। অনেকের ধারণা ছিল কাশীর বিশ্বনাথ অচল। কিন্তু তাঁহারা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে সচল বিশ্বনাথ রূপে শ্রদ্ধা করিতেন। দেশ দেশান্তরের ভক্ত যাত্রী যেমন ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা, কেদার, দুর্গাবাড়ীতে গিয়া ভক্তিভরে বিগ্রহাদি দর্শন করিতেন, এই যোগীকেও সেরূপ সচল বিগ্রহরূপে দর্শন করিতেন। বারাণসীতে থাকার কালেও তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়। একদিন লৌহারকুণ্ডের পাশ দিয়া যাইবার সময় তিনি একটা দুঃখপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া বিচলিত হন। আজমীঢ় নিবাসী ব্রহ্মসিংহ জন্মবধির, তার উপর কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত। দুঃখের প্রতিমূর্তি ব্রহ্মসিংহকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে দেখিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইল। তিনি মুমূর্ষু রোগীর নিকটে যাইবামাত্র তাঁহার রোগ যন্ত্রণা কমিয়া গেল। ব্রহ্মসিংহ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনর্গল শিবের স্তোত্র আওড়াইতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ব্রহ্মসিংহের সামনে একটা বিল্বপত্র রাখিলেন এবং লৌহারকুণ্ডে স্নান করিয়া উক্ত বিল্বপত্রটি মস্তকে ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন। ব্রহ্মসিংহ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, এই ঘটনার পর তিনি যোগীর একনিষ্ঠ ভক্ত হইলেন।

এই রকম আরও বহু অলৌকিক শক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সীতানাথ ব্যানার্জী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কঠিন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া বহুদিন ভুগিয়া কঙ্কালসার হন। একদিন সন্ধ্যায় স্নান করিতে যাইবার সময় মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া স্পর্শ করেন এবং ঔষধ হিসাবে গঙ্গাজল পান করিতে পরামর্শ দেন। গঙ্গাজলে রোগীর কষ্টের উপশম হইল। তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং ৺বিশ্বনাথের পূজা দেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক বহুদিন যাবৎ পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বহু ঔষধ সেবন করিয়াও রোগের কিছুতেই উপশম হয় না। স্বামীর কল্যাণ কামনায় তাঁহার স্ত্রী নিত্য ৺বিশ্বনাথের

পূজা দেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী সদানন্দময় পুরুষ, প্রকৃতির কৃতি সন্তান, প্রকৃতির কোলেই পালিত। তাঁহার নিকট শীত-গ্রীষ্ম সব সমান। ঘৃণা, লজ্জা ভয়ের পার। কাপড়-চোপড়ের কিছুই প্রয়োজন নাই, উলঙ্গ থাকেন। উক্ত সম্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রমহিলা একদিন ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার পথে তাঁহাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া অসভ্য বলিয়া যথেষ্ট গালাগালি করিলেন। সেই রাত্রেই মহিলা ভীষণ স্বপ্ন দেখেন। কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে ৺বিশ্বনাথের পূজায় কিছুই হইবে না, তাঁহার স্বামীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে অপমান করিয়া তিনি ভীষণ অপরাধ করিয়াছেন। পরের দিন মহিলা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট গিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামী দয়া করিয়া তাঁহাকে কিছু বিভূতি দিয়া বলিলেন যে উহা মালিশ করিলে তাঁহার স্বামী সুস্থ হইয়া উঠিবে, ঘটনাও তাহাই হইল।

আর এক দিন কোন দেশীয় রাজা তীর্থ-উপলক্ষে সপরিবারে বারাণসী আসিযাছেন। তাঁহার পরিবারের লোকেরা পর্দানসীন, ঘেরা দেওয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্নানের সময় হঠাৎ উলঙ্গ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন। অসভ্যতা প্রকাশের জন্য উক্ত রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তারপর স্থানীয় লোকেদের বহু অনুনয়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে কিন্তু যথেষ্ট অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া তবে ছাড়িলেন। ঐ রাত্রেই রাজা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন, শিবের মত কে যেন যোগীকে অপমান করিবার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ত্রিশূল হাতে নিয়া বারাণসী হইতে তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন। রাজা ভয়ে অস্থির। পরের দিন রাজা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী শিবের দান, সহজে শিবের প্রিয়, সুতরাং যোগীরও প্রিয়। তিনি অনেক সময় জলে ভাসিয়া থাকিতেন এবং স্রোতের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেন। প্রকৃতির প্রিয় সন্তান এই ব্রহ্মজ্ঞানীকে ছোট বড় সকলে শ্রদ্ধা করেন। আর একদিন উজ্জয়িনীর মহারাজা নৌকা করিয়া গঙ্গা দিয়া যাইতেছিলেন। তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গার জলে ভাসিতেছিলেন। হঠাৎ নৌকার উপর উঠিয়া পড়িলেন। মহারাজা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহারাজার কোমরে অসি ঝুলানো ছিল। বহু অর্থ এবং সৈন্য দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া বৃটিশরাজ তাঁহাকে উক্ত অসি উপহার দেন। বৃটিশের দেওয়া অসিটি তিনি সব সময়ে কোমরে ঝুলাইয়া রাখিতেন। কখনও হাতছাড়া করিতেন না। ত্রৈলঙ্গ স্বামী

ছেলেমানুষের মত বার বার অসির দিকে তাকাইলেন এবং অসিটি দেখিতে চাহিলেন। মহারাজা তাঁহার হাতে অসিটি দিলে তিনি উহা দুইবার ঘুরাইয়া খেলার ছলে গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। এত সম্মানের অসি খোয়া গিয়াছে বলিয়া মহারাজা ভীষণ চটিয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠেন এবং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্ত তিনি জলের নীচে হাত দিয়া একই রকমের দুইখানা অসি উঠাইয়া মহারাজকে তাঁহার নিজের অসিখানা বাছিয়া নিতে বলিলেন। মহারাজ কোন্‌টা নিজের ঠিক করিতে পারিলেন না দেখিয়া যোগী প্রকৃত অসিখানি মালিককে ফেরত দিয়া অপরটা আবার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। মহারাজ নিজের বোকামির জন্য দুঃখিত হইয়া যোগীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর একদিন গঙ্গায় যাইবার পথে যোগী শ্মশানে দেখিলেন, কোন দরিদ্র মহিলা মৃত স্বামীর নিকটে বসিয়া করুণ ক্রন্দন করিতেছেন। পূর্বদিন রাত্রে বিষধর সর্পের কামড়ে স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। দয়াপরবশ হইয়া যোগী গঙ্গার মাটি নিয়া সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে মালিশ করিয়া দৌড়িয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত ব্যক্তির শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইল। তিনি সুস্থ লোকের মত অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তাহাকে শ্মশানে আনা হইয়াছে। যোগীর অলৌকিক যোগ-শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব হয়।

বারাণসীর জিলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন একজন ইংরেজ। তিনি আধুনিক সভ্যতার দেশের লোক। শালীনতাবোধ খুব আছে। উলঙ্গ থাকা শালীনতা-বিরোধী। সিদ্ধ যোগীপুরুষ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। তাঁহার মাথায় খেয়াল চাপিল উলঙ্গ স্বামীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে তিনি যেন কাপড় পরিয়া সমাজে দশজনের মত থাকেন। আর কখনও উলঙ্গ থাকিতে সাহস না পান। একদিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট নিয়া কয়েকজন পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া যাইবার জন্ত আসিল। তিনি যাইতে রাজী নন। অতঃপর অধিক সংখ্যক পুলিস আসিলে সুবোধ বালকের মত তিনি তাহাদের অনুগমন করিলেন। কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটর আদেশক্রমে যতবার তাঁহাকে হাতকড়া দিয়া বন্ধনের চেষ্টা হয় ততবারই তিনি অলৌকিক যোগশক্তির প্রভাবে সরিয়া যান এবং পরক্ষণেই আবার সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকেন। চোখের সামনে বহুবার এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট হতভম্ব হইলেন। বুঝিলেন এই উলঙ্গ লোকটি সামান্ত নয়। এই সময়ে একজন বিশিষ্ট

উকিল সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে জানিতেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইয়া দিলেন যে ত্রৈলঙ্গ স্বামী সাধারণ লোক নন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, মুক্তপুরুষ। প্রকৃতির প্রিয় সন্তান, সমদর্শী। তিনি চন্দন এবং বিষ্ঠা এক বোধ করেন। তাঁহার নিকট বন্ধন মুক্তি সব সমান। তাঁহার উচ্চ নীচ ভেদ চলিয়া গিয়াছে। কাপড় পরিলে, না পরিলে তাহার কিছু আসে যায় না। উকিলের কথা সত্য কিনা বুঝিবার জন্য তিনি বলিলেন যে যদি ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁহার সম্মুখে অখাদ্য খাইয়া দেখান তবে তিনি বিশ্বাস করিবেন নইলে নয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামী একটা শর্তে রাজী হইলেন। শর্ত এই যে তিনি যাহা খাইবেন ম্যাজিস্ট্রেটকেও তাহা খাইতে হইবে। তখন কোর্টে সকলের সম্মুখে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বাহ্য করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত বিষ্ঠা অন্য কেহ খাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা। ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিতে গেলেন। উহা যে অন্য কাহারও খাওয়া সম্ভব নয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামী উহা নিজ হাতে মুখে দিলেন। তাহার পর কেহ কেহ চাখিয়া দেখিলেন যে উহা অমৃততুল্য, সুমিষ্ট। সুন্দর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ খুলিল। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে যথা ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইবার হুকুম দিলেন। তাঁহাব একদেশী ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। ভারতবর্ষের যোগী সম্বন্ধে তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতা হইল।

উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বদলী হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে অন্য একজন ইয়োরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেন। তিনি ভয়ানক কড়া মেজাজের লোক। ভারতীয় যোগী সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। তিনি পুলিসের সাহায্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে বন্দী করিয়া হাজতে রাখিলেন। পরের দিন দেখেন বন্দী হাজতে নাই। পূর্বে মুক্ত অবস্থায় যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন। বার বার বন্দী করিয়া হাজতে রাখার পর তাঁহাকে হাজতে পাওয়া যায় না। অলৌকিক উপায়ে বাহির হইয়া যান। এরূপ কয়েকবার ঘটিল। কি করিয়া তিনি চলিয়া যান তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট হইতে ম্যাজিস্ট্রেট জানিতে পারেন যে দেহের পিছনে আত্মা বিদ্যমান। আত্মা কখনও বদ্ধ হয় না। যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার নিকট সব ভেদ দূর হইয়াছে। তিনি দেহের বন্ধনে কখনও বাঁধা পড়েন না। তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা না রাখা সমান। ম্যাজিস্ট্রেট অবাক্ হইয়া গেলেন। ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অবিশ্বাস দূর হইল। ভারতের যোগী এবং যোগশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণার পরিবর্তন হইল। যোগশক্তির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে যথা ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইবার হুকুম দিলেন।

জীবনের শেষভাগে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বেণীমাধবের নিকট পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকটে থাকিতেন। এখানে গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে প্রবাহিত। উক্ত ঘাট ৺বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বেশী দূরে নয়। গঙ্গাস্নানের সময় ভক্ত এবং যাত্রীদের হর হর ব্যোম ব্যোম রবে চারিদিক মুখরিত হয়। পবিত্র আবহাওয়ায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। গঙ্গাস্নান সারিয়া ভক্ত যাত্রীরা যেমন ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার মাথায় জল ঢালেন সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মাথায়ও সেরূপ গঙ্গাজল ঢালেন এবং ফল মিষ্টি তাঁহাকে নিবেদন করেন।

মঙ্গল ভট্ট নামে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বাড়ীর নিকটে একটি ঘরে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। একটিমাত্র শর্তে ত্রৈলঙ্গ স্বামী মঙ্গল ভট্টের কথা রক্ষা করিতে রাজী হইলেন। তাঁহাকে কেহ বিরক্ত করিবে না, অসুখ সারাইবার উদ্দেশ্যে দলে দলে লোক যাইতে দেওয়া হইবে না। তাহাই হইল, তিনি একটা ঘরে রহিলেন। ঘরের দেওয়ালে শাস্ত্রের শ্লোক লিখিয়া রাখিলেন। কোন ভক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি দেওয়ালস্থ শ্লোকের উপর বিশেষ উত্তরের জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেন। তাহাতেই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব মিলিত এবং সমস্যার সমাধান হইত। ভক্তদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিত। অনেক সময় মৌন থাকিয়া তিনি এইভাবে আগত ভক্তদের সেবা করিতেন। বিজ্ঞাপন মারফৎ জনসাধারণের প্রশংসা আদায় না করিয়াও সেবা সম্ভব হয়।

৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন বারাণসী ধামে যান তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীকেও দর্শন করিতে যান। পরমহংসদেবকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন যে ইনি মহাপুরুষ। তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ত্রৈলঙ্গ স্বামী নস্যের কৌটা তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। পরমহংসদেবও এই অসাধারণ যোগীকে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিলেন। একদিন পায়সান্ন দ্বারা তাঁহার সেবা করিলেন। 'ঈশ্বর এক কি বহু' পরমহংসদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইঙ্গিতে জানাইলেন যে সমাধি অবস্থায় ঈশ্বর এক, কিন্তু যখন মন দেহেতে নামে তখন বহু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আসলে ঈশ্বর এক, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ তাঁহার পরমহংস অবস্থা লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।'

৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার রাজত্বে কেহ অভুক্ত থাকে না, ইহা লোকের বিশ্বাস। সময়ে হউক অসময়ে হউক খাদ্য মিলিবে। মা অন্নপূর্ণা বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি

সন্তানের যোগক্ষেম বহন করেন। খাদ্যের সন্ধানে ত্রৈলঙ্গ স্বামী কোথাও যাইতেন না। আহার জুটিল ত ভাল, না জুটিলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি হাত বাড়াইয়া কোন খাবার গ্রহণ করিতেন না। কেহ মুখের উপর ধরিলে তিনি গ্রহণ করিতেন। সুখাদ্য কুখাদ্য কিছুতেই আনন্দ বা বিরক্তি নাই। একবার কোন দুষ্ট লোক এক বালতি চুন গুলিয়া তাঁহার মুখের উপর ধরিল। বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া তিনি সমস্ত চুনের জল পান করিলেন এবং পরক্ষণেই প্রস্রাবের দ্বার দিয়া সমস্ত বাহির করিয়া দিলেন। তখন দুষ্ট লোকটি অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তাহার জীবনে পরিবর্তন ঘটিল। ভবিষ্যতে সে কখনও দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই।

কখন কখন কোন ধনী আসিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজাইয়া ফুল দিয়া পূজা করিতেন এবং ফল মিষ্টি নিবেদন করিতেন। পরক্ষণেই কোন দুষ্ট লোক আসিয়া সব সরাইয়া নিত। তাঁহাব কিছুতেই আনন্দ বা নিরানন্দ নাই। সমদর্শীর নিকট ভাল মন্দ সব সমান। কোন বস্তুতে তাঁহার আসক্তি বা অনাসক্তি নাই, সব বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত। গীতায় যে সমদর্শীর বর্ণনা দেওয়া আছে তাহার সব লক্ষণ তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। একবার বারাণসীর মহারাজা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে প্রাসাদে নিয়া সিল্কের কাপড়জামা, সোনার অলঙ্কারে সাজাইয়া নানা উপচারে সেবা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন চোর উক্ত অলঙ্কারাদি লইয়া গেল। তিনি নির্বিকার। চোরগুলিকে ধরিয়া রাজার সামনে হাজির করা হইলে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে কিনা, হইলে কি শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা জানিবার জন্য রাজা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অভিমত চাহিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী নির্বিকার। তাঁহার নিকট সোনার অলঙ্কারের কোন মূল্য নাই। তিনি শাস্তি সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিলেন না, বরং ইঙ্গিতে জানাইলেন যে চোরগুলি তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করে নাই। শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিলেই ভাল। এই অবস্থায় মহারাজের কিছুই করিবার নাই। তিনি দান করিয়াছেন। দত্ত জিনিসের উপর দাতার হাত নাই। দানের পর দাতার মালিকানা স্বত্ব থাকে না। যাঁহাকে দিয়াছেন তিনি যদি স্বেচ্ছায় সত্ব ত্যাগ করেন তবে দাতার বলিবার কিছুই থাকে না। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ত্যাগ দেখিয়া মহারাজা আশ্চর্যান্বিত হইলেন। মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল।

ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত প্রচারক, নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত

হইলেন। দেখিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী কালী মন্দিরে প্রস্রাব করিয়া বিগ্রহের গায়ে উহা ছড়াইয়া দিতেছেন। যে কোন লোক ইহা দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে সন্দেহ নাই। হাজার হোক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মণসন্তান, ব্রাহ্মণের সংস্কার আছে। অদ্বৈত বংশে জন্ম। ব্রাহ্ম হিসাবে মূর্তিপূজার বিরোধী হইলেও পূর্ব সংস্কার কাটাইতে পারেন নাই। বিগ্রহ কলুষিত করিতেছেন বলিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট অভিযোগ করিলে স্বামীজী মাটির উপর চক্ দিয়া লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি কালী বিগ্রহ কলুষিত করেন নাই, বিগ্রহের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইতেছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী যোগীর নিকট গঙ্গাজল আর প্রস্রাব এক। তাঁহার ভেদ বুদ্ধি নাই।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কোন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিংবা তাঁহার গৌরব বাড়াইবার জন্য শিষ্যের দলও গড়িয়া তুলেন নাই। তিনি বুঝিলেন তাঁহার ডাক আসিয়াছে। তিনি সর্বদা প্রস্তুত। যোগীর নিকট জীবন মৃত্যু সব সমান। সব সময় সুসময়, সব স্থান তীর্থস্থান, সব ব্রহ্মময়। ব্রহ্মজ্ঞানীর জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। শরীর গেলেও আত্মার বিলোপ হয় না। আত্মা নিত্য, অনন্ত, সর্বব্যাপী। ১৮৮৭ সালের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহাসমাধিতে লীন হইলেন, প্রাণ মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল। জীবন অতিজীবনে মিলিয়া এক হইল। শিবের দাস বিশ্বনাথের কাছে চলিয়া গেল। সচল বিশ্বনাথ অচল বিশ্বনাথে মিলিত হইয়া এক হইল। দেহ পড়িয়া রহিল। ভক্তেরা যথারীতি মহাপুরুষের শরীর কাঠের বাক্সে সাজাইয়া 'হর হর ব্যোম ব্যোম' রবে মাঝগঙ্গায় জলসমাধি দিলেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

গুরু নানক

পরিপূর্ণ সত্য দুর্বোধ্য। যাহা দুর্বোধ্য তাহা দুঃসহ ইহাতে সন্দেহ নাই সেইজন্য সাধারণ মানুষ সত্যকে সামগ্রিক রূপে দেখিতে চায় না, চায় ললিতরূপে তাহার মধুরে লোভ। মধুর সত্যের সন্ধান না পাইলে অনেক সময় কল্পিত কাহিনী লালিত্য দিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করে কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের মাপকাঠিতে যথাসময়ে মিথ্যার মোহ ছুটিয়া যায়, দুর্বলতা ধরা পড়ে। এমন মানুষও দেখা যায়, যদিও তাহাদের সংখ্যা কম, যিনি মধুরের লোভে ছুটেন না, কাল্পনিকতায়

ভুলেন না। তিনি সত্যের সামগ্রিক রূপ দেখিতে চান। উহা যতই দুর্বোধ্য এবং দুঃসহ হউক না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই, যে কোন মূল্য দিয়া তিনি উহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চান। বার বার বিফল হইলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। তিনি সাহসী, বীর, অসাধারণ—তিনি একটা উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যান যাহা জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে। প্রাণে শান্তি আনে।

তালবন্দী একটি বিশিষ্ট গ্রাম। লাহোরের নিকটে রাবি নদীর তীরে ভেটীর নিকটে অবস্থিত এই গ্রামটি মহাপুরুষের জন্মে ধন্য হইয়াছে। কালুবেদী এই গ্রামের অধিবাসী। বেদী বংশের নাম, কালু জাতিতে ক্ষত্রিয়। সূর্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশধররূপে পরিচিত। ত্রিপতি নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে কালুর বিবাহ হয়। বিবাহের বহু বৎসর পর তাঁহার এক কন্যা হয়। কন্যার নাম জানকী। কন্যার জন্মের কয়েক বৎসর পরে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যরাত্রে শুভক্ষণে কালুবেদীর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নামকরণ দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করিবার জন্য যথাবিধি পুরোহিত ডাকা হইল। জ্যোতিষে অভিজ্ঞ পুরোহিত নন্দন নবজাতকের শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। জন্মলগ্নের তিথি, নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া গ্রহের শুভদৃষ্টি দেখিয়া জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করিলেন যে বালক বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। ধর্মে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইবে, সম্প্রদায়ের নেতা হইবে। বালকের নাম রাখা হইল নানক নিরাকারী।

বালক শুভ সংস্কার নিয়া জন্ম নিয়াছে। ছোটবেলা হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু প্রকাশ পায়। বালক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সাধু ফকির দেখিলে ছুটিয়া যায়। তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধার খবর নেয়, তাঁহাদের কোন জিনিসের অভাব ঘটিলে তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করে, আর যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করে। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে পাঠশালায় পাঠানো হয়। অতি অল্প বয়সেই তাহার প্রতিভা স্ফুরণ হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। তীক্ষ্ণ মেধা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার চালচলন, মধুর ব্যবহার, সতীর্থ এবং শিক্ষকদের প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করে। সংস্কৃত, ফারসী এবং শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার কত প্রবল আকর্ষণ তাহা তাহার শিক্ষকদের প্রতি বিনীত অনুরোধের মধ্যে প্রকাশ পায়। বালক শিক্ষকদের নিকট প্রার্থনা করিত, 'আমায় তুচ্ছ বিষয় শিক্ষা দিবেন না, অর্থকরী বিদ্যা তুচ্ছ। তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমায় এমন বিষয় শিক্ষা দিন যাহাতে সত্য লাভ হয়। রাম কিংবা গোপাল কিংবা ঈশ্বরের

মাহাত্ম্য আমায় শিখান, তাহাই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের চেয়ে ভগবৎ জ্ঞান শান্তিপ্রদ।' বালকের মুখে এরূপ ভগবৎ বিষয়ক সারগর্ভ কথা শুনিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন। বালকের চিন্তাধারা কোন্ দিকে তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

পিতৃপক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ শাস্ত্রসম্মত। হিন্দুদের পক্ষে অবশ্যকরণীয়। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পিতৃতর্পণ করিতে দেখিয়া বালক তাহাদের দেখাদেখি শুক্না ডাঙ্গাতে জলসেচন করিতে লাগিল। তখন কোন ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন, 'ঐরূপ জলসেচনের উদ্দেশ্য কি'—উত্তরে বালক জবাব দিল, 'অনেক দূরে আমাদের গ্রামের ক্ষেত উর্বর করিবার জন্য শুকনা ডাঙ্গায় জল ঢালিতেছি'। তখন তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে এইভাবে জল ঢালিয়া দূরের ক্ষেত উর্বরা করা যায় না। উহা অসম্ভব, অসম্ভব আশা নিষ্ফল। এবার বালক কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই পৃথিবীর একস্থানে জল ঢালিলে যদি অন্যস্থানে না পৌছে তবে নিম্নস্থ পৃথিবীর জল কোন্ যুক্তিবলে উর্ধ্বে স্বর্গে যাইবে? কোশাকুশির জলে স্বর্গে কি করিয়া পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন?' বালকের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, 'সাধারণত মর্ত্যের জল স্বর্গে যায় না বটে কিন্তু তর্পণের সময় পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে জল দেওয়া হয় তাহা মন্ত্রপূত জল। মন্ত্রপূত জল পাইয়া পিতৃগণ যে তৃপ্ত হন তাহার প্রমাণ আছে। শাস্ত্রই সেই প্রমাণ, তুমি যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর তবে এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে'। পুরোহিতের কথায় বালকের বিশ্বাস হইল। ধর্মের তত্ত্ব, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের মর্ম জানিবার জন্য বালকের প্রবল ইচ্ছা হইল। যথা-সময়ে যথাবিধি উপনয়ন হইয়া গেলে বালক শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিল। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ তাহার মনে তেমন রেখাপাত করিত না। শাস্ত্রীয় নিয়ম এবং পারম্পর্য মানিয়া চলিলেও তাহার মনের সংশয় গেল না। কৌতুহলবশতঃ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সদ্ভাবে জীবন যাপন না করিয়া কেহ যদি শুধু ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করে তাহাতে মোক্ষলাভ হইবে এরূপ কোন প্রমাণ আছে কিনা বলুন। অন্যপক্ষে কেহ যদি সত্যে অবিচলিত থাকে, নিজের অবস্থায় সদা সন্তুষ্ট থাকে, কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা না করে, অথচ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান না করে, তবে তাহার কি গতি হইবে? সত্যের গাঁটযুক্ত সন্তোষের সুতা পাপ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা বলুন।' বলা বাহুল্য বালকের এই রকম প্রশ্ন পুরোহিতের নিকট জেঠামি বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহা বুঝা যায়। তবে বালকের মন কোন্ ধাতুতে গড়া তাহাও বুঝা যায়।

ছোটবেলা হইতেই নানকের সাংসারিক কর্মের প্রতি বিরূপ ভাব ছিল। যৌবনে উহা কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। পুত্রের উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া কালুবেদী পুত্রকে ব্যবসা করিবার জন্ত কিছু টাকা দিলেন। তাঁহার আশা ছিল ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে পুত্র সংসারধর্মে মন দিবে; বড়লোক হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। বয়সে প্রবীণ না হইলেও পিতার মতলব পুত্রের নিকট গোপন রহিল না। পুত্রকে প্রবৃত্তির পথে টানিবার কৌশল সিদ্ধ হইল না। নানকের উদাসীন ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। পথে কয়েকজন অভুক্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নানক ভাবিলেন, ব্যবসা দ্বারা সাংসারিক উন্নতি হইতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা পারমার্থিক বস্তু লাভ হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্যপক্ষে অভুক্ত সাধুদের সেবা দ্বারা আর্থিক উন্নতি হইবে না তবে পথের সম্বল হইবে। ঐহিক উন্নতির চেয়ে পারমার্থিক উন্নতির মূল্য সমধিক। নানক উক্ত টাকা দ্বারা অভুক্ত সাধুদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়া রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিল। আশাই মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। প্রথমবার পুত্রকে সংসারে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই বলিয়া কালুবেদী আশা ছাড়েন নাই। এবার তাঁহাকে গরু চরাইবার কাজে লাগাইলেন। গরু চরাইবার সময় নানক অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িত। ছাড়া পাইয়া গরুগুলি প্রতিবেশীর ক্ষেতের ফসল খাইয়া ফেলিত। ইহাতে নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল। নানককে কঠোর শাস্তি দিবে মনস্থ করিয়া একদিন ক্ষেতের মালিক আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইল, দেখিল নানক গভীর নিদ্রায় মগ্ন আর একটা বিষধর সর্প ফণা উঠাইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছে। শাস্তি আর দেওয়া হইল না। নানক বাঁচিয়া গেল।

কালুবেদী গ্রামের তহশীলদার। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুপরিচিত। হৃদ্যতাও আছে। অনেকে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, এখন নানক যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে; তাহাকে বশে আনার একমাত্র উপায় তাহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা। যুবতী স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিলে তাহার উদাসীন ভাব কমিয়া যাইবে এবং সে সংসারে মন দিবে। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে কালুবেদী মৌলারয়োনা গ্রামের এক প্রতিবেশীর সুন্দরী কন্যার সঙ্গে পুত্র নানকের বিবাহ দিলেন। মহৎ কাজের জন্ত যাহার জীবন নিবেদিত সাংসারিক আবহাওয়া তাহার ক্ষতি করিতে পারে না। পিতামাতার মনস্তুষ্টির জন্ত নানক বিবাহ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন ঐহিক উন্নতির দিকে ধাবিত হইল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে জানকী নামে নানকের এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তিনি নানককে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নানকও তাঁহাকে খুব

ভালবাসিতেন। জয়রাম নামে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে জানকীর বিবাহ হয়। জয়রাম দৌলতখান লোদীর অধীনে কর্ম করিতেন। জানকী নানককে নিজের কাছে লইয়া গিয়া লাহোরে গভর্ণমেণ্ট অফিসে কর্মে ঢুকাইয়া দেন। নানক কিছুকাল কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ইতিমধ্যে শ্রীচাঁদ এবং লক্ষ্মীদাস নামে নানকের দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সদ্‌ভাবে উপার্জিত অর্থ তিনি সাধুসেবায় ব্যয় করিতেন। সংসারে সততা এবং দক্ষতার কঠিন মূল্য দিতে হয়। নানককেও দিতে হইয়াছে। কয়েকজন কর্মচারী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের দুর্ণাম রটাইল। উর্দ্ধতন কর্মচারী ষড়যন্ত্রকারীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নানককে কর্মচ্যুত করিলেন। কিন্তু বিশেষ তদন্ত করিয়া যখন বুঝিলেন যে নানক সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে, তখন আপন দোষক্ষালনার্থে দক্ষতা এবং সততার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে আরও উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু নানক সংসারের কুটিল গতি বুঝিয়াছেন। তিনি পুনর্বার কর্মের বন্ধনে পড়িতে রাজী হইলেন না। অনুরোধরত বন্ধুবান্ধবদের বুঝাইলেন যে দক্ষতা, সরলতা এবং সততা নিয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যদি ভগবৎ-সেবা করেন তবে ভগবান তাঁহাকে পায়ে ঠেলবেন না। রাজকার্যে বেতন আছে, গলাধাক্কাও আছে। সততা, দক্ষতার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যত্বের মূল্য নাই, ভগবৎ-সেবায় বেতন নাই। ঐহিক উন্নতি নাই। তবে মনুষ্যত্বের মর্যাদা আছে, সততার পুরস্কার আছে। আর আছে বিমল আনন্দ, পরম শান্তি। বাসনাকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যায় ততই বৃদ্ধি পায়। ঘৃতাহুতিতে অগ্নি জলিয়া উঠে, কখনও নিভে না। এই সব বিবেচনা করিয়া নানক বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করিতে মনস্থ করিলেন। একসঙ্গে দুই নৌকায় পা রাখিয়া চলিতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সংসার এবং ভগবান উভয়ই একসঙ্গে রক্ষা করা চলে না। শয়তান এবং ভগবানের সেবা একসঙ্গে চলে না। একজনকে রাখিলে অন্যজনকে ছাড়িতে হয়। শয়তানকে সেবা করিলে মৃত্যু অনিবার্য। অন্যপক্ষে ভগবৎ-সেবায় অমরত্ব লাভ হয়। সুতরাং সব ছাড়িয়া ভগবৎ-সেবাই কর্তব্য। পুনরায় রাজকার্য গ্রহণ না করিয়া নানক আনন্দিত হইলেন, মনের দুশ্চিন্তা কমিল। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা নানক কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করিয়া সংসারের উন্নতি করুক। পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, ক্ষেতখামার দেখা, চাষবাস করার দায়িত্ব তাঁহারা তাঁহার উপর চাপাইলেন। ইহাতে নানক সুখী হইতে পারিলেন না।

নানক অন্তরের বাণী শুনিয়াছেন। তিনি পিতামাতাকে বলিলেন, 'আমি চাষবাস করিব সত্য, কিন্তু উহা অন্যরকমের। বিনয় অভ্যাস দ্বারা উচ্চ জমি নীচ করিব। সন্তোষ অভ্যাস দ্বারা নীচ জমি উচ্চ করিব। এইভাবে জমি সমান হইবে, তাহাতে পবিত্রতার লাঙ্গল দিব, ভগবৎ-চিন্তার বীজ রোপণ করিব। ভক্তির জল সিঞ্চন করিব, আর দিব্য প্রেম ফললাভ করিব। যদি কেহ জীবন-ক্ষেতে এইভাবে চাষ করে তবে সে নিশ্চয়ই ভগবানের কোলে আশ্রয় পাইবে। সুতরাং সাধারণ ক্ষেতে চাষ দেওয়ার চেয়ে জীবন-ক্ষেতে চাষ দেওয়াই ভাল'।

পুত্রের কথা পিতা বুঝিতে পারেন না। তখন নানক বলেন 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে আমি ব্যবসাতে লাগিয়া যাই তাহাতেও আমি রাজী আছি। ভগবৎ নাম ইহার পুঁজি হইবে। ব্যবসায়ের হিসাবপত্র ঠিক রাখিব। নিয়ত সৎ চিন্তা করিয়া এবং অসৎ চিন্তা পরিহার করিয়া ইহার পুঁজি বৃদ্ধি করিব। ভগবৎ নামের ব্যবসা ভালই চলিবে। ক্ষতির সম্ভাবনা তো নাইই বরং সবদিকেই লাভ। কালুবেদী বিষয়ী লোক। পুত্রের হেঁয়ালিপূর্ণ কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন নানক পাগল হইয়াছে। তাহার জন্য চিকিৎসক ডাকাইলেন। কিন্তু চিকিৎসক দেহের ব্যাধি হইলে চিকিৎসা করেন। নানকের ভবরোগ হইয়াছে। এই রোগের চিকিৎসা তাঁহার জানা নাই। ঐহিক ঔষধে ভবরোগ সারে না।

নানক হিন্দু এবং মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তত্ত্বে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি পরিব্রাজক হিসাবে ভারত এবং ভারতেতর দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সারতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কায় আসেন। একদিন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি পা ছড়াইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার পা কাবার দিকে ছড়ানো দেখিয়া একজন মুসলমান ফকির ভীষণ রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে দুশমন এবং অবিশ্বাসী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। আর একটু হইলে দুই ঘা বসাইয়া দিতেন। ফকিরের তিরস্কারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি স্বাভাবিক শান্তভাবে বলিলেন, 'ফকির মহাশয়, পবিত্র কাবার দিকে পা ছড়াইয়া বসিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। যেদিকে আল্লা নাই সে দিকে আমার পা দুখানি দয়া করিয়া ছড়াইয়া দিন'। নানকের কথা শুনিয়া ফকিরের চৈতন্য হইল। তিনি ভাবিলেন যদি রাগের মাথায় এই রকম জ্ঞানী লোককে মারিতাম তবে কি ভীষণ অন্যায় হইত। ভগবৎ কৃপায় নানক বিপদ

হইতে রক্ষা পাইলেন। ধর্ম সম্বন্ধে জানিবার জন্য যতই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়াছেন সর্বত্রই প্রকৃত তত্ত্ব-পিপাসুর সংখ্যা অল্পই দেখিয়াছেন। শুধু বাহ্যিক আচারে রত এরূপ লোকই দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। ভ্রাতৃত্ব, পবিত্রতা, আত্ম-সংযমাদি অভ্যাস এবং প্রচার দ্বারা তিনি সমাজের দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তীর্থভ্রমণ এবং তপস্যায় বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নানক বাড়ী ফিরিয়া প্রচার কার্যে লাগিয়া গেলেন। ভগবৎ বিষয়ক আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃস্ফুরণ হইত। বহু লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইতেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল। বালাভাই, ভগীরথ মানসুখ, মর্দানা তাহাদের অন্যতম। একজন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার বাসের জন্য বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিলেন। নানক প্রথমে ভক্তের দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে ভক্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্র নিয়া কিছুকাল ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন।

কিছুকাল পরে নানকের মধ্যে উদাসীন ভাব আবার প্রবল হইল। এইবার বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি কখন কোথায় কাহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সঠিক জানা যায় না তবে তিনি যে যোগাভ্যাস করিতেন, অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া একাসনে বসিয়া দিন-রাত ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন, সে সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। একবার সুলতানপুরের নিকট নদীতে স্নান করিতে গিয়া কয়েকদিন জলের নীচে কাটাইয়া দেন। হয়ত কুম্ভক করিয়াই ঐভাবে ছিলেন। তিনি যেখানে যোগাভ্যাস করিতেন সেস্থানের নাম 'রবি সাহেব' এবং যে গাছের তলায় বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেন তাহাকে 'বাবাকী বের' বলে।

সিদ্ধিলাভ করিয়া নানক প্রচারকার্যে বাহির হইলেন। বালাভাই এবং মর্দানা তাঁহার অনুগমন করিল। তাঁহার প্রচারকার্যের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু এবং মুসলমানকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন তাঁহার প্রচারের অঙ্গ ছিল। উভয় দলের জন্য তিনি সজ্যদ্বার উন্মুক্ত রাখেন। মুলতানে গরছত্র মেলার সময়ে কোরাণবিরোধী ধর্ম প্রচার করায় অপরাধে পাঠান শাসনকর্তা ইব্রাহিম লোদীর আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া জেলে পাঠানো হয়। শাসনকর্তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে একমাত্র তাঁহার (কোরাণের) ধর্মই ঠিক। অন্য ধর্ম তুচ্ছ এবং অপ্রয়োজনীয়। কোরাণ-বিরোধী ধর্ম ধর্মই নয়। দেশের শাসনযন্ত্র হাতে থাকাতে ধর্মের গোঁড়ামিতে অন্ধ হইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমূলে

বিনাশ করিবার সুযোগ মিলে। ফলে চারিদিকে অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। প্রত্যেক কিছুর সীমা আছে, সীমা অতিক্রম করিলে তাহার প্রতিফল পাইতে হয়। কাল কাহাকেও ছাড়ে না। ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা, তাহার করালগ্রাসে নিষ্পেষিত হয়। পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। নানক পাঠান শাসনকর্তার জেলে দীর্ঘ সাত মাস বহুকষ্টে কাটাইলেন। পরে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মোগল বীর বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলে নানক মুক্তি পান। কালের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

নানকের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে তিনি ভারতের বহু স্থানে যান। একদিন পথিমধ্যে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া তিনি বুধাকে নিকটস্থ পুকুর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। বুধা পুকুরে গিয়া দেখে পুকুর শুকাইয়া গিয়াছে। নানক তাহাকে দ্বিতীয়বার পাঠাইলেন। এবার পুকুরের কানায় কানায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছ সুমিষ্ট জল দেখিয়া বুধা আশ্চর্যান্বিত হইল। নানকের জন্য জল আনিল। জল পান করিয়া নানক তৃপ্ত হইলেন। নানকের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বুধা তাঁহার শিষ্য হইল। ইহাতে তাঁহার প্রচারকার্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। গ্রামস্থ লোক জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। শুক্‌না পুকুর কানায় কানায় সুমিষ্ট জলে পূর্ণ হওয়াতে স্থানীয় লোকদের জলকষ্ট দূর হইল। অনেকে তাঁহার ভক্ত হইল। অনেকে শিষ্য হইল। যেস্থানে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে তাহার নাম অমৃতসর। শিখদের প্রধান তীর্থ। অমৃতসরের কিছু বিশেষত্ব আছে। এই ঘটনার পর এইস্থানের মূল্য বাড়ে। ইহার অর্থ অমৃতের সাগর। জল এত স্বচ্ছ এবং মিষ্ট যে উহাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা সংস্কার করেন, আয়তনও বৃদ্ধি করেন। ইহার মধ্যে একটা মন্দির নির্মাণ করেন। শিখেরা ইহাকে গুরুদ্বার বা দরবার সাহেব বলেন। আফগানিস্থানের আহামদ শা পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। মন্দিরটি ধ্বংস করেন, গোরক্তে পুকুরটি কলুষিত করেন। পরে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ বিধর্মীর হাত হইতে দেশ পুনরুদ্ধার করিয়া মন্দিরটি দখল করেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া মন্দির সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চূড়া সোনা দ্বারা সজ্জিত করেন। তখন হইতে উহা স্বর্ণমন্দির নামে পরিচিত। সংলগ্ন পুকুরটি খালের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়া পুরনো জল বাহির করিয়া নূতন জল ঢুকানো হয়। পুকুরের মধ্যখানে মন্দিরে যাইবার জন্য

একটা সেতু করা হইয়াছে। গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং অন্যান্য গুরু প্রণীত গ্রন্থসাহেব মূল্যবান সিল্কের কাপড়ে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। নিত্য এই গ্রন্থ সাহেব পাঠ হয়। শিখেরা এই পবিত্র গ্রন্থকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

নানকের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারিতেন। একবার একজন দুর্বৃত্ত লোক মন্দিরের নিকটে একটি যাত্রীনিবাস খুলে। দিনে যাত্রীদের পরিতোষপূর্বক খাওয়াইত এবং রাত্রে তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইত। কখন কখন প্রয়োজনমত তাহাদের হত্যা করিতেও কুন্ঠিত হইত না। নানক ইহা জানিতে পারিয়া দুর্বৃত্তকে সাবধান করিয়া দিলেন। শক্তিশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া দুর্বৃত্তের মনে পরিবর্তন আসিল। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া তাহার মন পবিত্র হইল।

নানক তীর্থদর্শন মানসে জগন্নাথধাম পুরী আসেন। সঙ্গে শিষ্য বালাভাই এবং প্রসিদ্ধ গায়ক এবং 'রবাব যন্ত্র' বাদক মর্দানাও ছিলেন। মহানদীর নিকট একটা বাগানে সশিষ্য নানক আশ্রয় নিলেন। নানকের রচিত গান মর্দানা যখন 'রবাব যন্ত্র' সংযোগে গাইতেন তখন চারিদিকে পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হইত। লোক জমিয়া যাইত। নানক খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। নানকের জনপ্রিয়তায় নিকটস্থ বৈষ্ণব মঠের অধ্যক্ষ চৈতন্য ভারতীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। অভিচার প্রয়োগ করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি একজন ভৈরবকে নিযুক্ত করিলেন। ভৈরব সাধারণ লোকের অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু মহাপুরুষের কিছু করিতে পারে না। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে ভৈরবের ক্ষমতা খর্ব হইয়া যায়। মন্দ অভিপ্রায়ে ভৈরব যখন নানকের নিকট যায়, তখন তাহার শরীরে একটা ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয়। বার বার চেষ্টা করিয়াও নানককে হত্যা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। ইহা নানকের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি মর্দানাকে ভৈরবের নিকট পাঠান এবং ভৈরবকে সঙ্গে নিয়া কাছে আসিতে বলেন। ভৈরব নিকটে আসিলে নানক তাহাকে পবিত্র জীবন যাপন করিতে উপদেশ দেন। উপদেশের ফল ফলিল। ভৈরবের মনে পরিবর্তন আসিল। নানককে মারিবার জন্য ভৈরবের একটি লাঠি ছিল। যাওয়ার সময় উহা ফেলিয়া গেল। নানক লাঠিটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। উহার শিকড় গজাইল, ডাল-পালা বাহির হইয়া নূতন গাছের আকার ধারণ করিল। তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইল।

সশিষ্য নানক জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিলে মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁহাদের মুসলমান সন্দেহে ঢুকিতে দিলেন না। পুরোহিতের ধারণা

হইল ইহারা বিগ্রহ ধ্বংস কিংবা মন্দির কলুষিত করিতে আসিয়াছে; মন্দির হইতে পুরোহিতের তাড়া খাইয়া সশিষ্য নানক স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুঃখিত না হইবার জন্য শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, 'জগন্নাথের প্রসাদ আসিবে, চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই।' তখন তিনি ভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রকৃত ভক্তের আশা কখনও নিষ্ফল হয় না। জগন্নাথ তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রাত্রে সোনার থালায় তাঁহার নিকট প্রসাদ লইয়া হাজির হইলেন। ভক্তকে কৃপা করার নিদর্শন দেখা গেল। জগন্নাথের কৃপায় ঐস্থানে মাটি ভেদ করিয়া উৎসের মত গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া স্থানটিকে পবিত্র করিয়া তুলিল, উহার নাম গুপ্তগঙ্গা। পরবর্তীকালে রণজিৎ সিংহের পিতা মানসিংহ জগন্নাথ তীর্থদর্শনে আসিয়া ঐস্থানের পুনঃসংস্কার করিলেন। নানকের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি দরজা রাখিয়া স্থানটিকে ঘিরিয়া দিলেন।

আর একবার দৌলত খান নানককে মসজিদে যাইয়া নমাজ পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানক সরল প্রকৃতির লোক। নবাবের কথায় মসজিদে আসিলেন কিন্তু নমাজ পড়িলেন না। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে নানক উত্তর দিলেন, 'আপনারা কি রকম নমাজ পড়েন লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম নমাজের সময় আপনি ভগবানের চিন্তা না করিয়া আপনার সুন্দরী বেগমের কথা ভাবিতেছিলেন। আর কাজী সাহেব যিনি নমাজ পরিচালনা করিতেছিলেন তিনি ঐ সময়ে তাঁহার রুগ্না কন্যার কথা ভাবিতেছিলেন। নমাজের সময় ভগবৎ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করা উচিত নয়।' নানকের অলৌকিক শক্তি এবং স্পষ্টবাদিতা সকলকে মুগ্ধ করিল। শক্তিমান নবাব এবং কাজীর দুর্বলতা গোপন রহিল না।

নানকের ধর্মমত সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—ঈশ্বর এক, সব মানুষ ভাই-ভাই; হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের আল্লা পৃথক নয়। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। তিনি এক, অখণ্ড, স্বাধীন, অচিন্তনীয়, অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী। ভগবানের নিকট সকলে সমান। বড় ছোট, উচ্চ নীচ, আলো অন্ধকার নাই। জাতি ধর্ম নাই সমাজে, ধর্মে সকলে সমান অধিকারী। তাঁহার ধর্মের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্মের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি বৌদ্ধদের নির্বাণ, সুফিদের 'প্রত্যেক ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরের স্ফুলিঙ্গ' এবং হিন্দুদের 'সোহম' বিশ্বাস করিতেন। এক কথায় বেদান্তের মতবাদই তিনি অন্যভাবে শিক্ষা দেন। যে যাহা ভাবে তাহার সত্তা পায়। ঈশ্বরকে ভাবনা করিলে ঈশ্বরের সত্তা পায়। ঈশ্বর এক এবং বহু, তিনি আসেন না, যান না, ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না, সর্বব্যাপী, অবিনাশী।

দিন যাইতে লাগিল। নানকের শরীর দিন দিন ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার কাজও ফুরাইয়া আসিল। জগৎ হইতে বিদায় নেওয়ার পূর্বে তাঁহার আরব্ধ কার্য তাঁহার অবর্তমানেও যাহাতে চলে তাহার জন্য উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করিয়া গেলে তবে জগতে তাঁহার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সফল হয়। শিষ্যদের মধ্য হইতে উপযুক্ত নেতা মনোনয়নের জন্য তিনি এক অভিনব উপায় স্থির করিলেন। একদিন সশিষ্য নদীর তীর ধরিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ জলের স্রোতে ভাসমান এক মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে ঐ মড়াটি খাইতে পারিবে?' গুরুর আদেশ শুনিবামাত্র শিষ্যদের অন্যতম লেহানা জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাঁতরাইয়া ভাসনান মড়ার নিকটে গিয়া গুরুর অনুমতির জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'প্রভু, কোন্ দিকটা? পায়ের দিকটা কি মাথার দিকটা খাইব, আদেশ করুন?' মড়াটাকে তীরে তুলিয়া গুরুর আদেশে পায়ের দিকটা খাইবার জন্য আবরণ খুলিয়া দেখিল অতি সুন্দর মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, গন্ধে চারিদিক আমোদিত। নানকের অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। গুরুর পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হইল। এইভাবে গদির উপযুক্ত নেতা নির্বাচিত হইল। এরূপ শিষ্য গুরুর অঙ্গবিশেষ। সন্তুষ্ট হইয়া নানক তাঁহার অঙ্গদ নাম রাখিলেন।

নেতা নির্বাচনের পর নানক অধিক দিন বাঁচেন নাই। ১৫৩৯ সালে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি কর্তারপুরে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। গুরুর দেহ লইয়া হিন্দু এবং মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইল। হিন্দু শিষ্যগণ হিন্দুমতে দেহ আগুনে সৎকার করিতে এবং মুসলমান শিষ্যগণ মুসলমান মতে দেহ কবরস্থ করিতে চান। তর্ক বিবাদে পরিণত হইয়া পরস্পরের মধ্যে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। তখন একজন আবরণ খুলিয়া দিল। সমবেত শিষ্য এবং ভক্তেরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে মৃতদেহ নাই। আছে কতকগুলি সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুল। তাহাও দুই ভাগে বিভক্ত এবং আবরণও দুই ভাগে বিভক্ত। বিবাদের মীমাংসা গুরুই করিয়া গেলেন। হিন্দু শিষ্যগণ অর্ধেক ফুল ও আবরণ নিয়া হিন্দু মতে খুব সমারোহ করিয়া সৎকার করিল এবং মুসলমান শিষ্যগণ অবশিষ্ট ফুল ও আবরণ নিয়া মুসলমান মতে কবর দিল। সমস্যার সমাধান হইল। যেখানে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তাহা শিখদের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সেখানে গুরুদ্বার স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার শিখভক্ত তথায় মিলিত হয়। রীতিমত মেলা বসে, এখনও উক্ত স্থানের সমারোহ বজায় আছে।

বহুকালের স্বাভাবিক সৎ চিন্তাধারা জমাট বাঁধিয়া শিখ ধর্মের রূপ নিয়াছে। সরলতা, উদারতায় ইহার আরম্ভ; একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ইহার মূলনীতি; দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান, অমায়িক, উদ্যমশীল, দৃঢ়বিশ্বাসী, সত্যে আস্থাবান, একনিষ্ঠ মহান্ সিদ্ধপুরুষ নানক ইহার নায়ক, প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মত কর্মবীর ও ধর্মবীর এরূপ নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিতে পারেন। তিনি অতীত ও বর্তমানের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গণ্ডি ভেদ করিয়া ধর্মের নূতন আলো দেখাইলেন। তিনি সকলকে শুধু ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলেন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মে উচ্চ-নীচ, সুন্দর-অসুন্দর, অধিকারী-অনধিকারী সব ভগবানের চোখে সমান। অদ্ভুত সংগঠন শক্তি এবং গভীর দূরদৃষ্টির ফলে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম-সংঘের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেম দানা বাঁধিয়াছে। ধর্ম-সংঘের অবিসংবাদী নেতা এবং সংস্কারকরূপে তিনি অক্ষয় কীর্তি রাখিয়াছেন।

শিষ্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত উপদেশরাশিই শিখ বাইবেল বা গ্রন্থসাহেব রূপে সকলের নিকট পরিচিত এবং আদরণীয়। গ্রন্থসাহেবে নানা রকমের শ্লোকগুলি নানা রকমে বিভক্ত করা হইয়াছে। জপজী, সোদরেশ, কীর্তি সোহিলা, আশা কি বার, ভিগকী বাণী, প্রাণসঙ্গলি প্রভৃতি বিভাগই প্রধান। নানক শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সত্য কিন্তু ইহাতে অন্যান্য নয়জন গুরুর অবদানও যথেষ্ট। গুরুদেব ক্রম হইতে জানা যায় নানক-শিষ্য অঙ্গদ দ্বিতীয় গুরু, অঙ্গদ-শিষ্য অমরদাস তৃতীয় গুরু (তিনি অমৃতসর গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠাতা), রামদাস চতুর্থ গুরু, রামদাসের পুত্র অর্জুন পঞ্চম গুরু (তিনিই প্রথমে গুরু নানক এবং অন্যান্য পূর্ব গুরুদের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থসাহেবের রূপ দেন), অর্জুন-পুত্র হরগোবিন্দ ষষ্ঠ গুরু (গুরুদের মধ্যে তিনিই আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি তুলেন), হরগোবিন্দের পুত্র হররায় সপ্তম গুরু, হররায়ের পুত্র হরকিষণ অষ্টম গুরু, হরগোবিন্দের ভাই তেগ বাহাদুর নবম গুরু এবং তেগ বাহাদুরের পুত্র গোবিন্দ সিংহ দশম বা শেষ গুরু। তিনি শিখদের বীরের জাতিতে পরিণত করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটাতে গুরুর পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন গ্রন্থসাহেবই গুরুর স্থান অধিকার করে।

জপজী গ্রন্থসাহেবের প্রধান অঙ্গ, ব্রাহ্মণ যেমন নিত্য গায়ত্রী জপ এবং সন্ধ্যা-বন্দনা করিবার পর আহার করেন শিখদের মধ্যেও অনেকে নিত্য জপজী পাঠ করেন। জপজীর প্রতি ছত্র উদার ভাবে পূর্ণ। সাধকের মনে প্রেরণা জাগায়। জপজী মতে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য। পরমাত্মার অপর নাম সত্য, তিনি অনন্ত নিত্য। তাঁহার মহিমা কীর্তন হইতেই মুক্তি আসিবে। পরমাত্মার ধ্যান

ব্যতীত কেহ আত্মনদীতে অবগাহন করিতে পারে না। প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞানের অনন্ত খনি নিহিত, কিন্তু গুরুকৃপা ব্যতীত কেহ এই খনির সন্ধান পায় না। পরমাত্মাই একমাত্র দাতা। তাঁহাকে ভুলিলে সমূহ বিপদ। জলে দেহের ময়লা যায়, সাবানে কাপড়ের ময়লা কাটে, কিন্তু মনের ময়লা দূর করিতে হইলে ভগবৎ নাম এবং ধ্যানই যথেষ্ট। ধ্যান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না। মানুষ কর্মানুযায়ী ধার্মিক অধার্মিক হয়। ফলও তদনুরূপ পাইয়া থাকে। অজ্ঞানের জন্যই মানুষ বার বার জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়ে।

সোদরেশ এবং কীর্তি সোহিলা গ্রন্থ দুইটি নানক প্রণয়ন করেন। অনেকে ইহা নিত্য, বিশেষতঃ শয়নের পূর্বে, পাঠ করিয়া থাকেন। ভিগকী বাণী ভগবৎ প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। প্রাণ সঙ্গলি শিখদের ধর্ম, আইন-কানুন এবং সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গুরুগোবিন্দ প্রণীত দাদত্রাণ পাদসাহিও আদি গ্রন্থ-সাহেবের মত সম্মানিত। ইহাতে হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রয়োজন মত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার এবং বীরত্বের প্রশংসা বেশ ভালভাবে বর্ণিত আছে, শিখদের চিন্তাধারা প্রথম গুরু হইতে শেষ গুরু পর্যন্ত কি রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা সুন্দররূপে জানা যায়।

চল্লিশ ॥

কালই সত্যের কষ্টিপাথর। কালের নিক্তিতে ওজন না হওয়া পর্যন্ত সত্যের মূল্য নির্ধারিত হয় না। কখন কখন মধুর সত্য প্রকৃত সত্যের আকারে আসে। কাল্পনিক কাহিনীর লালিত্য ইহাকে আরও মধুর করিয়া তুলে এবং সামগ্রিক সত্যের রূপকে আবৃত করিয়া রাখে। কালের পরীক্ষায় টিকিয়া থাকিতে পারিলে এবং আদর্শের কষ্টিপাথরে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হইলে তবে সত্যের রূপ প্রকাশ পায়। তখন সত্য শিব ও সুন্দর হয়। এইজন্য জ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে কালই সত্যের বন্ধু। অনেক সময়ে দেখা যায় সত্যের একনিষ্ঠ সেবককে প্রতিকূল কালের প্রভাবে ভয়ানক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়। তাঁহার সৎ চিন্তারাশি স্ফুরণের সুযোগ না পাইয়া রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। তাঁহার আদর্শ মলিন বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাঁহার নির্যাতন সহ

বুঝা যায় না। সত্য নৈরাশ্য দূর করে, আশার বাণী শুনায়, সত্যের অমোঘ শক্তি কাল অনুকূল হইলে উহা বেগবান হইয়া কঠিন দেওয়াল ভেদ করিয়াও প্রকাশ পায়। তখন তাঁহার আদর্শ উজ্জ্বল হয়, সত্যের মহিমা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বিদ্বানেরা যে 'কালই সত্যের বন্ধু' বলেন তাহা অমূলক নয়। ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

আড়াই হাজার বৎসরের পূর্বের কথা। ঐ সময়ে দেশের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন করিলে দেখা যায় জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয় জাগিয়াছে। অধিকাংশ লোকের অনুষ্ঠানসর্বস্ব আদর্শ সম্বন্ধে মনস্থির হয় নাই। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মানুষ যত সচেতন তত্ত্ব সম্বন্ধে তত অচেতন। রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে সর্বত্র দুরবস্থা, নৈরাশ্য মানুষের শরীর ও মনকে দুর্বল করিয়াছে। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণেই প্রবোদ্ধক্ত মহাপুরুষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ সালের চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৈশালীর অন্তর্গত কুন্দগ্রামে এক সামন্ত রাজার গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সিদ্ধার্থ। জাতিতে ক্ষত্রিয়। সদাচারী, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। মগধ, অঙ্গ, কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। মাতা ত্রিশলাও ধর্মপরায়ণা। তিনি বৈশালীর রাজার ভগ্নী। প্রকৃতি পূর্ব হইতে মহাপুরুষের আগমন টের পাইয়া কতকগুলি সুলক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। পুত্রের জন্মের কিছুকাল পূর্বে ত্রিশলা পর পর তিন রাত্রি একই স্বপ্ন দেখেন। একটা শ্বেত-হস্তী, একটা বলবান ষাঁড় এবং একটা বলবান ব্যাঘ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত স্বপ্নতত্ত্বের বিচার অনুযায়ী এরূপ শুভ স্বপ্ন ভাবী শিশুর আগমন-বার্তা সূচনা করে। এরূপ সন্তান পিতার আনন্দ বর্ধন করে, কুলের গৌরব বৃদ্ধি করে, জাতির সম্মান বাড়ায়, নবযুগের উদ্বোধন করে এবং বিপুল সম্পদের সম্ভাবনা জাগায়। এরূপ সর্ববিষয়ের উন্নতির বিধায়ক বলিয়া পিতা নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন বর্ধমান। এই বর্ধমানই কালে বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর তীর্থঙ্কর নামে পরিচিত হইলেন।

যিনি মহৎ ধর্মের মর্ম সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করেন তিনি শুভ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার হৃদয়বত্তা, মহত্ত্ব এবং সাহসের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্ধমানের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। একদিন একটা বাগানে বর্ধমান বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলায় মত্ত এমন সময় হঠাৎ একটা বিষধর সর্প দেখা গেল। খেলার সাথীরা ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলাইল; যে মৃত্যুভয় জয় করে সেই প্রকৃত সাহসী। বর্ধমান ক্ষিপ্রহস্তে সর্পটি ধরিয়া কয়েকবার পাক

দিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সাপটি প্রাণের ভয়ে দ্রুতগতিতে পলাইয়া গেল। বালক বর্ধমান দলছাড়া সাথীদের আবার জড় করিয়া খেলায় মত্ত হইল। যেন কিছুই হয় নাই। বালক শুধু সাহসী নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার চালচলন ব্যবহারে পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সতীর্থ, শিক্ষক সকলেই সন্তুষ্ট। পুত্র যাতে শিক্ষা, দীক্ষা সব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া বংশের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে তার জন্য পিতা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্ধমানের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি ভালভাবে হইতে লাগিল।

যৌবনের উন্মেষে প্রতিবেশী রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা সমরবীরের পরমাসুন্দরী কন্যা যশোদার সঙ্গে বর্ধমানের বিবাহ হয়। যথাসময়ে তাঁহার এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা জন্মিল, কন্যাটির নাম অনবদ্যা। জৈনগ্রন্থে তাঁহাকে কোন কোন স্থানে প্রিয়-দর্শনা নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ধমানের জন্ম-পত্রিকা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়াই বর্ধমান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যতদিন না ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয় ততদিন তিনি কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। প্রকৃত শান্তিলাভই মানুষের লক্ষ্য, জন্মগত সংস্কারের বলে উহা মানুষের ভাগ্যে মিলে। প্রাচুর্যের পরিবেশে লালিতপালিত হইলে যে উহা মিলিবে তাহার কোন কথা নাই। ধনসম্পদ্ শারীরিক সুখ বিধান করিতে পারে কিন্তু মানুষের চরম লক্ষ্য যে অনাবিল আনন্দ লাভ তাহা আনিতে পারে না। তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বর্ধমানের পক্ষে সময় ক্রমশঃ অনুকূল হইয়া আসিল। ভিতরের সংস্কার পরিপক্ক হইয়া আসিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার জন্য গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে তাঁহাকে আরও দুই বৎসর গৃহে থাকিতে হইল। তবে এই সময়ের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভ তিথিতে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। রাজার ঐশ্বর্য, পরমাসুন্দরী স্ত্রী, কন্যার স্নেহ কোনটাই তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারিল না। অশোক বৃক্ষের নীচে বসিয়া নূতন ব্রত গ্রহণ করিলেন। নিজ হাতে মস্তকের কেশ ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয়ের মূল্যবান পরিধান খুলিয়া ফেলিলেন। শত সহস্র দর্শক এই দৃশ্য দেখিয়া চোখের জল ফেলিল। ক্ষত্রিয়সন্তান বর্ধমান এখন সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সামান্যমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্যাগের চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। অহিংসা, সত্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য

পালন এখন তাঁহার ব্রত। উদাসীনের জীবন কাটাইতে হইবে। চিরতরে দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে যেন কখন না পড়েন তাহার উপায় স্থির করিতে হইবে। লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্রখানিও এক ভিক্ষুককে দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রকৃতির মুক্ত কোলে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম বৃথা যায় নাই, একটা যুগধর্ম প্রবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। মানুষের মনে একটা স্থায়ী আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাধকেরা সাধারণতঃ শীতকালে ধুনির সামনে ধ্যান করিতে বসেন। আগুনের জন্য জানোয়ার নিকটে আসিতে ভয় পায়, উত্তাপে শরীরও গরম থাকে। নিরাপত্তা ও আরাম উভয় দিক হইতে ধুনির প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ধমান এত কঠোরী যে তিনি ধুনি না জ্বালিয়া ধ্যানে বসিতেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের কষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না। দেহজ্ঞান রহিত হইয়া ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। দীর্ঘকাল অতি সামান্যমাত্র আহার করিয়া কঠোরতা অভ্যাসের ফলে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া গেল। তথাপি তিনি তপস্যা হইতে বিরত হন নাই। তিনি সাধারণতঃ অরণ্য, কিংবা শ্মশানঘাট কিংবা নির্জনে থাকিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অস্তিগ্রামে আসেন। এখানে তিনি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের দার্শনিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ধ্যানাভ্যাসে রত থাকেন। দৈনিক তিন ঘন্টার বেশী কখনও নিদ্রা যাইতেন না। অবশিষ্ট সময় পাঠ, ধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ এবং সদ্ চিন্তায় কাটাইতেন। মাধুকরী করিয়া জীবনধারণ করিতেন। যখন ভিক্ষায় যাইতেন তখন কোন সাধুকে গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে দেখিলে সেই গৃহস্থের বাড়ীতে যাইতেন না কারণ তাঁহার উপস্থিতিতে অন্য সাধু মাধুকরী হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন এই আশঙ্কা করিতেন। সব দিন মাধুকরীতে যাইতেন না। অনেকদিন উপবাসে কাটাইতেন। উপবাসও তাঁহার সাধনার অঙ্গ হিসাবে দাঁড়াইল।

তিনি আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার নালন্দায় চারিমাস কাটাইয়া চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এ স্থান শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মচর্চার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে বহু বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসেন। আজীবক সম্প্রদায়ের যুবক সাধক মাঙ্গলিপুত্র গোশাল তাঁহাদের অন্যতম। বর্ধমানের ত্যাগ, তপস্যায় প্রীত হইয়া গোশাল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাহার পর উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য হওয়াতে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বর্ধমান বিশ্বাস করিতেন, মানুষের

জন্মার্জিত কর্মের ফলে তাহার শরীর মন গঠিত হয় সত্য কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে সৎ চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রয়োজন শুধু সংযম এবং আত্মবিশ্বাস। কিন্তু মাঙ্গলিপুত্র গোশাল মনে করিতেন অদৃষ্টই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষার্থের স্থান নাই। তিনি তপস্বী ছিলেন বটে কিন্তু অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নিজেকে একজন তীর্থঙ্কর মনে করিতেন। এই অহঙ্কারই তাঁহার পতন ঘটাইল। জীবনের শেষভাগে তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া তীর্থঙ্করের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করেন। বর্ধমান কখনও ধ্যানাভ্যাস হইতে বিরত হন নাই। জ্ঞানত্ব বা কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্ম তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। লোকের গঞ্জনা, অত্যাচার, মৃত্যুভয় কিছুই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। মারের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানত্ব অর্জন করিতে হইয়াছে।

গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি খুব বিপদগ্রস্ত হন। কয়েকজন অসভ্য লোক তাঁহাকে যথেচ্ছ অত্যাচার করিল। অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াও তিনি কোনপ্রকার প্রতিরোধ করিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী, প্রতিরোধ করা ধর্মবিরুদ্ধ। এত কষ্ট পাইয়াও মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন না। আর একবার কয়েকজন পাহারাদার তাঁহাকে চোর সন্দেহ করিয়া নির্মম প্রহার দ্বারা জর্জরিত করিল। হেড পাহারাদার মদের ঝোঁকে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিল। বর্ধমানের গলায় ফাঁস পরাইয়া দেওয়া হইল কিন্তু ফাঁস খুলিয়া গেল। এইরূপে সাতবার ফাঁস পরানো হইলে প্রত্যেকবার উহা খুলিয়া যাওয়াতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাহাদের মদের নেশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। অবশেষে তাঁহাকে মহাপুরুষ ভাবিয়া মুক্তি দিল। দেহ ধারণ করিলে কষ্ট পাইতে হয়। মহাপুরুষদেরও নিস্তার নাই।

ছামনি গ্রামে চাতুর্মাস্য করিবার কালে একদিন বর্ধমান একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় একজন রাখাল তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন এই লোকটা শুধু-শুধু বসিয়া আছে, তাহার ষাঁড়টা তাহার অনুপস্থিতিতে কিছুক্ষণ দেখিবার জন্ম বলিয়া রাখাল কাজের জন্ম গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। বর্ধমানের দেহের হুঁশ নাই। রাখাল কি দায়িত্ব চাপাইয়া গেল তাহার খেয়াল নাই। রাখাল গ্রামান্তর হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল যে ষাঁড় নাই আর যাহার উপর ষাঁড় দেখিবার ভার দিয়াছিল সে পাথরের মত বসিয়া আছে এবং তাহার প্রশ্নের কোন জবাব দিতেছে না তখন রাখাল ভীষণ রাগিয়া বর্ধমানের কানে ছুঁচাল কাঠের টুকরা ঢুকাইয়া ছেঁদা করিয়া দিল। বর্ধমানের কান দিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে

লাগিল তবু কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিলেন না। তাহাতে রাখাল আরও রাগিয়া ভীষণ প্রতিশোধ নিল। বর্ধমানের কানে ঘা হইয়া গেল। এই ঘা নিয়াই বর্ধমান স্থানত্যাগ করিয়া পাবা নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে পাবা গ্রামে একজন চিকিৎসক তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া কান হইতে ছুঁচাল কাঠের টুকরা বাহির করিয়া ঔষধ দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ঘা শুকাইতে দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল। জগতে নির্দোষ লোককে অধিকাংশ সময় শাস্তি পাইতে হয়।

জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই বর্ধমান গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, মনের দৃঢ়তা এবং সহনশক্তিই তাঁহার মহৎ হইবার রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি জাম্বিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া শালবৃক্ষের তলায় আসন পাতেন এবং দুইদিন নিরন্তর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়া চরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি 'কেবলি' বা 'জিন' হইলেন। এই অবস্থায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া যায়। অহং হইয়া জীব, জগৎ যাবতীয় প্রাণীর অন্তরের কথা, বিশ্বের রহস্য জ্ঞাত হন, তখন তিনি তীর্থঙ্কর, সত্যদ্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক।

তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন এই মহাপুরুষ এখন গুরুর ভূমিকা নিয়া জনগণের সামনে অবতীর্ণ হইলেন। অধ্যাত্ম অনুভূতির নবপ্রকাশের ধারা তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। নবধর্মের বাণী নূতন আলোড়ন আনিল। তিনি প্রচার করিলেন তাঁহার উপদেশ ঠিক ঠিক পালন করিলে শান্তি, সত্য এবং আনন্দলাভ নিশ্চয়ই হইবে। উপদেশ পালন করিতে হইলে যে সন্ন্যাসী হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। সত্যলাভে গৃহী সন্ন্যাসীর সমান অধিকার। সত্যসেবীর কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খণ্ডন হয়। যম, নিয়মাদির অভ্যাস এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা দেহমনের উপর কর্তৃত্ব আসে। নূতন কর্মবন্ধনে জড়াইয়া পড়িতে হয় না। মন শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ থাকে।

মহাবীর তীর্থঙ্করের প্রচার সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের মধ্যে অনেকের মনে গভীর রেখাপাত করিল বটে কিন্তু ইন্দ্রভূতি গৌতম প্রবল আপত্তি জানাইলেন। তিনি বয়স্ক ব্রাহ্মণ, বিদ্বান বুদ্ধিমান্, কুলের মুখপাত্র, তাঁহার খ্যাতি আছে। বহু লোক মানে। তিনি বলিলেন এই ধরনের প্রচার কার্য সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিবে। উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট, গৃহী-সন্ন্যাসী সকলে সমপর্যায়ভুক্ত হইবে। ভেদ উঠিয়া যাইবে। কেহ কাহাকে মানিবে না। সমাজে বিশৃঙ্খলা আসিবে। মহাবীর তীর্থঙ্কর বেদ মানিতেন না, উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না বলিয়া

ইন্দ্রভূতি তাঁহার উপর আরও বিরূপ হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে সত্যান্বেষী, সরল এবং একনিষ্ঠ। অনুভূতিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষের কথার মূল্য আছে। আত্মা, কর্ম, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে মহাবীর যখন সহজ সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন তখন ইন্দ্রভূতি উহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রভূতি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের মাথা, ইন্দ্রভূতি এইভাবে মহাবীরের নিকট নতিস্বীকার করিলে সমস্ত সমাজই তাঁহার অনুসরণ করিল। এই ঘটনার পর তাঁহার ভাই অগ্নিভূতিও মহাবীরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাতে নূতন পথ-প্রদর্শকের জয় ঘোষিত হইল। তাঁহার ধর্মের প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রাজগৃহে আসিলে মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার ব্যবহার, উদারতা, ধর্মব্যাখ্যার কৌশল এবং আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া রাজা নিজে মহাবীরের ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সভাসদবর্গ এবং অন্যান্য কর্মচারীও রাজার পথ অনুসরণ করিয়া ঐ ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এইভাবে মহাবীরের ধর্ম ক্রমশঃ বিদেহ, চম্পা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বি এবং কাশীতে বিস্তার লাভ করিল। কাশীতে ধর্মপ্রচারকালে তাঁহার শিষ্য মাঙ্গলি-পুত্র গোশাল নিজ প্রচারিত অদৃষ্টবাদ প্রচারকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকারবাদী গুরু মহাবীরের প্রাণনাশের সংকল্প করিয়া তীর্থঙ্করের প্রতি কু-অভিপ্রায়ে অভিচার করেন। কিন্তু গুরুদ্রোহিতার পরিণাম ভীষণ। গুরুর অভিশাপে অভিচার নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে ধ্বংস করিল। অদৃষ্টবাদের অদৃষ্ট মন্দ। পুরুষকার-বাদের জয় ঘোষিত হইল।

মহাবীর তীর্থঙ্করের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে নৈতিক জীবনের স্থান অতি ঊর্ধ্বে। সত্য, ব্রহ্মচর্য, উদারতা, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি সদ-গুণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। জৈনধর্ম বহু পুরনো। ঋষভদেব প্রথম তীর্থঙ্কর। জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তীর্থঙ্করদের বাণী মানে। তাহাদের মতে চেতন অচেতন নিয়াই জগৎ। প্রত্যেক জীবের চেতনা আছে। জৈনরা পরমতসহিষ্ণু, তাহাদের প্রবর্তিত স্যাৎবাদ বাস্তবধর্মী। প্রত্যেক বস্তুর বহু দিক আছে। গুণ, পর্যায় আছে। স্থিতি, গতি, উভয়ই সত্য। আত্মা অনন্ত গুণের আধার। কর্মের জন্য বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কারাদি পথের প্রতিবন্ধক, জ্ঞানেই অজ্ঞানের বিনাশ। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ভগবানের উপর যে সমস্ত গুণ আরোপ করা হয় তাহা

যুক্তিযুক্ত নয়। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও জৈনধর্মের মহত্ত্ব কমে না। জৈনধর্ম আত্মনির্ভতার ধর্ম।

কোন কোন মনীষী মনে করেন হিন্দুদের মধ্যে যে সন্ন্যাসী সঙ্ঘ দেখা যায় তাহা বৌদ্ধ সঙ্ঘ এবং জৈন সঙ্ঘের অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পূর্বে সন্ন্যাসী সঙ্ঘ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ না করিলেও সন্ন্যাসধর্মের স্থান যে অতি উর্ধ্বে ছিল তাহার প্রমাণ আছে। অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি যে সকল বিধির উপর বৌদ্ধ এবং জৈনেরা বিশেষ জোর দিয়া থাকেন তাহা পালনের দায়িত্ব হিন্দুদের উপনয়নের সময় হইতে আসিয়া পড়ে। অন্য পক্ষে বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যে সন্ন্যাস ধর্মের প্রচলন দেখা যায় তাহা যে ব্রাহ্মণ ধর্মের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ আছে। জেকবির মত পাশ্চাত্য মনীষী মনে করেন যে, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম হিন্দুধর্মের অংশবিশেষ। হিন্দু ধর্মেই তাহাদের উৎপত্তি। দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই সামান্য অনৈক্য দেখা গেলেও বহু বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। পরবর্তীকালে কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচরণ সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্নতার জন্য জৈনদের মধ্যে দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর দুই ভাগ হইয়া যায়। দিগম্বর মতাবলম্বীরা মাথা কামান, বস্ত্রাদি পরিধান করেন না। তাঁহাদের মতে বিষয় মুক্তির পরিপন্থী। মুক্তিলাভ করিতে হইলে পুরুষজন্ম নিতে হইবে, স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে চলিবে না। তাঁহাদের মধ্যে নিয়মের বন্ধন অত্যন্ত কঠোর। শ্বেতাম্বর পন্থীদের মধ্যে নিয়মের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল। অহিংসা জৈনদের মূল তত্ত্ব, এই তত্ত্ব পালনের জন্যই তাহারা কেঁচো, পোকা, কীট-পতঙ্গাদির প্রাণনাশের আশংকায় জমিতে লাঙ্গল দিয়া চাষ-আবাদ করে না। তাহাদের মধ্যে বৈশ্যের সংখ্যা অধিক, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা ধন বৃদ্ধি করে।

জৈন দর্শন বহুত্ববাদী। ইহাতে জীব, অজীব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, মোক্ষাদি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র না মানিলেও পরবর্তীকালে তাঁহাদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়। হিন্দুর দেব-দেবীর পূজা না করিলেও তীর্থঙ্করের পূজাদি করে। তীর্থঙ্কর দেব-দেবীর স্থান অধিকার করিয়াছে। ভক্তিবাদ তাহাদের ধর্মের অঙ্গ না হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব মতাবলম্বী (ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, তারকনাথ রায় দ্রষ্টব্য)। সাহিত্যে জৈনদের অবদান খুব বেশী। কাব্য, ড্রামা, নভেল প্রভৃতিতে তাহারা উন্নত রুচির পরিচয় দিয়াছে। উমাস্বামী কৃত তত্ত্বার্থাধিগম, সিদ্ধসেন দিবাকর কৃত ন্যায়াবতার, জিনসেন কৃত স্যাদবাদ মঞ্জরী, হরিভদ্র প্রণীত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়, জেকবি কৃত জৈন

সূত্র, নেমিচন্দ্র কৃত দ্রব্যসংগ্রহ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। শিল্প-স্থাপত্যেও জৈনদের অবদান খুব বেশী; উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, গিরনার, পালিতানা, মাউন্ট আবুর জৈন মন্দিরগুলি তাহাদের স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগের প্রধান নিদর্শন। বিজ্ঞানেও তাহাদের প্রতিভা প্রকাশ পায়। রিলিজন অব্ ইণ্ডিয়া গ্রন্থের প্রণয়ন-কর্তা বার্থ বলেন, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে অন্যান্যদের তুলনায় জৈনদের অবদান অনেক বেশী। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যেও জৈন ভাষার প্রভাব অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

মহাবীর তীর্থঙ্করের কোন লিখিত রেকর্ড পাওয়া যায় না। তাঁহার অনুগামীরা তর্কশাস্ত্রের বহু উন্নতি করিয়াছেন। তর্কবিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রতিবন্ধক দূর হইয়া গেলে আত্মা তাহার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অখণ্ড আনন্দ এবং অসীম শক্তির অধিকারী হয়। একমাত্র মুক্তিতে এই অধিকার অনুভূত হয়। তাহাদের শাস্ত্র বলে যে সর্বজীবে দয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক বস্তুকে অসংখ্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যায়। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করিলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। বহুত্ববাদ তাহাদের মূল তত্ত্ব। ঈশ্বর কিংবা দেব-দেবী মানিবার প্রয়োজন নাই। ঐ সব না হইলেও চলে। আত্মনির্ভরতাই ধর্মের মূল তত্ত্ব।

মহাবীর তীর্থঙ্কর ত্রিশ বৎসর যাবৎ জৈনধর্ম প্রচার করেন। এক শুভদিনে তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। তাঁহার তিরোধানে তাঁহার শিষ্য এবং ভক্তেরা মনে করেন জগৎ হইতে জ্ঞানের আলো নিভিয়া গেল। তাঁহার স্মরণ এবং সম্মানার্থে জৈনেরা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে হাজার দীপ জ্বালাইয়া রাখেন।

শেষ